



# সশস্ত্র বাহিনী দিবস জার্নাল ২০১৩

## ARMED FORCES DAY JOURNAL 2013





সশস্ত্র বাহিনী দিবস জার্নাল ২০১৩  
**ARMED FORCES DAY JOURNAL 2013**







... আজ লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। ... তাদের জন্যই সম্ভব হয়েছে আমাদের নিজেদের মাটিতে সামরিক একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা। আমি আশা করি ইনশাআল্লাহ, এমন একদিন আসবে, যখন এই একাডেমি শুধু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াই নয়, সারা দুনিয়াতে সম্মান অর্জন করবে। ...

... এখন তোমাদের উপর আসছে দেশ ও জাতির প্রতি দায়িত্ব, জনগণের প্রতি দায়িত্ব, যে সমস্ত সৈনিকদের তোমরা আদেশ-উপদেশ দেবে, তাদের প্রতি দায়িত্ব এবং তোমাদের নিজেদের প্রতি দায়িত্ব। ... আজ আমি যা দেখলাম, তাতে আমি বিশ্বাস করি, পূর্ণ সুযোগ-সুবিধা পেলে আমাদের ছেলেরা যে কোন দেশের যে কোন সৈনিকের সাথে মোকাবিলা করতে পারবে।...

...বাংলাদেশের সৈনিক, তোমরা হবে আমাদের জনগণের বাহিনী, তোমরা শুধু পেশাদার বাহিনী নও, কেবল সামরিক বাহিনীও নও। দরকার হলে তোমাদের আপন হাতে উৎপাদন করে খেয়ে বাঁচতে হবে।...

... আজ আমি তোমাদের এই প্লাটফর্ম থেকে সামরিক বাহিনী, বেসামরিক বাহিনী, জনগণ সকলের কাছে আবেদন জানাবো - সবাই সংঘবদ্ধ হয়ে অভাব, অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করুন।...

**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান**

১৯৭৫ সালের ১১ জানুয়ারি কুমিল্লায় অবস্থিত তৎকালীন বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি (বিএমএ)-তে প্রথম শিক্ষা সমাপনী অনুষ্ঠানে বিদ্যায়ী ক্যাডেটদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণ থেকে উদ্ধৃত।







بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



## বাণী

রাষ্ট্রপতি  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ  
ঢাকা।

০৭ অগ্রহায়ণ ১৪২০  
২১ নভেম্বর ২০১৩

‘সশস্ত্র বাহিনী দিবস-২০১৩’ উপলক্ষে আমি সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্যকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী জাতীয় জীবনে আমাদের অহংকার। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর অবদান জাতি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনালগ্ন হতেই সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ শত্রু সেনাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১৯৭১ সালের এই দিনে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী সম্মিলিতভাবে দখলদার বাহিনীর উপর সর্বাঙ্গিক আক্রমণ পরিচালনা করে। ফলশ্রুতিতে আমাদের কাঙ্ক্ষিত বিজয় অর্জন ত্বরান্বিত হয়। অকুতোভয় সশস্ত্র বাহিনীর অনেক সদস্যই সেদিন দেশমাতৃকার জন্য অকাতরে জীবন উৎসর্গ করেন। এ দিবসে আমি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য শাহাদত বরণকারী সশস্ত্র বাহিনীর বীর শহীদদের রুহের মাগফিরাত কামনা করি এবং যুদ্ধাহত ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই।

দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার মহান দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা এবং জাতিগঠনমূলক কর্মকাণ্ডে সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকা প্রশংসনীয়। আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নিয়োজিত থেকে দক্ষতা, সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। এ দায়িত্ব পালনকালে অনেক সদস্য শাহাদত বরণ করেছেন। এ দিবসে আমি তাঁদের রুহের মাগফিরাত কামনা করি এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানাই। সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ কঠোর অনুশীলন, পেশাগত দক্ষতা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও দেশপ্রেমের চরম পরাকাষ্ঠার মাধ্যমে তাঁদের গৌরব সমুন্নত রাখবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমি ‘সশস্ত্র বাহিনী দিবস’-এ সশস্ত্র বাহিনীর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি এবং এর সকল সদস্য ও তাঁদের পরিবারবর্গের সুখ, শান্তি ও অগ্রগতি কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

রাষ্ট্রপতি ও সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক







بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



প্রধানমন্ত্রী  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৭ অগ্রহায়ণ ১৪২০

২১ নভেম্বর ২০১৩

## বাণী

সশস্ত্র বাহিনী দিবস ২০১৩ উপলক্ষ্যে আমি সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

গৌরবময় ঐতিহাসিক এই দিনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের সকল বীর শহীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সশস্ত্র বাহিনীর সকল শহীদের প্রতি যারা দেশমাতৃকার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাঙালি জাতি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে পরিচালিত মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ১৯৭১ সালের ২১শে নভেম্বর দেশপ্রেমিক জনতা, মুক্তিবাহিনী, সশস্ত্র বাহিনী ও বিভিন্ন আধাসামরিক বাহিনীর সদস্যগণ সম্মিলিতভাবে দখলদার পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণের সূচনা করেন। এর ফলশ্রুতিতে ১৬ই ডিসেম্বর হানাদার পাকিস্তানী বাহিনীকে পরাজিত করে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি জাতির অগ্রযাত্রা ও বিজয়ের স্মারক হিসেবে প্রতি বছর ২১শে নভেম্বর “সশস্ত্র বাহিনী দিবস” পালন করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশে একটি আধুনিক সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার কাজ শুরু করেন। তাঁর হাতে গড়া সেই বাহিনী আজ পেশাদারিত্ব ও দক্ষতার স্বাক্ষর রাখছেন তাঁদের সকল কর্মকাণ্ডে।

বর্তমান সরকার জাতির পিতার নির্দেশে ১৯৭৪ সালে প্রণীত প্রতিরক্ষা নীতির আলোকে “ফোর্সেস গোল ২০৩০” এর আওতায় সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকায়নে সর্বাঙ্গিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সশস্ত্র বাহিনী দুর্যোগ মোকাবেলা, অবকাঠামো নির্মাণ, আত্মমানবতার সেবা, বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা এবং বিভিন্ন জাতিগঠনমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করছে।

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করছেন।

আমি আশা করি, সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিটি সদস্য দেশপ্রেম, পেশাদারিত্ব এবং উন্নত নৈতিকতার আদর্শে স্ব স্ব দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে যাবেন।

আমি “সশস্ত্র বাহিনী দিবস ২০১৩” উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা





জাতীয় স্মৃতিসৌধ



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



★★★★★

সেনাবাহিনী প্রধান

সেনাবাহিনী সদর দপ্তর  
ঢাকা সেনানিবাস

## বাণী

একুশে নভেম্বর সশস্ত্র বাহিনীর ইতিহাসে একটি গৌরবোজ্জ্বল ও তাৎপর্যপূর্ণ দিন। ১৯৭১ সালের এই দিনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেশকে শত্রুমুক্ত করতে আপামর জনতা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তিন বাহিনীর অকুতোভয় বীর সেনানীদের সাথে একত্রিত হয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে অপ্রতিরোধ্য আক্রমণের সূচনা করেছিল এবং অর্জিত হয়েছিল আমাদের কাঙ্ক্ষিত বিজয়। এই মহান দিনে আমি বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সকল সামরিক এবং অসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দকে জানাচ্ছি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

আজকের এই বিশেষ দিনটি সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের সাথে অসামরিক জনগণের সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্কের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে অর্জিত হয় আমাদের প্রাণপ্রিয় স্বাধীনতা। মহান মুক্তিযুদ্ধে সীমাহীন ত্যাগ-তিতীক্ষা ও লাঞ্ছনা শহীদের প্রাণের বিনিময়েই আজ আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক। বিশেষ এই দিনে আমি সশস্ত্র বাহিনীতে স্মরণ করছি সেইসব অকুতোভয় বীর শহীদদের, যাদের আত্মত্যাগে এবং সুমহান ত্যাগে অর্জিত হয়েছে আমাদের প্রাণপ্রিয় স্বাধীনতা। আমি আত্মত্যাগকারী সকল শহীদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আজ একটি সুদক্ষ, সুশৃঙ্খল ও সুসংগঠিত বাহিনীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। আমাদের অকুতোভয় বীর সেনানীরা জাতীয় দুর্যোগ মোকাবেলায় এবং বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা কার্যক্রমে নিজেদের আন্তরিকতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, উন্নত পেশাগত দক্ষতা এবং সর্বোপরি নিষ্ঠার সাথে স্বীয় দায়িত্ব পালন করে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে। আশা করি আগামীতেও মাতৃভূমির অখণ্ডতা রক্ষা তথা জাতীয় যে কোন প্রয়োজনে সেনাবাহিনী সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে সদা প্রস্তুত থাকবে - এটাই হোক আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার।

এ মহান দিবসের তাৎপর্য সমুন্নত রাখার অভিপ্রায়ে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ একটি স্মরণিকা প্রকাশ করেছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই এবং এই প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সকলকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন। আমাদের নতুন প্রজন্মকে নব উদ্যমে উজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে এই প্রকাশনা ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি। মহান আল্লাহ আমাদের সকলের সহায় হউন। আমিন।

ইকবাল করিম ভূইয়া  
জেনারেল  
সেনাবাহিনী প্রধান





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



নৌবাহিনী প্রধান



নৌবাহিনী সদর দপ্তর  
বনানী, ঢাকা-১২১৩

## বাণী

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে মহান ২১ নভেম্বর এক ঐতিহাসিক ও গৌরবোজ্জ্বল দিন। জাতির ঐতিহাসিক এ দিনে আমি বিনম্র চিত্তে স্মরণ করি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যাঁর সংগ্রামী আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাঙালি জাতি মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে অর্জন করেছিল স্বাধীনতার লাল-সবুজের দৃশ্য পতাকা। আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি সশস্ত্র বাহিনীর সেই সব মহান বীরদের, যাঁদের ত্যাগ আর আত্মদান চিরদিন আমাদের মাঝে চির জাগরুক ও ভাস্বর হয়ে থাকবে।

দীর্ঘ আট মাস রক্তাক্ত গেরিলা যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারণে ২১ নভেম্বর যুক্ত করেছিল এক নতুন তাৎপর্য। সর্বস্তরের মুক্তিসংগ্রামীদের সাথে তিন বাহিনীর সম্মিলিত সশস্ত্র আক্রমণ বিজয়ের পথকে করেছিল সুগম ও ত্বরান্বিত। বাঙালির যুদ্ধ কৌশলের কাছে তারা পরাজয় বরণ করে এবং ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। মহান ২১ নভেম্বরের অনুপ্রেরণায় সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিটি সদস্য মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সदा প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিটি সদস্য আজ অত্যন্ত নিবেদিত প্রাণ। দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তার পাশাপাশি দুর্যোগকালীন সময়ে বিপন্ন মানবতার সেবাসহ দেশের স্থল, জল ও আকাশ পথের নিশ্চিদ নিরাপত্তা রক্ষায় সশস্ত্র বাহিনী অতদূর প্রহরীর মতো দায়িত্ব পালন করছে। এ মহান দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অনেকেই জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। আজকে এ মহান দিনে আমি তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। তাঁদের চেতনাকে অনুসরণ করে দেশ ও জাতির ক্রান্তিলগ্নে যে কোন ত্যাগ স্বীকার করে আমাদের অকুতোভয় সেনানীরাও দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

মহান এ দিবসের তাৎপর্য সমুন্নত করে তুলে ধরতে, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ একটি সমৃদ্ধ স্মরণিকা প্রকাশ করেছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। তাঁদের এ উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই এবং এ প্রকাশনার সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। পাশাপাশি, আমি বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সর্বস্তরের সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমিন।

এম ফরিদ হাবিব  
ভাইস এডমিরাল  
নৌবাহিনী প্রধান



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



বিমান বাহিনী প্রধান

বিমান বাহিনী সদর দপ্তর  
ঢাকা সেনানিবাস

## বাণী

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে ‘একুশে নভেম্বর’ একটি গৌরবময় ও অবিস্মরণীয় দিন। তাৎপর্যপূর্ণ এই বিশেষ দিনে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত স্বাধীনতাকামী দেশের আপামর জনতার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমাদের সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর অকুতোভয় সেনানীরা গুরু করে জল, স্থল ও আকাশ পথে সম্মিলিত আক্রমণ ও প্রতিরোধ। যার ফলশ্রুতিতে ত্বরান্বিত হয় আমাদের কাক্ষিত বিজয় এবং বিশ্ব মানচিত্রে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্থান করে নেয় আমাদের প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমি, বাংলাদেশ।

মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের কালজয়ী অকুতোভয় সৈনিকদের আত্মত্যাগের বিরল দৃষ্টান্ত আমি গভীর শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। স্মরণ করছি তাঁদের, যারা দেশমাতৃকার জন্য নিঃশেষে প্রাণ উৎসর্গ করে আমাদেরকে স্বাধীন জাতির মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে গেছেন। এই মহান দিবসে আমি সশস্ত্র বাহিনীর সকল শহীদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। বীরত্বপূর্ণ ইতিহাসের ধারক ও বাহক সেইসব বীর সেনানীদের অনুপম আদর্শে উদ্বুদ্ধ আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর সুশৃঙ্খল বীর সদস্যরা আজ স্বদেশে যেমন বরণীয় আন্তর্জাতিক মহলেও তেমনি প্রশংসিত। ‘মহান মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা আমাদের নতুন প্রজন্মকে আজীবন উজ্জীবিত করুক’ - আজকের দিনে এটাই প্রত্যাশা করছি। আত্মত্যাগের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিটি সদস্য দেশমাতৃকার যে কোন ক্রান্তিলগ্নে অকাতরে নিজেকে বলিয়ে দেবে - এটাই জাতির কাম্য।

মহান এ দিবসের তাৎপর্য সম্মুখ করে তুলে ধরতে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ একটি তথ্যবহুল স্মরণিকা প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। তাদের এ উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই এবং প্রকাশনার সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। আজকের এই গৌরবময় দিনে আমি সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্য ও তাদের পরিবারবর্গকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

পরিশেষে, বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর উত্তরোত্তর উন্নতি, সমৃদ্ধি ও সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সহায় হোন।

মোহাম্মদ ইনামুল বারী

এয়ার মার্শাল

বিমান বাহিনী প্রধান





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ  
ঢাকা সেনানিবাস

### মুখবন্ধ

বাঙালি জাতির ইতিহাসে সশস্ত্র বাহিনী দিবস তথা ২১ নভেম্বর একটি গৌরবোজ্জ্বল দিন। এই মহতী দিনে পরম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সকল শহীদ ও বীর মুক্তিযোদ্ধা, বিশেষ করে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর অকুতোভয় বীর সেনানীদেরকে। ১৯৭১ সালের এ দিনে জাতির জনকের উদাত্ত আহ্বানে দেশের মুক্তিকামী জনতার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সমন্বিত আক্রমণ রচনা করে। দুর্দমনীয় এই আক্রমণে থেমে যেতে বাধ্য হয় শত্রু বাহিনীর অগ্রযাত্রা; তুরান্বিত হয় আমাদের বিজয়। স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁদের আত্মত্যাগ ও অবদান বাংলাদেশের অস্তিত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কযুক্ত। তাঁদের এ মহান অবদানের জন্যই আজ আমরা বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে নির্ভীকচিত্তে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছি।

২১ নভেম্বর আমাদের জন্য ঐতিহ্য, বীরত্ব, ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের প্রতীক, যা সশস্ত্র বাহিনীকে দেশের আপামর জনসাধারণের সাথে একাত্মবোধের দীক্ষায় উজ্জীবিত করে। এই বিশেষ দিনটির মাঝে অন্তর্নিহিত রয়েছে সশস্ত্র বাহিনীর সমন্বিত সংগ্রামের সমুজ্জ্বল ও তাৎপর্যপূর্ণ বীরত্বগাঁথা এবং ঐতিহাসিক মহিমান্বিত চিত্র। সময়ের পরিক্রমায় এ দিনটি গর্ব, সম্মান আর আত্মোৎসর্গের মহান বার্তা নিয়ে প্রতি বছর আমাদের কাছে ফিরে আসে নব উদ্দীপনায় দীপ্ত হওয়ার তাগিদ নিয়ে। অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও এ দিনটি যথাযথ মর্যাদা এবং উৎসাহ উদ্দীপনাপূর্ণ বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের মধ্যে দিয়ে উদ্‌যাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে কার্যকর ও পেশাদার সশস্ত্র বাহিনী প্রতিষ্ঠার জন্য বর্তমান সরকার যুগোপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করে চলেছে। দৃঢ়চেতা, অসীম সাহসী আর দেশপ্রেমে বলীয়ান আমাদের সশস্ত্র বাহিনী মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে দেশমাতৃকার অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় নিষ্ঠার সাথে অহর্নিশি দায়িত্ব পালন করে আসছে। আর্ন্ত-মানবতার সেবা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, প্রয়োজনীয় যোগাযোগ ও অবকাঠামো নির্মাণ এবং অন্যান্য কার্যক্রমে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। আমাদের সশস্ত্র বাহিনী জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমেও পেশাদারিত্বের পরিচয় দিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিরল সম্মান ও ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করে আসছে, যা ইতোমধ্যে সর্বজনবিদিত হয়ে প্রতিভাত হচ্ছে।

সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর অংশগ্রহণে একটি জার্নাল প্রকাশিত হলো। জার্নালে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও বাহিনীত্রয়ের প্রধানগণ তাঁদের মূল্যবান বাণী প্রদান করে আমাদের অনুপ্রাণিত করেছেন। তাঁদের সবার প্রতি রইল আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা। এই প্রকাশনা সংশ্লিষ্ট সকলের মেধা, মনন ও শ্রমের সম্মিলিত বহিঃপ্রকাশ। সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের লেখা সম্বলিত এ স্মরণিকাটি পাঠক মহলে সমাদৃত হলেই আমাদের পরিশ্রম স্বার্থক হবে। আমি সৃজনশীল এ প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং প্রকাশনার সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

আবু বেলাল মোহাম্মদ শফিউল হক  
লেফটেন্যান্ট জেনারেল  
প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার





## দেশমাতৃকার অমর সন্তান আমরা তোমাদের ভুলব না



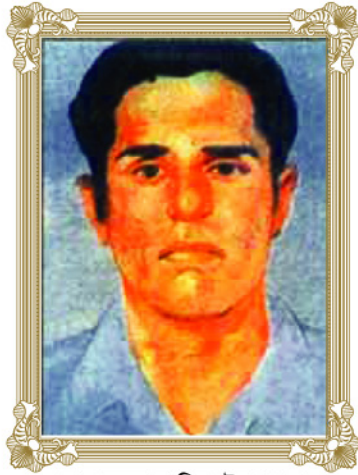
সিপাহী মোস্তফা কামাল  
বীরশ্রেষ্ঠ



ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর  
বীরশ্রেষ্ঠ



সিপাহী হামিদুর রহমান  
বীরশ্রেষ্ঠ



মোঃ রুহুল আমিন, ইআরএ-১  
বীরশ্রেষ্ঠ



ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান  
বীরশ্রেষ্ঠ



ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ  
বীরশ্রেষ্ঠ



ল্যান্স নায়েক মুসলী আব্দুর রউফ  
বীরশ্রেষ্ঠ



সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ





## সম্পাদকবৃন্দ



কমডোর কাজী এমদাদুল হক, (এল), এনডিইউ, পিএসসি, বিএন  
প্রধান সম্পাদক



উইং কমান্ডার মুনছুর আহমেদ  
সম্পাদক



কমান্ডার এম নিজামুল হক, (টাজ), পিএসসি, বিএন  
সম্পাদক



ইং কমান্ডার জি কিউ খান, বিএন  
সহযোগী সম্পাদক



মেজর মোঃ কবির উদ্দিন সিকদার, পিএসসি  
সহযোগী সম্পাদক



মেজর মোঃ মনিরুজ্জামান খান  
সহযোগী সম্পাদক





মেজর দিলীপ কুমার রায়  
সহযোগী সম্পাদক



স্কোঃ লীঃ মোঃ শফিকুল আলম, পিএসসি  
সহযোগী সম্পাদক



স্কোঃ লীঃ মোঃ আসাদুজ্জামান  
সহযোগী সম্পাদক



মেজর মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, পিএসসি  
সহযোগী সম্পাদক



মেজর ফয়সাল হাসান খান, পিএসসি  
সহযোগী সম্পাদক



ইঃ লেঃ কমান্ডার এম জসিম উদ্দিন, বিএন  
সহযোগী সম্পাদক



## EDITORIAL

The 21<sup>st</sup> **November** is the day to commemorate the significance and glories of our War of Independence. On this day, the members of Armed Forces take a fresh pledge with a renewed zeal and commitment inspired by the spirit of the liberation war for safeguarding the sovereignty and independence of our beloved country. This day revives the memories of coherent, unified and intense resistance erected along with the calculated and orchestrated offensive launched by our Armed Forces to finally compel the occupation forces for unconditional surrender. This day also engulfs the part of the sky of our sweet victorious memory with melancholy due to the supreme sacrifice of our heroes during the liberation war. As such, the valiant members of Armed Forces along with the nation commemorate this great day with pride in one hand, and on the other, express their solidarity with the war injured freedom fighters and sincere gratitude to all the heroes and their family members. The spirit of the day brings us not only the pride and honour but also teaches us to resort to concerted efforts among the services of the Armed Forces in achieving the underlying national goal of safeguarding its sovereignty.

A deep sense of satisfaction prevails in us for finally being able to bring out a tributary journal among the number of other commemorative events of 21<sup>st</sup> November organized by the Armed Forces Division. The Armed Forces members contributed in publishing this Journal through their scholarly write-ups highlighting the spirit and ideals of liberation war and other contemporary issues of military and strategic interests. We believe that the readers' satisfaction would inspire the potential intellectuals of Armed Forces to contemplate and pour down their thoughts in future publications.

I am highly indebted to the Principal Staff Officer, Armed Forces Division, whose visionary guidance, encouragement for storming the ideas along with his consistent monitoring were indispensable for the preparation and timely publication of this journal. The members of the editorial board did their best and endeavored to ensure the originality, factuality and creativity of all the write-ups. The team excelled themselves during the careful editing and thus ensured its smooth publication. Bangladesh Navy deserves our sincere thanks for successfully accomplishing the diligent task of printing the journal in time. Despite careful scrutiny at this end, we reckon readers' supportive view on our shortcomings if there is any.

May Almighty Allah grant His infinite blessings to our Armed Forces to keep them ever enable for rendering their supreme services for safeguarding the independence and sovereignty of the motherland and to remain ever standby for contributing its persistent development. Let the spirit of the liberation war always be echoed in our hearts and minds in every step of our actions. We finally pray to Almighty Allah for the salvation of the departed souls of all martyrs of liberation war.

May Allah bless us all.

**Chief Editor**





শিখা অনির্বান



## সূচি

পৃষ্ঠা

- ১। অপ্রতিসম যুদ্ধে দুর্বলের জয় - বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর জন্য কেন প্রাসঙ্গিক ও তাৎপর্যপূর্ণ ? ০১  
মেজর ইকরাম আহমদ ভূঁইয়া, পিএসসি, সিগন্যালস
- ২। মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের ভিনদেশী বন্ধুরা ০৯  
ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট রুথ জান্নাত, জিডি(পি)
- ৩। যুদ্ধবিহীন ভবিষ্যত পৃথিবী : ইউটোপিয়ান ভাবনা অথবা বাস্তবতা - একটি পর্যালোচনা ১৫  
ক্যাপ্টেন খন্দকার মিসবাহ উল আজীম, (ট্যাজ), পিএসসি, বিএন
- ৪। পার্বত্য চট্টগ্রামে সম্প্রীতি ও উন্নয়নে সেনাবাহিনীর ভূমিকা ২২  
লেঃ কর্নেল এ কে এম সাজেদুল ইসলাম, পিএসসি, জি, আর্টিলারি
- ৫। বীরশ্রেষ্ঠদের জীবনগাঁথা ও নব প্রজন্মের শিক্ষা ৩১  
মেজর মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, পিএসসি, এসি
- ৬। বৈষম্য থেকে সংগ্রাম অতঃপর স্বাধীনতা বাংলার ইতিহাসের আরেক পুনরাবৃত্তি - 'দক্ষিণ সুদান' ৩৬  
লেঃ কমান্ডার মেহেদী আমীন মিয়া, (জি), পিএসসি, বিএন
- ৭। মানবতার সেবায় ও নিরাপত্তায় বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ৪৪  
স্কোয়াড্রন লীডার সালাহউদ্দিন আহমেদ, জিডি(পি)
- ৮। আকাশ-প্রতিরক্ষা পদ্ধতি এবং জাতীয় নিরাপত্তায় এর গুরুত্ব ৪৯  
উইং কমান্ডার খন্দকার মনোয়ারুল হক, এডিডব্লিউসি, পিএসসি





## অপ্রতিসম যুদ্ধে দুর্বলের জয় - বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর জন্য কেন প্রাসঙ্গিক ও তাৎপর্যপূর্ণ ?

মেজর ইকরাম আহমদ ভূঁইয়া, পিএসসি, সিগন্যালস

### সূচনা

‘দুর্বল ও শক্তিশালীর মধ্যকার অসম দ্বৈরথে শক্তিশালীর জয় অবশ্যম্ভাবী’-শক্তিমত্তাই যদি হত বিজয়ের একমাত্র মাপকাঠি, সেক্ষেত্রে উপরের বক্তব্যে কোন প্রকার দ্বিমত থাকার কথা ছিলনা এবং ইতিহাসের পাতা তার স্বাক্ষর বহন করত। কিন্তু বাইবেলে বর্ণিত ডেভিড ও গোলিয়াথ এর দ্বৈরথ থেকে শুরু করে ১৯৭৪ সালে জর্জ ফোরম্যান এর বিপক্ষে মোহাম্মদ আলীর ঐতিহাসিক জয় কিংবা সম্প্রতি উইম্বল্ডনে নাদাল ও স্টিভ ডারকিসের মধ্যকার টেনিস ম্যাচ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে আমরা তার ব্যত্যয় দেখতে পাই। আর পৃথিবীর ইতিহাসের যুদ্ধ-বিগ্রহে এমন নজির মিলবে অনেক, যেমন- ট্রুটোবার্গ ফরেস্টে রোমানদের, বদরের যুদ্ধে কুরাইশদের, মার্কিন বিদ্রোহে ব্রিটিশদের, স্পেন ও পর্তুগালের যুদ্ধে (Peninsular War) ফরাসিদের, ভিয়েতনাম যুদ্ধে ও সোমালিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কিংবা আফগানিস্তান ও চেকনিয়ায় রুশ বাহিনীর পরাজয়। আবার ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুদয় লগ্নেই আছে শক্তিশালী পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিপক্ষে বিভিন্ন গেরিলা যুদ্ধে অপেক্ষাকৃত দুর্বল মুক্তিবাহিনীর বিজয়ের সাফল্যগাথা। সবগুলো যুদ্ধেই দেখা যায়, দুই অসম প্রতিপক্ষের উদ্দেশ্য ও কৌশলের (Strategy) ব্যাপক পার্থক্যের কারণে সৃষ্ট এই অপ্রতিসম যুদ্ধে (Asymmetric War) জয় হয় অপেক্ষাকৃত দুর্বলের।

উপর্যুক্ত উদাহরণসমূহ আন্তঃরাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্ব সংক্রান্ত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অথচ তুলনামূলকভাবে অনুমোচিত বিষয়কে চিত্রিত করে, যা হলো একটি দুর্বল রাষ্ট্র সঠিক উদ্দেশ্য ও উপযোগী কৌশলের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের অধিক শক্তিমত্তাকে বিজয়ের ক্ষেত্রে অর্থহীন করে তুলতে পারে। শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহ সাধারণত প্রচলিত যুদ্ধের (Conventional War) মাধ্যমেই প্রতিপক্ষকে মোকাবিলা করে। অপরদিকে, দুর্বল প্রতিপক্ষ এসকল যুদ্ধে প্রায়শই

অপ্রচলিত যুদ্ধের (Unconventional War) ব্যবহারের মাধ্যমে যুদ্ধের ফলাফলকে পাল্টে দেয়। শক্তি, Might বা Power কে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। তবে কিছুটা প্রাঞ্জল ভাষায় বলা যায়, সম্পদ ও সাংখ্যিক বিচারে আধিক্য সংক্রান্ত শক্তি যা প্রযুক্তিগত অগ্রগতিতেও সহায়ক। আর অপ্রতিসম যুদ্ধ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আঙ্গিকে বিভিন্ন লেখক ও গবেষক কর্তৃক উপস্থাপিত হয়েছে। অপ্রতিসম যুদ্ধে তৈরি হয় এমন এক পরিস্থিতি যেখানে একটি দুর্বল বাহিনী প্রতিপক্ষের অসম শক্তির বিপরীতে নিজ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সাধারণত অপ্রচলিত পন্থা অবলম্বন করে। তাই এ সকল যুদ্ধ পুরোপুরি প্রচলিত বা রীতিসিদ্ধ (Orthodox) হয়না, বরং এ ক্ষেত্রে অস্পষ্টতার (Ambiguity) আধিপত্যই বেশী থাকে এবং অধিকতর সমরশক্তি বিজয়ের নিশ্চয়তা প্রদান করে না।

বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন প্রধানত প্রচলিত যুদ্ধকেন্দ্রিক। তবে বিশ শতকের পর থেকে প্রচলিত যুদ্ধের পাশাপাশি অপ্রচলিত যুদ্ধ এবং ‘ছোট দলের অভিযান (Small Group Operation)’ সংক্রান্ত বিষয়গুলো রণকৌশলে জায়গা করে নিয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ের যুদ্ধ-বিগ্রহ পর্যালোচনা ও ভবিষ্যতের রণাঙ্গনের চিত্র কল্পনা করলে ক্ষুদ্র রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের জন্য বিষয়টি আরো বেশী গুরুত্বপূর্ণ এবং আবশ্যিক বলে প্রতীয়মান হয়। এই প্রবন্ধটির উদ্দেশ্য অপ্রতিসম যুদ্ধ বা তার কৌশলগত বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ নয় বরং প্রাসঙ্গিক ইতিহাস ও সমসাময়িক তত্ত্ব পর্যালোচনার মাধ্যমে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো কিভাবে বৃহৎ রাষ্ট্রকে এমনকি কখনো কখনো বিভিন্ন পরাজয়কে পরাজিত করে এবং তা কেন বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর জন্য তাৎপর্যপূর্ণ সে বিষয়ে আলোকপাত করা। তবে এই প্রবন্ধে পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়টি খুব প্রাসঙ্গিক নয় বিধায় তা উহ্য রাখা হয়েছে।



এই প্রবন্ধে, প্রথমেই দুর্বল রাষ্ট্রের জয়ের ইতিহাস পর্যালোচনা করে অপ্রতিসম যুদ্ধ ও তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এরপর কিভাবে দুর্বল রাষ্ট্র জয়ী হয় সে সম্পর্কে সমসাময়িক সামরিক বিশ্লেষকদের মতামত ও তত্ত্ব তুলে ধরা হয়েছে। সবশেষে এই বিষয়টি বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর জন্য কেন তাৎপর্যপূর্ণ সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

### অপ্রতিসম যুদ্ধে জয় পরাজয়ের দৃষ্টান্ত এবং এ যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য

শক্তিশালীর বিপরীতে দুর্বলের জয়ের বিষয়টি কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী মনে হলেও প্রাচীনকাল হতে অদ্যাবধি অনেক যুদ্ধেই তা দেখা গেছে। খ্রিস্টপূর্ব ২৩০ শতাব্দীতে কার্থেজিয়ান বীর হ্যানিবল এর আক্রমণ থেকে রোমকে রক্ষার উদ্দেশ্যে ফ্যাবিয়াস ম্যাক্সিমাস সম্মুখযুদ্ধ পরিহার করে সময়ক্ষেপণ করেন এবং শত্রুবাহিনীকে বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট আঘাতের মাধ্যমে পরাভূত করেন। B.H. Liddel Hard এর মতে, ফ্যাবিয়ান কৌশল শুধুমাত্র যুদ্ধ এড়িয়ে সময়ক্ষেপণ ছিলনা, বরং ছিল শত্রুবাহিনীর মনোবল ভাঙ্গার এক অনন্য ও সতর্ক বিচার। জেনারেল গ্রিন মার্কিন বিপ্লবে প্রচলিত এবং অপ্রচলিত যুদ্ধের সমন্বয়ে ব্রিটিশ জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিশ এর বাহিনীকে পরাস্ত করেন। গেরিলা কৌশলকে নিয়মিত বাহিনীর অপারেশনের সাথে গ্রিন এমন দক্ষতার সাথে জুড়ে দেন যে তা ছিল অনেকটা মাও-সে-তুং বা গিয়াপের কৌশলের অনুরূপ।

এক্ষেত্রে ১৯৭১ এর বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সশস্ত্র সংগ্রাম হলো সবচেয়ে নিকটতম, নির্ভরযোগ্য ও প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অস্ত্র, সরঞ্জাম ও রসদ অর্থাৎ যুদ্ধ পরিচালনার জন্য সকল প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং প্রশিক্ষণ ও সংখ্যা অপ্রতুলতা থাকা সত্ত্বেও সঠিক উদ্দেশ্য ও কৌশল অবলম্বন করে অপেক্ষাকৃত দুর্বল মুক্তিবাহিনী শক্তিশালী পাকিস্তান হানাদার বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে এবং চূড়ান্ত বিজয়ের পূর্বে যুদ্ধক্ষেত্রকে কাক্ষিক্ত রূপ দেয়।

গত কয়েক দশকের বিভিন্ন অপ্রতিসম যুদ্ধের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যখনই কোন দুর্বল রাষ্ট্র শক্তিশালী প্রতিপক্ষের সাথে প্রচলিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে, তখনই হয়েছে তাদের শোচনীয় পরাজয়। ১৯৯০ এর Gulf War এ প্রচলিত যুদ্ধের ক্ষেত্রে বহুজাতিক বাহিনী পায় বাধাহীন জয় কিন্তু বাথ পরবর্তী ইরাকে কাউন্টার ইন্সারজেন্সি পরিচালনার সময় পরিস্থিতি হয় সম্পূর্ণ বিপরীত। উপর্যুক্ত উদাহরণগুলো থেকে উঠে এসেছে এ যুদ্ধের একটি অতিগুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আর তা হলো দুই প্রতিপক্ষের মধ্যকার অপ্রতিসম কৌশল যা যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারণে ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

দুর্বল ও শক্তিশালীর মধ্যকার জয়-পরাজয় এর হিসেব-নিকেশ করতে গেলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা চলে আসে সর্বাত্মে। ১৯৪৫ পরবর্তী সময়ে সার্বিয়ার মিলোসেভিচ বা ইরাকের সাদামের বাহিনীকে তারা যতটা সহজে ও তীব্র আঘাতে ধূলিসাৎ করেছিল, ভিয়েতনাম ও সোমালিয়ায় নাকাল হয়েছিল ঠিক সেভাবেই। এছাড়া বাথ পরবর্তী ইরাক বা আফগানিস্তানে তাদের অবস্থান ও অভিযান কখনোই সুখকর ছিলনা।

‘ভিয়েতনাম যুদ্ধ’ শক্তিশালীর বিপক্ষে দুর্বলের জয়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের ঝান্ডা সবসময় উপরে তুলে রাখবে। ভিয়েতনামের গৃহযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের মূল উদ্দেশ্য ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন ভিত্তিক সমাজতান্ত্রিক বলয়ের আত্মসনকে রুখে দেওয়া। বিগত শতাব্দীতে মাও-সে-তুং অনিয়মিত (Irregular) যুদ্ধের যে ধারণা দেন তা অতি দ্রুত ‘দীর্ঘায়িত যুদ্ধ’ বা ‘বিপ্লবী যুদ্ধ’ নামে পরিচিতি লাভ করে। এই যুদ্ধ চীন এবং ইন্দোচীন এর কম্যুনিষ্ট বিজয়ে ভূমিকা রাখে এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর বিদ্রোহী বা অভ্যুত্থানকারীদেরও প্রেরণা যোগায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হঠাৎ করেই ভিয়েতনামে এই নতুন ব্র্যান্ডের অনিয়মিত যুদ্ধের সম্মুখীন হয়। এমন পরিস্থিতিতে তারা এই যুদ্ধের অপরিহার্য রাজনৈতিক প্রকৃতি অথবা ইন্দোচৈনিক রাজনৈতিক ও আভিযানিক কাঠামোতে





প্রচলিত প্রথার মার্কিন যুদ্ধকৌশলের সীমাবদ্ধতা কোনটাই অনুধাবন করতে পারেনি। ফলে, তারা (যুক্তরাষ্ট্র) সেই প্রচলিত যুদ্ধকৌশলই অবলম্বন করে যাতে তারা অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু খুব দ্রুতই তারা অচলাবস্থায় পর্যবসিত হয়ে নতুনভাবে আবিষ্কার করে এমন এক প্রতিপক্ষকে (উত্তর ভিয়েতনাম) যারা ছিল জয়ের জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ আর অবলম্বন করে এমন এক কৌশল যা দ্রুত বিজয়ের লক্ষ্যে থাকা মার্কিন সামরিক শক্তিকে গুড়িয়ে দেয়। যৌগিক ও জটিল এই যুদ্ধে মার্কিন সামরিক আধিপত্য অর্থহীন প্রমাণিত হয়েছে অপ্রচলিত যুদ্ধ, রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং তা নিয়ে গণমাধ্যমের তীব্র প্রচারণার কারণে। ১৯৬৮'র টেট অফেনসিভ এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে মার্কিন জনগণ থেকে শুরু করে কংগ্রেস পর্যন্ত এবং এ যুদ্ধের উদ্দেশ্য নিয়ে পুনর্বিবেচনা শুরু হয়। ১৯৭১ সালের মধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে ইসারজেন্সি অনেকটা কমে আসে, কিন্তু এরই মধ্যে ইসারজেন্সির পরিবর্তে জন্মলাভ করে অতি শক্তিশালী উত্তর ভিয়েতনাম সেনাবাহিনীর যা ১৯৭৫ সালে সাইগন তথা দক্ষিণ ভিয়েতনাম এর পতন ঘটায়।

সাম্প্রতিক বিশ্বের দিকে তাকালেও এমন অনেক দৃষ্টান্ত মেলে। যেমন- ২০০৬ এর ২য় লেবানন যুদ্ধে হেযবুল্লাহ তাদের ছোট বাহিনী নিয়ে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর (আইডিএফ) বিপুল সমরশক্তিকে রুখে দেয়। অনেকটা অপ্রচলিত বাহিনীর মত সংগঠিত হেযবুল্লাহ আইডিএফ এর মধ্যে অনিরাপত্তার আশঙ্কা জাগিয়ে তোলে আর গোলন্দাজ আক্রমণে তাদের ধাপে ধাপে ধ্বংস করতে থাকে। মাত্র এক ব্রিগেড পরিমাণ সেনার যথাযথ মোতায়েন, ট্যাংক বিধ্বংসী মিসাইল ও মর্টার এর সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে তারা চারটি ইসরায়েলি ডিভিশনের অগ্রযাত্রা থামিয়ে দেয়। এমন অসম যুদ্ধে জয়ের পেছনে বড় কারণ হলো - হেযবুল্লাহর জন্য এটা ছিল অস্তিত্বের লড়াই। পরাশক্তিগুলোর কৌশল অনুকরণে নয় বরং অদম্য ইচ্ছাশক্তি নিয়ে নিজস্ব উদ্ভাবিত কৌশলে তারা যুদ্ধ করে, যেখানে ছিল মোজাইক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আর ভূমির ৪০ মিটার নিচে বিস্তৃত কমান্ড বান্ধার, ছিল

৬০০টি ভিন্ন ভিন্ন অস্ত্র ও গোলাবারুদের বান্ধার। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল নেতৃত্বের বিকেন্দ্রীকরণের কারণে বিভিন্ন স্তরের অধিনায়কদের নিজ এলাকায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা।

ভিয়েতনাম ও লেবানন এর ক্ষেত্রে এবং এ ধরনের অন্যান্য যুদ্ধেও অপ্রতিসম কৌশলের পাশাপাশি আরো একটি অতিগুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় যা হলো- 'অপ্রতিসম উদ্দেশ্য'। এটি একটি অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য যে, পরাজয় এড়ানোতেই হয় গেরিলা বা অপ্রচলিত বাহিনীর জয়, আর বিজয় অর্জন দীর্ঘায়িত হলেই রচিত হয় প্রচলিত বাহিনীর পরাজয়। সাম্রাজ্যবাদি শক্তি ও অসাম্রাজ্যবাদি শক্তির মধ্যকার একটা বড় পার্থক্য হলো- সাম্রাজ্যবাদি শক্তিসমূহ পারিপার্শ্বিক যুদ্ধে (অস্তিত্বের লড়াই নয় যেখানে) অনির্দিষ্টকালের জন্য প্রাণহানি মেনে নেয় না। অন্যদিকে দুর্বলের ক্ষেত্রে প্রায়শই তা হয় অস্তিত্বের লড়াই। তার জন্য 'বিজয় অথবা মৃত্যু' এই মূলমন্ত্রটি শুধুমাত্র ছাপার অক্ষরে বা দেয়ালের লিখনে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং এটাই হয় মূল পার্থক্যকারী, যাকে বলা যায় 'অপ্রতিসম উদ্দেশ্য'।

১৯৯৪ সালে গ্রজনির যুদ্ধে রাশিয়ার প্রযুক্তি ও সামরিক সক্ষমতা চেচেনদের চেয়ে অনেকগুণ অগ্রগামী ছিল। ধারণা করা যায় যে, এই অপ্রতিসম প্রযুক্তির কারণে রুশ বাহিনী কখনই বুঝতে পারেনি তারা কতটা অরক্ষিত ছিল। আর একারণেই তাদের কাজের ধারা ছিল খুবই অগোছালো। বিপুল সমরাস্ত্রের (চেচেনদের ৫০টি ট্যাংক, ১০০টি এপিসি ও ৬০টি কামানের বিপরীতে রুশ বাহিনীর ২৩০টি ট্যাংক, ৪৫৪টি এপিসি ও ৩৮৮টি কামান) অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও রুশ বাহিনী চেচেনদের অসুবিধাজনক অবস্থানে নিয়ে যেতে পারেনি। বরং গ্রজনিতে চেচেনদের দক্ষতাপূর্ণ প্রতিরোধ রুশ বাহিনীকে পিছু হটাতে বাধ্য করে। চেচেনদের ট্যাংক বিধ্বংসী দলগুলোর নিয়মতান্ত্রিক প্রতিঘাত ও ছোট ছোট দল কর্তৃক চতুর্মুখি আক্রমণের কাছে রুশ বাহিনী পরাজিত হয়। অপ্রতিসম যুদ্ধে যখন দুই প্রতিপক্ষের মাঝে প্রযুক্তি ও শিল্পে এমন ব্যাপক পার্থক্য হয় তখন তাকে 'অপ্রতিসম প্রযুক্তি' বলা যায়।



### প্রাসঙ্গিক মতামত ও তত্ত্ব পর্যালোচনা

পূর্ববর্তী আলোচনায় অপ্রতিসম যুদ্ধের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য উঠে এসেছে, যা হলো অপ্রতিসম কৌশল, অপ্রতিসম উদ্দেশ্য ও অপ্রতিসম প্রযুক্তি। তবে ১৯৭৫ সালের পূর্বে এই বিষয়টি নিয়ে খুব বেশি গবেষণা হয়নি। সত্যিকার অর্থে ভিয়েতনাম যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যর্থতা এবং তৎপরবর্তী সময়ে একই ধরনের ফলাফলের পুনরাবৃত্তি এ বিষয়টি নিয়ে সম্প্রতি সামরিক বিশ্লেষকদের ভাবিয়ে তোলে এবং অনেকেই এ বিষয়ে তাদের মতামত এবং তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে বিভিন্ন তত্ত্ব উপস্থাপন করেন।

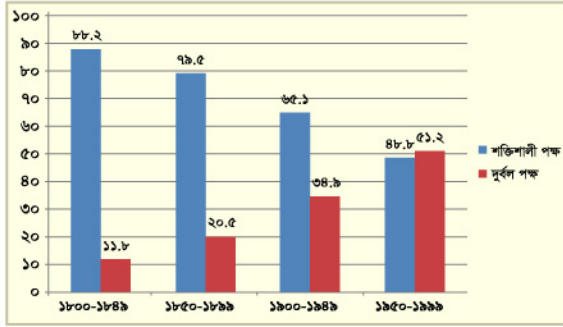
ইতিপূর্বে বিভিন্ন সামরিক বিশ্লেষক অপ্রতিসম যুদ্ধে জয়-পরাজয় এর ক্ষেত্রে উভয়পক্ষের রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে দেখেছেন। তাদের মতে, এ ধরনের যুদ্ধে একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের চেয়ে ভালো ফল নিয়ে আসে। Gil Merom এর মতে, অসম যুদ্ধে গণতান্ত্রিক শক্তি পরাজিত হয় কারণ, বিজয়ের জন্য যে নৃশংসতা বা অরাজকতা সৃষ্টির প্রয়োজন হয়, সে পর্যায়ে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়না। বিষয়টি এই প্রবন্ধের আওতার বাইরে বিধায় আলোচনা এখানেই সীমাবদ্ধ রাখা হলো।

এছাড়া কিছু কিছু সামরিক বিশ্লেষকের মতে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সমরাস্ত্র উৎপাদন ও ব্যবহারের পরিব্যাপ্তি অনেক বৃদ্ধি পায়, যার ফলে পরাশক্তিসমূহ বিভিন্ন উপনিবেশ থেকে ফিরে আসলেও, বিপুল পরিমাণ ক্ষুদ্রাস্ত্র উন্নয়নশীল দেশগুলোতে থেকে যায়। ফলে আপাতভাবে সে সকল রাষ্ট্রকে দুর্বল মনে হলেও, প্রকৃতপক্ষে তারা তা নয়। এই তত্ত্বের দুর্বল দিক হলো: প্রথমত, শুধু সমরাস্ত্রের অধিকারী হলেই কোনো রাষ্ট্রের যে আভিযানিক কার্যকারিতাও থাকবে তা প্রমাণ করেনা। দ্বিতীয়ত, আভিযানিক কার্যকারিতা থাকলেও তা স্বাভাবিকভাবেই শক্তিশালী রাষ্ট্রের প্রযুক্তিগত উৎকর্ষলব্ধ অত্যাধুনিক অস্ত্র ও সরঞ্জামাদির সমকক্ষ হবেনা।

Andrew Mack এ বিষয়ে সাম্প্রতিক লেখক/ বিশ্লেষকদের মধ্যে অগ্রজ এবং 'Asymmetric Warfare' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। Mack দুর্বল ও শক্তিশালীর মধ্যকার অপ্রতিসম শক্তির দ্বারা অপ্রতিসম স্বার্থকে ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে (১) আপেক্ষিক শক্তি বা ক্ষমতা আপেক্ষিক স্বার্থ ও সংকল্পকে প্রভাবিত করে (২) আপেক্ষিক স্বার্থ ও সংকল্প, আপেক্ষিক আক্রম্য বা অরক্ষিত অবস্থাকে (Vulnerability) প্রভাবিত করে এবং (৩) আপেক্ষিক আক্রম্য ব্যাখ্যা করে কেন শক্তিশালী প্রতিপক্ষের পরাজয় হয়। তার সূত্রের সারমর্ম হলো - তুলনামূলক শক্তির পার্থক্যটা যতটা বেশী হবে, শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর সংকল্পের দৃঢ়তা হবে ততটাই কম ও রাজনৈতিকভাবে সে ততটাই বেশী আক্রম্য (Vulnerable) হবে। অপরপক্ষে দুর্বল প্রতিদ্বন্দ্বীর সংকল্পের দৃঢ়তা হবে ততটাই বেশী ও রাজনৈতিক ভাবে সে ততটাই কম আক্রম্য হবে। তার মতে, বড় রাষ্ট্রগুলো প্রায়শই অপেক্ষাকৃত ছোট সংঘাতে পরাজিত হয় কারণ, হতাশ জনগণ (গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে) অথবা সমাজের উচ্চশ্রেণী (একনায়কতন্ত্রের ক্ষেত্রে) সামরিক বিজয়ের ঠিক পূর্বমুহূর্তে শক্তিশালী রাষ্ট্রকে যুদ্ধ হতে সরে আসার জন্য বাধ্য করে। তবে Mack এর তত্ত্বের দুর্বল দিক হলো, আপেক্ষিক ক্ষমতা বা শক্তি সবসময় আপেক্ষিক স্বার্থকে প্রভাবিত করে না বরং অনেক ক্ষেত্রেই তার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা গেছে। যেমন- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতেই জার্মান বাহিনী কর্তৃক বিভিন্ন ক্ষুদ্র রাষ্ট্রকে আক্রমণের ক্ষেত্রে এমনটাই হয়েছিল।

মার্কিন অধ্যাপক Ivan Arreguin-Toft দুর্বল ও শক্তিশালীর মধ্যকার অপ্রতিসম যুদ্ধকে তথ্য উপাত্তের মাধ্যমে ভিন্ন ভাবে উপস্থাপন করেন। তিনি 'সময়' এর সাথে 'যুদ্ধের ফলাফল' এর পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বের করেন যে, 'সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে অপ্রতিসম যুদ্ধে দুর্বল পক্ষের জয়ের হার ক্রমাগতভাবে বেড়েছে'। নিচে ২০০ বছরের তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে Toft এর পর্যবেক্ষণ দেখানো হলো :

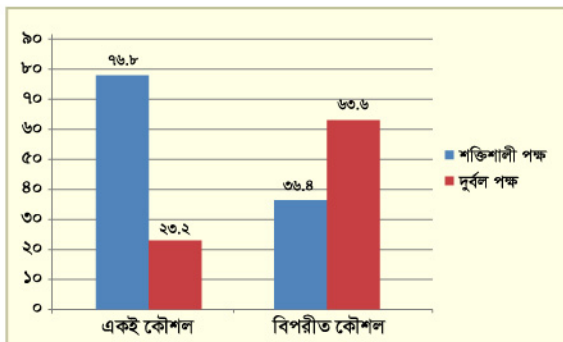




চিত্র-১ : সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে অপ্রতিসম যুদ্ধে দুর্বল পক্ষের জয়ের হার ক্রমাগতভাবে বেড়েছে  
(সূত্র: Arreguin-Toft এর How the Weak Win Wars গ্রন্থ)

Toft এর দৃষ্টিতে শক্তিশালী পক্ষের আছে দুটি কৌশল, ‘প্রত্যক্ষ বা প্রচলিত আক্রমণ’ অথবা ‘বর্বরতা’। আর দুর্বল পক্ষেরও আছে দুটি কৌশল - ‘প্রচলিত প্রতিরক্ষা’ অথবা ‘গেরিলা যুদ্ধ’। তিনি তথ্য বিশ্লেষণে দেখান যে, এ সকল যুদ্ধে দুপক্ষ কখনো একই ধরনের কৌশল (প্রত্যক্ষ বা প্রচলিতের বিপরীতে প্রচলিত) কখনোবা আবার বিপরীত কৌশল (প্রচলিত যুদ্ধের বিপরীতে বর্বরতা/গেরিলা যুদ্ধ) অবলম্বন করে। এতদসংক্রান্ত দুর্বলের জয়ের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে Toft তার Strategic Interaction তত্ত্ব প্রদান করেন। তাঁর মতে :

ক। যুদ্ধে বিপরীত কৌশল ব্যবহার করলে দুর্বল পক্ষের জয়ের সম্ভাবনা হয় বেশি (চিত্র-২)।



চিত্র-২ : ২০০ বছরের তথ্য উপাত্তে দেখা যায় অপ্রতিসম যুদ্ধে বিপরীত কৌশল ব্যবহার করলে দুর্বল পক্ষের জয়ের সম্ভাবনা হয় বেশি  
(সূত্র: Arreguin-Toft এর How the Weak Win Wars গ্রন্থ)

খ। বিপরীত কৌশলের যুদ্ধসমূহ একই কৌশলের যুদ্ধের চেয়ে দীর্ঘ সময়ব্যাপী হয়।

গ। সময়ের সাথে সাথে বিপরীত কৌশলের অপ্রতিসম যুদ্ধে শক্তিশালী পক্ষের পরাজয়ের হার বেড়েছে (চিত্র-২)।

Toft এর এই তত্ত্ব যথেষ্ট সমাদৃত হয় এবং বিষয়টি নিয়ে সমসাময়িক লেখক ও বিশ্লেষকগণ আরো বেশী গবেষণায় ব্রতী হন।

ব্রিটিশ লেখক Jeffrey Record তার ‘Why the Strong Lose’ গ্রন্থে পূর্ববর্তী বিশ্লেষকদের তত্ত্বগুলোকে যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে বিচার করেন। তবে তাঁর মতে, দুর্বল পক্ষের উচ্চতর সংকল্প এবং উপযোগী কৌশল থাকাই বিজয়ের পূর্ণ নিশ্চয়তা দেয়না। তিনি মনে করেন Mack, Arreguin-Toft বা Merom এর বিশ্লেষণে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ পড়েছিল আর তা হলো বহিঃশক্তির সহায়তা যা উচ্চতর সংকল্প এবং কৌশলকে বিজয়ে রূপান্তরিত করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সত্যিকার অর্থে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যা-ই হোক, বহিঃশক্তির সহায়তা-দুর্বল ও শক্তিশালীর শক্তির ভারসাম্যকে পর্যন্ত ওলট-পালট করে দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে ব্রিটিশ বাহিনীর পরাজয় তখনই নিশ্চিত হয়, যখন ১৭৭৮ সালের ফ্রাংকো-আমেরিকান সামরিক জোট সৃষ্টি হয়। ইন্দোচীন-ফ্রান্স যুদ্ধের শুরুতে ভিয়েতমিন বাহিনী সরঞ্জাম ও প্রশিক্ষণ উভয়দিক দিয়েই দুর্বল ছিল। ১৯৪৯ এ পিএলএ’র বিজয়ের পর সিনো-ভিয়েতনাম সীমান্ত দিয়ে চীন থেকে অস্ত্র, সরঞ্জাম, গোলাবারুদ, প্রশিক্ষণসহ সকল সামরিক সহায়তা আসতে থাকে এবং এ কারণেই ১৯৫৪ সালে ভিয়েতমিনদের হাতে ধরা দেয় দিয়োন-বিয়েন-ফু এর বিজয় যা অবশেষে ফরাসি শাসনের অবসানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। Record আরেকটি বিষয়ে আলোকপাত করেন তা হলো, সকল শক্তিশালী রাষ্ট্রকে একই আঙ্গিকে বিবেচনা করা ঠিক নয়। কারণ প্রত্যেকেরই রয়েছে আলাদা ইতিহাস, সংস্কৃতি ও যুদ্ধের কৌশল। উদাহরণস্বরূপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটা বড় সীমাবদ্ধতা ছিল যুদ্ধ ও রাজনীতিকে আলাদাভাবে দেখা এবং সামরিক বিজয়কে চূড়ান্ত বলে মনে করা।



অপ্রচলিত যুদ্ধে দুর্বলের বিজয়ের বিষয়টিতে কোনো কোনো বিশ্লেষকের ভিন্নমতও রয়েছে। যেমন- Robert Mandel তাঁর The Meaning of Military Victory গ্রন্থে মত দেন যে, এ ধরনের যুদ্ধের বড় বাধা হলো, এর ফলে দুর্বল রাষ্ট্রের পাশাপাশি অনেক উদ্ধত ও সম্ভ্রাসী শক্তি সুবিধা পেয়ে যায়। তাঁর লেখায় অবশ্য পাশ্চাত্যের পরাজিতগুলোর কোন অন্যায় উঠে আসেনি, বরং সকল ক্ষেত্রেই তাদেরকে অযাচিত বাহবা দেওয়া হয়েছে। তবে তিনি কৌশলগত যুদ্ধে বিজয়ের জন্য প্রযুক্তিগত কৌশলের পরিবর্তে মানবঘন কৌশল অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছেন - দুর্বলের জয়ের ক্ষেত্রে যা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে বলে প্রতীয়মান হয়।

উপস্থাপিত বিষয়টি নিয়ে এই শতাব্দীতে প্রচুর বিশ্লেষণ ও গবেষণা হয়, যার উল্লেখযোগ্য কিছু অংশ এ পর্যন্ত আলোচিত হয়েছে। তবে গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতার বিবেচনায় বিষয়টি অদূর ভবিষ্যতে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দৃষ্টিতেই আরো অনেক নতুন নতুন দ্বার উন্মোচন করবে বলে আশা করা যায়।

### বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর জন্য বিষয়টির তাৎপর্য

বিগত আলোচনায় বিভিন্ন বিশ্লেষকদের যে মতামত, তত্ত্ব ও যুক্তি উপস্থাপিত হয়েছে তার মূল প্রতিপাদ্য ছিল ‘শক্তিশালী কেন হেরে যায়’ অথবা ‘কী করলে তারা জিততে পারতো’। কেননা এ সবগুলো গবেষণাই হয়েছে পশ্চিমের মূলুক থেকে, যারা এসব অপ্রতিসম যুদ্ধে ছিল ভুক্তভোগী। কিন্তু এই একই বিষয় বিশ্লেষণ করে একটি দুর্বল রাষ্ট্র খুঁজে পেতে পারে তার জয়ের রেসিপি। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীও একইভাবে নিজেদের প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতি রেখে নিজস্ব আঙ্গিকে প্রয়োজনীয় গবেষণা ও বিশ্লেষণধর্মী কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, শুধু এই প্রবন্ধের আওতায় ইতোমধ্যে উল্লেখকৃত বিশ্লেষকদের মতামতের উপর ভিত্তি করে কিছু অবরোহ (Findings) পরবর্তী অনুচ্ছেদে উপস্থাপন করা হলো।

উনবিংশ হতে একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় ২০০ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা, সমসাময়িক বিশ্লেষকগণ কর্তৃক উপস্থাপিত মতামত, তত্ত্ব, তথ্য ও যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে এবং কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে

থাকা তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল একটি রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ সম্পর্কে নিয়ে আসা যেতে পারে নিম্নলিখিত কিছু অবরোহ :

ক। আত্মসী কোন রাষ্ট্র কর্তৃক আক্রান্ত হলে সে রাষ্ট্র গুণগত বা সংখ্যাগতভাবে উচ্চ প্রতিপক্ষ হবে বলে ধারণা করা যায়।

খ। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিবেচনায় সমকক্ষ কোন রাষ্ট্র কর্তৃক বড় আকারের আত্মসনের সম্ভাবনা কম।

গ। শক্তিশালী রাষ্ট্রের সাথে এ ধরনের যুদ্ধ হবে অস্তিত্ব রক্ষার।

ঘ। এ ধরনের অস্তিত্ব রক্ষার যুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর উচ্চ মনোবল এবং দৃঢ় সংকল্প বজায় থাকাই স্বাভাবিক, শুধু প্রয়োজন হবে সঠিক, উপযোগী এবং সময়োচিত কৌশলের প্রয়োগ।

ঙ। উপর্যুক্ত বক্তব্যের আলোকে এবং মাও-সে-তুং এর উদ্ধৃতি হতে বলা যায় যে, ‘পরাজয়ই হতে পারে একমাত্র ফলাফল, যদি শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে তারই কৌশলে প্রতিহত করা হয়’।

চ। শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে প্রতিহত করার জন্য অপ্রচলিত যুদ্ধই হতে পারে একমাত্র উপযুক্ত কৌশল।

ছ। সমসাময়িক অপ্রতিসম যুদ্ধসমূহ এবং ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় অনুমেয় যে এসব ক্ষেত্রে ছোট ছোট দলের যুদ্ধ হতে পারে অত্যন্ত কার্যকর।

জ। এ ক্ষেত্রে বহিঃশক্তির সহায়তা হবে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক, যার জন্য সরকারকে গ্রহণ করতে হবে সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ।

ঝ। শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে অপ্রচলিত যুদ্ধে প্রতিহত করা হলে তা সাধারণভাবে দীর্ঘায়িত হতে পারে, ফলে সশস্ত্র বাহিনীর জন্য শারীরিক, মানসিক ও বস্তুগতভাবে প্রস্তুত থাকা হবে অতি জরুরি।





এটি অতি সহজেই অনুমান করা যায় যে, বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী এ ধরনের গবেষণা কাজ চালিয়ে উপযোগী কৌশল আর অরীতিসিদ্ধ পন্থার নতুন নতুন দ্বার উন্মোচন করতে পারে। ‘সান-জু’ ও ‘তাও-তে-চিং’ এর দর্শণে অনুপ্রাণিত হওয়া ‘সান-পিন’ এর মতে, নতুন যে ধারণানুযায়ী ইতোমধ্যেই কার্য-সম্পাদন হয়ে গেছে তা-ই প্রচলিত (বা রীতিসিদ্ধ) এবং যা এখনো সম্পাদিত হয়নি তা-ই অপ্রচলিত (বা অরীতিসিদ্ধ)। যদি অরীতিসিদ্ধ চেষ্টাকে সঠিকভাবে মোকাবিলা করা না যায়, তবে অবশ্যম্ভাবী যে তা জয় ছিনিয়ে নিয়ে আনবে। আর যার কাছে থাকবে অরীতিসিদ্ধ পন্থার সমাহার তার হবে ক্রমাগত বিজয়। রবার্ট গ্রিন তার ‘33 Strategy of War’ গ্রন্থে ৩৩টি স্ট্র্যাটেজির মধ্যে ১১টি উল্লেখ করেছেন শুধুমাত্র অপ্রচলিত যুদ্ধ বিষয়ে এবং তাঁর মতে - অপ্রচলিত যুদ্ধ বিষয়ে মনে রাখার মত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, কোনো ধারণা বেশি দিন নতুন থাকেনা। অতএব, নতুনদের পূজারীদের সবসময় প্রচলিত ও রীতিসিদ্ধ ধারণার বাইরে আধুনিক কিছু নিয়ে আসতে হবে।

বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী (মূলত বাংলাদেশ সেনাবাহিনী) এই সত্যটিকে উপলব্ধি করে ইতোমধ্যে প্রচলিত যুদ্ধের পাশাপাশি অপ্রচলিত যুদ্ধের ধারণা রণকৌশলে যুক্ত করেছে। তবে, এ বিষয়টি এখনো সাংগঠনিকভাবে পরিপূর্ণরূপে কার্যকর হয়নি। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর পাঠ্যসূচি, ডক্ট্রিন, প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন মূলত প্রচলিত যুদ্ধের আদলেই আছে। ইতিপূর্বে দেখা গেছে যে, বিভিন্ন দেশ প্রয়োজনের তাগিদে অতি অল্প সময়ে অপ্রচলিত বা অনিয়মিত যুদ্ধ অবলম্বন করেছে। কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে এবং সঠিক লক্ষ্য নির্ধারণ করে এ ধরনের যুদ্ধের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে তাতে স্থান, কাল ও পাত্রভেদে প্রয়োজনীয় মাত্রা প্রদান করলে যে তা হবে ‘অপ্রতিরোধ্য’ একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

সবশেষে, সমসাময়িক প্রবণতা ও বিশ্লেষকগণের মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে এবং বাস্তবতার নিরিখে

বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর জন্য কয়েকটি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হলো :

ক। কৌশলগত পারিপার্শ্বিকতার বিবেচনায় এবং কার্যকর ও দক্ষ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে একটি সমন্বিত হুমকি পর্যালোচনা (Threat Assessment) প্রস্তুত করা।

খ। কাক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে, অপ্রচলিত যুদ্ধকে যথাযথভাবে যুক্ত করে অপ্রতিসম যুদ্ধবিষয়ক উপযোগী কৌশল (Strategy) প্রণয়ন। এক্ষেত্রে সমসাময়িক যুদ্ধে দুর্বল রাষ্ট্র কর্তৃক ব্যবহৃত কৌশল বিশ্লেষণ এবং তাতে যথাযথ অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে নিজস্ব কৌশল উদ্ভাবন করা যেতে পারে।

গ। জাতীয় স্বার্থ ও সার্বভৌমত্ব সমুন্নত রেখে কাক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে, ‘প্রতিপক্ষের আক্রম্যতার সুযোগ গ্রহণ’ ও ‘বাহ্যিক সহায়তা’ বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে প্রয়োজনীয় কাজের ধারা (Action Plan) প্রণয়ন।

ঘ। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের সমসাময়িক প্রবণতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপযুক্ত কার্যক্রমকে যুগোপযোগী রাখা।

### উপসংহার

‘শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহ অনেক সময় অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রতিপক্ষের কাছে কেন হেরে যায়?’ এই প্রশ্নটিতে রয়েছে চিন্তার অনেক অবকাশ আর তার উত্তরে থাকবে ভাবনার অনেক খোরাক। তবে উত্তরটি খুব সহজ নয়। আর উত্তরটি যে সার্বজনীন ও সর্বসময়োপযোগী হবে না তা সহজেই বোধগম্য। ইতিহাসের পাতায় দুর্বলের জয়ের উপাখ্যান অনেক আগে থেকে রচিত হয়ে থাকলেও এমন জয়ের আধিক্য সময়ের সাথে সাথে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। আর তাই ‘শক্তিমত্তা’ বনাম ‘জয়-পরাজয়’ হয়েছে একটি প্রাসঙ্গিক পাঠ ও গবেষণার বিষয়। তবে এক্ষেত্রে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহ ছোট সংঘাতগুলোতে আবশ্যিকভাবে হেরে যায়না, বরং বলা যায় যে, তারা জয়ী হতে ব্যর্থ হয়। ফলে এ ধরনের দীর্ঘায়িত যুদ্ধে





পরাজয় এড়ানোতেই হয়ে যায় গেরিলা বা অপ্রচলিত বাহিনীর জয়। বিগত শতাব্দী হতে অনিয়মিত বা অপ্রচলিত যুদ্ধের কার্যকারিতা বারে বারে প্রমাণিত হয়েছে। আর এটাই হয়েছে পরাজয়সমূহের বিপক্ষে অপ্রতিসম যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার সময় একটি অনন্য অস্ত্র।

অপ্রতিসম যুদ্ধের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো- অপ্রতিসম কৌশল, অপ্রতিসম উদ্দেশ্য ও অপ্রতিসম প্রযুক্তি যা দুটি অসম প্রতিপক্ষের মাঝে অনেক বড় ব্যবধান তৈরি করে। সমসাময়িক লেখক ও গবেষক Mack, Arreguin-Toft, Record বা Merom তাঁদের গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে শক্তিশালী পরাজয়ের কারণ অনুসন্ধান করেছেন এবং অনেক যুগান্তকারী মতামত,

তত্ত্ব ও যুক্তি রেখেছেন যেখানে রাষ্ট্র ব্যবস্থা, পারস্পরিক স্বার্থ ও সংকল্পের পার্থক্য, Strategic Interaction তত্ত্ব সহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে এসেছে। তবে স্থান, কাল আর পাত্রভেদে এসকল তত্ত্বের উপযুক্ততা ও দুর্বলতা খুঁজে পাওয়া যায়। এসকল পশ্চিমা বিশ্লেষকদের লেখায় মূল দৃষ্টি ছিল শক্তিশালী পরাজয়ের কারণ অনুসন্ধানের প্রতি। বাংলাদেশ একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র হলেও কৌশলগতভাবে তার অবস্থান একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিধায় অপ্রতিসম যুদ্ধ ও তাতে অপ্রচলিত যুদ্ধের ব্যবহার বিষয়ক গবেষণা ও বিশ্লেষণ স্বাভাবিকভাবেই অতি গুরুত্বপূর্ণ। আর তাই বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর জন্য এ ধরনের চর্চা হতে পারে প্রয়োজনীয় কৌশল নির্ধারণে সহায়ক।

### তথ্যসূত্র

1. Mack Andrew, 'Why Big Nations Lose Small Wars : The Politics of Asymmetric Conflict' World Politics, 27 January 1975.
2. Arreguin-Toft Ivan, 'How the Weak Win Wars : A Theory of Asymmetric Conflict' International Security, 26 (Summer 2001).
3. Record Jeffrey, 'Why the Strong Lose', Parameters, Winter 2005-06.
4. Sher Nicholas, 'When Power Fails : The Causes of Authoritarian Strong State Defeat in Asymmetric War' Thesis Submitted to the Department of Political Science, Haverford College, April 23, 2010.
5. Cassidy Robert M., 'Why Great Powers Fight Small Wars Badly', Military Review, September-October 2000.
6. Caverley Jonathan D., 'The Myth of Military Myopia : Democracy, Small Wars, and Vietnam', International Security, Vol. 34, No. 3 (Winter 2009/10).
7. Liddel Hart B. H., 'Strategy', Natraj Publications (First Indian Edition 2003).
8. Mandel Robert, 'The Meaning of Military Victory', Viva Books (First Indian Edition 2008).
9. Greene Robert, 'The 33 Strategies of War', Viva Books (First Indian Edition 2006).
10. Sun Tzu and Sun Pin, 'The Complete Art of War', Viva Books (First Indian Edition 2006).
11. Gani Md Nasimul, 'Doctrinal Incorporation and Integration of Small Group Operation (Asymmetric Warfare) in War Fighting Strategy of Bangladesh', Bangladesh Army Journal, June 2012.
12. Mamun Abdullah Al, 'Unconventional Warfare and Future Courses of Action for Bangladesh Armed Forces', Bangladesh Army Journal, June 2005.
13. Ahmed Gulam Mahiuddin, 'David versus Goliath : Issues to Ponder from Lebanon War 2006', Bangladesh Army Journal, June 2011.
14. Minhazul Alam Mohammad Asadullah, 'Asymmetric Warfare : Imminent Destiny', Bangladesh Army Journal, June 2008.



মেজর ইকরাম আহমদ ডুইয়া ৩৫তম দীর্ঘমেয়াদী কোর্স এর সাথে ১৩ ডিসেম্বর ১৯৯৬ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর 'কোর অব সিগন্যালস' এ কমিশন লাভ করেন। তিনি সিগন্যাল ব্যাটালিয়নের বিভিন্ন রেজিমেন্টাল পদে দায়িত্ব পালন ছাড়াও সেনাবাহিনী সদর দপ্তরে সামরিক অপারেশন্স পরিদপ্তরের জিএসও-২, সামরিক বাহিনী কমান্ড ও স্টাফ কলেজে জিএসও-৩ এবং বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমিতে প্লাটুন কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সামরিক বাহিনী কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজের একজন গ্র্যাজুয়েট। এছাড়া তিনি মিলিটারি ইন্সটিটিউট অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজি হতে ইলেকট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রনিক্স এন্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং এ স্নাতক এবং বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্ হতে সামরিক বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। বর্তমানে তিনি জাতিসংঘ মিশনে আইভরি কোস্টের সেক্টর ওয়েস্ট সদর দপ্তরে স্টাফ অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।



## মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের ভিনদেশী বন্ধুরা

ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট রুথ জান্নাত, জিডি(পি)

### ভূমিকা

বিপদেই বন্ধুর পরিচয়। আর বিপদে যে এগিয়ে আসে সে-ই তো পরম বন্ধু। একান্তরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় আমরা অনেককেই বন্ধু হিসেবে আমাদের পাশে পেয়েছি। আমাদের গৌরবময় অধ্যায়ের খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে আমরা পেয়েছিলাম ভিনদেশী কিছু দরদী মানুষকে। সেসব দরদী বন্ধুদের নাম আজও আমাদের মনে পড়ে। বিশ্বের মানবতাবাদী মানুষ আমাদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে অনেক আগে থেকেই মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেছিলেন। বিভিন্ন দেশের শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, সংগঠন নিজ নিজ ভূমিকা পালন করতে দ্বিধা করেননি। ১৯৭১ এর রক্তঝরা দিনগুলোর সময়ে এমন অনেক অকৃত্রিম বন্ধু পেয়েছিলাম আমরা, যাদের পরিচয় নিম্নে দেয়া হলো :

### বীরপ্রতীক ডব্লিউ. এ. এস. ওডারল্যান্ড - নেদারল্যান্ডস

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের সাথে যারা সম্পৃক্ত হয়ে মুক্তিযুদ্ধ ও ইতিহাসকে করেছেন গৌরবান্বিত ও মহিমান্বিত, ওডারল্যান্ড তাদেরই একজন। মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের জন্যে এই বিদেশী ভূষিত হয়েছিলেন রাষ্ট্রীয় খেতাব ‘বীর প্রতীক’ এ। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে আরো অনেক বিদেশীই অংশগ্রহণ করেছেন। কিন্তু ওডারল্যান্ডই একমাত্র বিদেশী যিনি সম্মুখযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করে ‘বীর প্রতীক’ খেতাবে ভূষিত হয়েছেন। একান্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকার পাশেই টঙ্গীতে ‘বাটা সু’ কোম্পানিতে তিনি চাকুরীরত ছিলেন। পঁচিশে মার্চের কালো রাতে পাকিস্তানি সেনাদের বর্বরতা তাকে মর্মান্বিত করে তোলে। মনের ভেতর জাগিয়ে তোলে প্রতিরোধের ক্রোধ। তাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এই বীর একজন ভিনদেশী হয়েও জড়িয়ে পড়েন আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে। ওডারল্যান্ডের জন্ম ১৯১৭ সালে নেদারল্যান্ডস এর আমস্টারডামে। তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিনগুলোতে ডাচ বাহিনীর পক্ষে লড়াই করে নাৎসি বাহিনীর বর্বরতার শিকার হন। জীবদ্দশায় ওডারল্যান্ড তার আত্মজীবনী কিংবা বাংলাদেশের

মুক্তিযুদ্ধের উপর কোন স্মৃতিচারণ লিখে যাননি। তবে তাঁর ডায়েরি ও কিছু চিঠিপত্রে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিষয়ে অনেক অজানা তথ্য পাওয়া যায়। ওডারল্যান্ডের চোখে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বেদনা, রক্তাক্ত স্মৃতি আর বাংলার মুক্তিযুদ্ধ এতই একাকার হয়ে পড়েছিল যে, তিনি উদ্বুদ্ধ হন জড়িয়ে পড়তে। তিনি লিখেছিলেন “পাকিস্তানি সেনাদের বর্বরতা দেখে আমার ইউরোপের যৌবনের অভিজ্ঞতাগুলো ফিরে পেয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল যা কিছু ঘটছে বিশ্ববাসীকে কারো না কারো জানানো উচিত। ব্যক্তিগতভাবে আমার কোনও সমস্যা ছিল না। আমি চলাফেরা করতে পারছিলাম অবাধেই। নিরীহ মানুষজনের ওপর পাকিস্তানিরা যেসব ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছিল, তুলেছিলাম তার ছবিও। তারপর সে ছবিগুলো পাঠিয়ে দিতে পেরেছিলাম বিদেশী বিভিন্ন মিডিয়াতে”। এরপর হানাদার বাহিনীর উচ্চস্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগের পরিধি বাড়িয়ে নানা তথ্য গোপনে মুক্তিযুদ্ধের কাজে লাগাতে থাকেন তিনি। এ ব্যাপারে সেক্টর কমান্ডার মেজর সফিউল্লাহ এবং মেজর জিয়াউর রহমানের সাথে তাঁর যোগাযোগ হয়। এরপর ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়েন মুক্তিযুদ্ধের আরো গভীরে। বাটার শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করে টঙ্গীসহ সেক্টর ১ এবং সেক্টর ২ তে গড়ে তুলেন গেরিলা বাহিনী। নিজেই দায়িত্ব নেন প্রশিক্ষকের। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে মৃত্যু এবং লাঞ্ছনার ভয়কে তুচ্ছ করা এই বীরসেনা বলে গেছেন “সে সময় বাঙালিদের জন্য যে ভালোবাসা আর টান আমি অনুভব করেছি আমার সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ ছিল তারই বহিঃপ্রকাশ”। তাঁর শেষ নিবাস ক্যান্সারের দেশ অস্ট্রেলিয়া হলেও ওডারল্যান্ডের স্মৃতি, স্বপ্ন সবই বাংলাদেশকে ঘিরে। শেষদিন পর্যন্ত ওডারল্যান্ডের স্মৃতিতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ডাচদের পক্ষে নাৎসিদের বিরুদ্ধে লড়াই আর যুদ্ধ জয়ে বাংলাদেশের জন্মের অহংকার ছিল চির অম্লান।

### জঁ ইউজিন পল কে - ফরাসি লেখক

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের পক্ষে বহু ধরনের মানুষ বিচিত্র ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং তাদের একজন ছিলেন জঁ ইউজিন পল কে। অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়





এই ফরাসি লেখক জীবনে বিবিধ অভিজ্ঞতার অধিকারী হয়েছিলেন, চিন্তা চেতনার দিক দিয়েও ছিলেন বিচিত্রমুখী। গোড়াতে তিনি ছিলেন ফরাসি সেনাবাহিনীর সদস্য, তারপর সেনাবাহিনী ত্যাগ করে যোগ দেন কুখ্যাত ও এ এস এ; যে গোপন বাহিনী মনে করত আলজেরিয়া হচ্ছে ফ্রান্সের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তা কখনো হাতছাড়া হতে দেওয়া যায় না। আর্দ্রে মালরোর রচনা পড়ে বোধোদয় হয় পল কে এর। তিনি ও এ এস এ ত্যাগ করে হয়ে ওঠেন বিশ্বপথিক। তবে পুরানো মতাদর্শের জের একেবারে কাটিয়ে উঠতে পারেননি। স্পেন, লিবিয়া ও নাইজেরিয়ার বিভিন্ন দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠীর সঙ্গে ভিড়ে যান। একাত্তর সালে বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের বার্তা তাঁকে আলোড়িত করেছিল। এরপর আর্দ্রে মালরো যখন বাংলাদেশের পক্ষে লড়াই করার ব্রত ঘোষণা করেন, তখন গুরুত্বাক্যে বিশেষ অনুপ্রাণিত বোধ করেন পল কে। ৩ ডিসেম্বর তিনি প্যারিসের অরলি বিমানবন্দরে ব্যাগে তথাকথিত বোমা নিয়ে পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট ৭১১ বিমানটি দখল করতে সমর্থ হন। তাঁর ব্যাগ থেকে বের হয়ে আসা বৈদ্যুতিক তার জানান দিয়েছিল ভেতরে বহন করা বোমার। তিনি বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামীদের জন্য জরুরি ওষুধ বহন করে নিয়ে যাওয়ার দাবি জানিয়েছিলেন। কয়েক ঘণ্টা পর ওষুধের কার্টন বোঝাই করার অজুহাতে পুলিশ বিমানে ঢুকে তাঁকে পরাভূত করতে সমর্থ হয়। ব্যাগ খুলে দেখা যায় সেখানে রয়েছে কয়েকটি বই, এক কপি বাইবেল এবং একটি ইলেকট্রিক শেভার। এই ঘটনার পরপরই উপমহাদেশে শুরু হয়েছিল সর্বাত্মক যুদ্ধ। সেই ডামাডোলে হারিয়ে গেল পল কে-র ঘটনা। অবশ্য তাঁর বিরুদ্ধে আনা মামলা চলেছিল বেশ কিছুকাল। আদালতে অভিযুক্তের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন স্বয়ং আর্দ্রে মালরো। অভিযোগ থেকে খালাস পাওয়া পল কে আবারও ঘুরে ফিরেছেন অ্যাডভেঞ্চারের খোঁজে। ১৯৮১ সালে তাঁকে দেখা গিয়েছিল হিমালয় এলাকায় তপস্যারত, এরপর কিছুকাল ছিলেন অস্ট্রেলিয়ায়, পরে আবারও তাঁকে দেখা গেল কলকাতায়, সেখানে জননিরাপত্তা ভঙ্গের অভিযোগে কিছুদিন কাটান কারাগারে। ভারত থেকে বহিষ্কৃত হয়ে ১৯৮৫ সালে তিনি যান ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এরপর তার আর খোঁজ মেলেনি। পল কে ও বাংলাদেশ আলাদা

হয়ে গেছে সেই একাত্তরে, আবার কী কখনো হবে তাদের দেখা? কে জানে?

### লেয়ার লেভিন - মার্কিন চিত্রপরিচালক

মুক্তিযুদ্ধের সময় একদল নিবেদিত প্রাণ সাংস্কৃতিক কর্মী বিভিন্ন মুক্তিশিবির ও মুক্তিফৌজ ক্যাম্পে ঘুরে ঘুরে দেশাত্মবোধক গান গেয়ে, পুতুলনাচ দেখিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের উজ্জীবিত রাখতেন, শরণার্থীদের বুকে যোগাতেন সাহস। মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অস্ত্র হাতে যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করলেও তাঁদের অবদান এক হিসেবে যে অতুলনীয় তা অনুধাবন করেছিলেন মার্কিন চিত্রপরিচালক লেয়ার লেভিন। দুঃসাহসী এই পরিচালক ক্যামেরা হাতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঘুরেছেন ‘মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থা’-র কর্মীদের সাথে সাথে, ধারণ করেছেন, সেলুলয়েডে লিখেছেন তাদের আরেক যুদ্ধের দিনলিপি। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি দেশের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে ঘুরে প্রায় ২০ ঘণ্টার ভিডিও ধারণ করেন। যুদ্ধের শেষ দিকে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যান। আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে তিনি ডকুমেন্টারি তৈরি করতে পারেননি। দীর্ঘ দুই দশক পর ১৯৯০ সালে তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ নিউইয়র্কে লেভিনের কাছ থেকে এই ফুটেজ সংগ্রহ করেন। এ থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য তারা আরো বিভিন্ন উৎস থেকে মুক্তিযুদ্ধের নানা সংরক্ষিত উপাদান সংগ্রহ করেন, বিশ বছর আগের সেই শিল্পীদের সাথে যোগাযোগ করেন। শিশুর লাশ নিয়ে কুকুর আর শকুনের কাড়াকাড়ি, সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে নিরীহ জনগণকে হত্যা, শতবর্ষী বৃদ্ধার গড়িয়ে-গড়িয়ে সীমান্তের ওপারের নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্লান্তিহীন চলা, গুলিবিদ্ধ লাশের স্তূপ, মানবেতর শরণার্থী শিবির, পুড়িয়ে দেয়া ঘরবাড়ি, মাতৃভূমির মুক্তির জন্য গেরিলাদের শপথ, পতাকা ওড়ানো, গানবোটে গেরিলা যুদ্ধ, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পীদের দেশাত্মবোধক গান, জয়বাংলা শ্লোগানে মুখরিত হাজারো মানুষ— এসব ১৯৭১ এর বাঙালির মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণ্যচিত্র। এসব গাঁথা আছে সেলুলয়েডের রূপালি ফিতায়, বেশিরভাগই সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে শ্যুট করা। কিছু নির্মিত হয়েছে নিউজ রিল থেকে। মার্কিন প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা লেয়ার



লেভিনের ধারণ করা ফুটেজ সংগ্রহ করে তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ নির্মাণ করেন ‘মুক্তির গান’। এসব প্রামাণ্যচিত্র আসলে প্রামাণ্য দলিল। পাক হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসরদের মানবতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় এসব প্রামাণ্যচিত্রে। লেয়ার লেভিনের সংগৃহীত ফুটেজ ঐতিহাসিক কারণেই ভিন্ন গুরুত্ব বহন করে।

### জর্জ হ্যারিসন - মার্কিন সংগীতশিল্পী

“হাজার হাজার সহস্র লোক  
মরছে ক্ষুধায়  
এ যন্ত্রণার নেই কোন শেষ  
দেখিনি তো এত নির্মম ক্রেশ  
বাড়াবে না হাত বলো সবাই  
করো অনুভব  
বাংলাদেশের মানুষগুলোকে  
বাংলাদেশ...বাংলাদেশ।”

আগস্ট ১৯৭১ সাল। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক নগরের ম্যাডিসন স্কয়ার। সেখানে চলছে ‘কনসার্ট ফর বাংলাদেশ’। অপ্রতিরোধ্য বীর বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে একাত্ম হয়ে বিটল্‌সের জর্জ হ্যারিসন গাইলেন, ‘বাংলাদেশ...বাংলাদেশ’ শীর্ষক এই গানটি। উদ্দেশ্য ছিল, বাঙালি শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য অর্থ-তহবিল গঠন করা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সেতার বাদক পন্ডিত রবি শংকর সহ আরও অনেকে। ভিন্ন দেশ, ভিন্ন সংস্কৃতি, তবুও সবাই প্রাণপনে ভালোবেসে গেছে যুদ্ধাহত বাংলাদেশকে। ৫৫ হাজার বর্গমাইলের রক্তাক্ত দেশটির পাশে দাঁড়ানোর জন্য নিবেদিত প্রাণ কাজ করে গেছে বিশ্ববাসী। সরাসরি যুদ্ধ, যুদ্ধের একমাত্র উপায় নয়- প্রমাণ করেছিলেন বাংলার বন্ধু স্যার জর্জ হ্যারিসন। বাংলাদেশের হতভাগ্য শরণার্থীদের সহায়তার লক্ষ্যে ১৯৭১ সালে নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ারে তারা আয়োজন করেন ‘কনসার্ট ফর বাংলাদেশ’। কনসার্টে জর্জ হ্যারিসন ছাড়াও রবি শংকর, বব ডিলান, রিংগো স্টার, এরিক ক্ল্যাপটন, লিওন রাসেল, বিলি প্রেস্টন সহ বিশ্বের সব বিখ্যাত শিল্পীদের সংগীতের মাদকতায় ভেসেছিল লাখ লাখ মানুষ। জোয়ান বায়েজ কনসার্টে আসতে না পারলেও লিখেছিলেন তাঁর অমর গান ‘বাংলাদেশ...বাংলাদেশ’। যুদ্ধ কবলিত বাংলাদেশকে

সাহায্যের হাত বাড়াতেই এই কনসার্ট আয়োজিত হয়েছিল। পন্ডিত রবি শংকরের অনুরোধে এবং উৎসাহেই কনসার্টটির আয়োজনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন বিট জেনারেশনের সৃষ্টিকারী বিটল্‌স-এর জর্জ হ্যারিসন। একটি দেশের স্বাধীনতার সমর্থনে, সেই দেশের চলমান গণহত্যার প্রতিবাদে সেই সময়ের সারা বিশ্ব কাঁপানো সংগীত শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন এই কনসার্টে এবং কালে কালে এই কনসার্ট হয়ে গেল কিংবদন্তী। মূলত শরণার্থীদের আর্থিক সহযোগিতা এবং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সাহায্যার্থে এই কনসার্টের উদ্যোগ নিয়েছিলেন সেতার সম্রাট রবি শংকর। এই কনসার্টের গানে গানে ফুটে উঠে এই কনসার্ট আয়োজনের উদ্দেশ্য; পাক হানাদারদের বর্বরতা ও অধিকারহারা বাঙালির দুঃখগাঁথা। মূল গায়ক জর্জ হ্যারিসন ও তার মানবতাবাদী গায়ক বন্ধুরা গানে গানে এই কথাগুলোই বিশ্ববাসীকে শুনিয়েছেন, জানিয়েছেন। তাঁর সেই উদ্যোগ শুধু আর্থিক সহযোগিতায় সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং বাংলাদেশের অস্তিত্বের কথা, চলমান গণহত্যার কথা, লাখো দেশত্যাগী শরণার্থীর কথা সারা বিশ্বে জানিয়ে দিয়েছেন তাঁরা। তাঁদের কর্মকাণ্ড পাকিস্তানের হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে এবং বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গঠনে ভূমিকা রেখেছে। সেই সময়ের আমেরিকান সরকার বাংলাদেশের জন্মের বিরোধিতা করলেও মার্কিন জনমত ছিল বাংলাদেশের পক্ষে। যার নেপথ্যে অন্যতম কারণ হিসেবে ধরা হয় এই কনসার্টটিকে। মুক্তিযুদ্ধের উন্মাতাল সময়ে লাখো মুক্তিযোদ্ধার বুকে সাহস জুগিয়েছে এই কনসার্ট। আর বিশ্বের মানুষ জেনেছে বাংলাদেশে পাকিস্তানিদের বর্বরতার কথা, লাখো বাঙালির দুর্দশার কথা। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ‘বাংলাদেশ’ নামটির সঙ্গে অনেকের পরিচয়ই হয়েছিল স্বনামধন্য গায়কের এই গানের মাধ্যমে। সেই থেকে বাংলাদেশের দুঃসময়ের বন্ধু ও আপামর বাঙালির প্রাণের স্বজন হিসেবে পরিচিত হয়ে আছেন হ্যারিসন। বিশ্বখ্যাত এ পপ তারকার প্রতি আজও তাই একই রকম ভালোবাসা অনুভব করে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস সংরক্ষণকারী জাদুঘর থেকে শুরু করে বই, পোস্টার, সিডি এমনকি তারুণ্যের প্রিয় পছন্দ হয়ে টি-শার্টে স্থান করে নিয়েছেন কাঁচা-পাকা চুল আর দাড়ি ঢাকা মুখের হ্যারিসন।





## টেড কেনেডি - মার্কিন রাজনীতিবিদ

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় এদেশে যখন গণহত্যার মহোৎসব চলছে, তখন একজন ডেমোক্র্যাট দলীয় সিনেট সদস্য জনপ্রিয় মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন. এফ. কেনেডির কনিষ্ঠ ভ্রাতা টেড কেনেডি পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখার জন্য পূর্ব পাকিস্তানে আসতে চাইলেন, কিন্তু পাক সরকার তাকে এদেশে আসার অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানালো। অগত্যা তিনি এলেন পশ্চিম বাংলায়, ঘুরে ঘুরে দেখলেন শরণার্থী শিবিরগুলো। এভাবেই তিনি জানলেন কী মর্মান্তিক মানবিক বিপর্যয় ঘটে চলেছে বাংলাদেশে। দেশে ফিরে গিয়ে বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে একটি মর্মস্পর্শী দীর্ঘ প্রতিবেদন সিনেটে উপস্থাপন করলেন এবং এই অমানবিক কর্মকাণ্ডে পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক জাভা সরকারকে সমর্থন দানের মার্কিন নীতির তীব্র সমালোচনা করলেন। উল্লেখ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতায় তখন রিপাবলিকান পার্টি এবং দলের নেতা রিচার্ড নিক্সন তখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। খুব স্বাভাবিকভাবেই বিরোধীদলীয় নেতা টেড কেনেডির প্রতিবাদে মার্কিন সরকারের নীতির কোনো পরিবর্তন হলো না, কিন্তু সেই রিপোর্টটি মার্কিন জনগণের মাঝে বাংলাদেশের প্রতি একটি অনুকূল মনোভাব নিশ্চিতভাবেই তৈরি করেছিল। সাম্প্রতিক ইরাক পরিস্থিতির মতোই বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ প্রসঙ্গে মার্কিন সরকার এবং মার্কিন জনগণের মনোভাব তখনও ছিল বিপরীতমুখী। হয়তো জনগণের মনোভাব বাংলাদেশের অনুকূলে থাকার কারণেই সে যুদ্ধে সরাসরি পাকিস্তানের হয়ে যুদ্ধে নামতে পারেনি মার্কিন সেনারা।

পাকিস্তান শোচনীয়ভাবে পরাজিত হওয়ার পর ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে বহু স্বপ্নের স্বাধীনতা অর্জন করে বাংলাদেশ। এডওয়ার্ড কেনেডি ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারিতে আসেন সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে। জনগণের মাঝে তখন মার্কিন বিরোধী মনোভাব অত্যন্ত প্রবল, কিন্তু একজন মার্কিন নাগরিক হয়েও তিনি পেয়েছিলেন জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণঢালা সংবর্ধনা। বিদেশী অতিথি হিসেবে তিনিই প্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংবর্ধনা লাভ করেছিলেন। এত কিছু

পরও যুক্তরাষ্ট্র নতুন জন্ম নেওয়া এ শিশু রাষ্ট্রটিকে স্বীকার করে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। তারা অবস্থান নেয় পশ্চিম পাকিস্তানের পক্ষে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় সে অবস্থানের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তিনি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার অবস্থান জানিয়েছেন।

একান্তরের পরও বিভিন্ন ইস্যুতে তিনি ছিলেন বাংলাদেশের অকৃত্রিম সুহৃদ, একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে সবসময় তিনি বাংলাদেশের অনুকূলে ভূমিকা রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। বাংলাদেশের এ বন্ধু যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেট্‌স অঙ্গরাজ্যে পর পর সাতবার নির্বাচিত সিনেটর ছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে তিনি ছিলেন অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। ২০০৮ সালের মে মাসে তার ব্রেন ক্যান্সার ধরা পড়ে। কিন্তু তাতেও থেমে থাকেনি তার কর্মযজ্ঞ। অহর্নিশ তিনি দুর্গত মানুষের জন্য কাজ করেছেন দেশে দেশে। যেভাবে বাংলাদেশের বিপন্ন মানবতার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, ঠিক সেভাবে কাজ করেছেন বিশ্বের অনেক বিপন্ন জনপদে। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর জনমানুষের এই বন্ধু ২০০৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন। টাইম ম্যাগাজিন ২০০৬ সালে আমেরিকার যে ১০ জন শ্রেষ্ঠ সিনেটরের নাম ঘোষণা করে, তার মধ্যে এডওয়ার্ড কেনেডি অন্যতম। যুক্তরাষ্ট্রের নারী, পুরুষ ও শিশুদের জীবনমানের উপর প্রভাব পড়েছে এমন বহু আইন প্রণয়নে তার ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে।

## সেইসব দরদী বন্ধুদের জন্য ভালোবাসা

একান্তরে আমাদের দুঃসময়ে আমরা পাশে পেয়েছিলাম এমন আরও অনেক বন্ধুকে। স্মরণ করতে হয় ফরাসি লেখক আদ্রঁ মালরোকে, যিনি মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার আহ্বাহ প্রকাশ করে এ দেশকে আপন করে নিয়েছিলেন। মালরো লিখেছিলেন, “বিদ্রোহ যখন শুরু হলো, তখন থেকে ইসলামাবাদের সেনারা পূর্ব বাংলার কাছে আর স্বদেশবাদী বা স্বধর্মীয় থাকল না, তারা পরিণত হলো দখলদার বাহিনীতে”। অ্যালেন গিন্সবার্গের সেই অসাধারণ কবিতা ‘সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড’ কি এখনও আমাদের আত্মাকে আন্দোলিত করে না?



‘লক্ষ শিশু দেখছে আকাশ অন্ধকার/উদর স্ফীত, বিস্ফোরিত চোখে জলধারা/যশোর রোডে বিষণ্ণ সব বাঁশের ঘর/ধুকছে শুধু, কঠিন মাটি নিরুত্তর’।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় আমেরিকান কবি অ্যালেন গিলবার্গ লিখেছিলেন ‘সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড’ কবিতাটি। যার আলোকে মৌসুমি ভৌমিক গেয়েছিলেন ‘যশোর রোড’ গানটি। একান্তরে সাংবাদিক সাইমন ড্রিংয়ের বয়স মাত্র ২৭ বছর। লন্ডন থেকে প্রকাশিত ডেইলি টেলিগ্রাফ এর সংবাদদাতা। কঠোর পাহারার মধ্যেও তিনি বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেছিলেন পাকিস্তানি হানাদারদের নৃশংস হত্যাযজ্ঞ। ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় তৎকালীন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে নজরবন্দী ছিলেন সাইমন ড্রিংসহ চল্লিশ জন বিদেশী সাংবাদিক। ২৭ মার্চ ঢাকার রাজপথে বের হন তিনি। ধ্বংসপ্রায় রক্তাক্ত ঢাকা শহর দেখে শিউরে ওঠেন তিনি। ব্যাংককে ফিরে প্রকাশ করেন ‘ট্যাংকস ড্র্যাশড্ রিভল্ট ইন পাকিস্তান’। প্রকাশ করেন সাড়ে সাত কোটি মানুষকে ঠান্ডা মাথায় থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা, দক্ষ শহর, লাশের পাহাড়, হাজার হাজার মানুষের পালিয়ে যাওয়ার খবর। ১৯৭১ সালের ২১ অক্টোবর যুক্তরাজ্য থেকে প্রকাশিত হয় ‘দ্য টেস্টিমনি অব সিক্সটি’। অক্সফামের সহযোগিতায় ঐতিহাসিক এ দলিল প্রকাশ করে ৬০ জন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির স্বাক্ষর ও প্রত্যক্ষদর্শীর দেখা যুদ্ধাহত পূর্ব পাকিস্তান, হানাদারদের বর্বরতম গণহত্যা এবং অসহায় শরণার্থী শিবিরগুলোর করুণ চেহারা। এখানে লিখেছেন ভিনসেন্ট ফিলিপ, লেব্র হেনরি, অ্যাড্‌হুনি ম্যাসকারেনহাস্, জন পিলজার, এডওয়ার্ড কেনেডিসহ খ্যাতনামা সাংবাদিকরা। শুধু তাই নয়, ব্রিটেনের শ্রমিক দলীয় পার্লামেন্ট সদস্য পিটার শোর ব্রিটিশ সরকারের কাছে আহ্বান জানান, যাতে পশ্চিম পাকিস্তানে কোনো প্রকার অর্থনৈতিক সাহায্য না দেওয়া হয়। একান্তরে ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন কনসাল জেনারেল আর্থার কে ব্লাডও যুদ্ধাহত বাংলাদেশের চেহারা তুলে ধরে মানবিক সাহায্যের সুপারিশ করেন। তার রিপোর্ট চলে যায় মার্কিন সিনেটে। মার্কিন প্রশাসনের দৃষ্টি দিয়ে ঢাকাকে পর্যবেক্ষণ না করায় ব্লাডকে ডেকে পাঠানো হয় ওয়াশিংটনে। বাংলাদেশের যুদ্ধকালে মাদার তেরেসা বারবার আকুলভাবে বিশ্ববাসীকে বলেছেন, ‘মানুষের প্রতি ভালোবাসা দেখাও। তারা সবাই ঈশ্বরের সন্তান’।

এ সময় বাংলাদেশের পাশে আরও ছিলেন মার্কিন সিনেটর এডমুন্ড লাক্সি, মি. ওয়ালডি, জন আর কেলি, মুচর স্যালি, রবার্ট পেইন, স্যার ডগলাস হিউম, রিচার্ড কে টেইলর, সিডনি শনবার্গসহ আরও অনেকে। সারা বিশ্বের মানবতাবাদী মানুষ প্রতিবাদ করেছিল এই গণহত্যা এবং আত্মসনের। আর তাই বিদেশী এসব সাংবাদিক, সাহিত্যিক, লেখক, শিল্পী প্রত্যেকের অবদানই আমাদের জন্য ছিল অমূল্য। তাঁরাও আমাদের একান্তরেরই একটি অংশ। যুদ্ধকালীন টাইম সাময়িকী, দি অবজারভার (লন্ডন), ডেইলি টেলিগ্রাফ (লন্ডন), সাপ্তাহিক ইকোনমিস্ট (লন্ডন), নিউজউইক, ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল, ওয়াশিংটন পোস্ট, হেরাল্ড ট্রিবিউন, স্টেটসম্যান, অমৃতবাজার পত্রিকা, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসসহ অসংখ্য সংবাদপত্র আমাদের মুক্তির সংগ্রামকে রেখেছিল গতিশীল। তাই আমাদের দুঃখ ও বিজয়ের সঙ্গী সেইসব বন্ধুদের আমরা স্মরণ করি বিনম্র শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায়।

### একটি ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা

বাংলাদেশের প্রতি সংহতি আন্দোলনের মোটা দাগের পরিচয় হয়তো আমরা জানি, তবে তার পরতে পরতে মিশে আছে আরও অনেক ছোট-বড় ঘটনা; তাৎপর্যে যা মোটেই ছোট নয়। তাছাড়া এর বাইরে অজানার আড়ালে রয়েছে যেসব ঘটনা বা অবদান, সেসব কথাও তো আমাদের জানতে হবে। স্বল্পজ্ঞাত কিন্তু তাৎপর্যময় একটি ঘটনার উল্লেখ এখানে না করলেই নয়। বাংলাদেশ যে কতভাবে কতজনের কাছে ঋণী, তা বোঝা যাবে আজকের মুম্বাইয়ের ছত্রপতি শিবাজি রেলস্টেশনে, সেদিনের বোম্বের ভিক্টোরিয়া টার্মিনাল বা ভিটি রেলস্টেশনের সামনে, একান্তরের সেপ্টেম্বর মাসে সংঘটিত এক ঘটনায়। স্টেশনের খেটে খাওয়া বুট পালিশ বালকের দল সেদিন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তাদের একদিনের রোজগার তুলে দেবে মহারাষ্ট্রের ‘বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি’র হাতে। তারা সবাই মিলে তুলেছিল উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ। বোম্বের বিশিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান মাহিন্দ্র অ্যান্ড মাহিন্দ্রের নির্বাহী সকালে জুতা পালিশ করিয়ে উদ্বোধন করেছিলেন অর্থ সংগ্রহ অভিযানের। বুট পালিশ বালকদের এই পরম ভালোবাসার অর্থ দানের বার্তা



গুনে বিশেষ আলোড়িত হয়েছিলেন মহারাজের তৎকালীন গভর্নর আলী ইয়ার জং। হায়দ্রাবাদের নিজাম পরিবারের এই সদস্য ছিলেন বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল, ভারতের অবাঙালি মুসলিমদের মধ্যে যা ছিল এক ব্যতিক্রম। এক বিকেলে তিনি বুট পালিশ বালকদের চা পানের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন মালাবার হিলের শ্বেত প্রাসাদে, গভর্নরের ভবনে। এভাবে বুট পালিশ বালকদের কাছে গভর্নর পরিশোধ করেছিলেন তার ঋণ, তবে বাংলাদেশের ঋণ শোধ বুঝি এখনো বাকি রয়ে গেছে।

### উপসংহার

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল স্নায়ু যুদ্ধপীড়িত দ্বন্দ্বমুখর বিশ্বে। পশ্চিমা, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসককূল তখন পাকিস্তান প্রেমে বিভোর। মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা চাণক্য ও ম্যাকিয়াভেলির বিশ শতকীয় মিশ্র সংস্করণ-হেনরি কিসিঞ্জার একান্ত গোপন কূটনৈতিক চালে মগ্ন ছিলেন মাও-সে-তুংয়ের সঙ্গে, যারা উঠতে-বসতে গালমন্দ করছিল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে আর তলে তলে ভিন্নতর আঁতাত গড়তে চেয়েছিল তাদেরই সঙ্গে। দুনিয়ার মানুষ তো দূরের কথা, বিখ্যাত সাংবাদিকেরা ঘুণাঙ্করেও অনুমান করতে পারেননি কী ঘটছে পর্দার আড়ালে? চীন-মার্কিন দূতিয়ালির দায়িত্ব পালন করছিলেন পাকিস্তানি সামরিক শাসক জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান।

এই যখন বিশ্ব পরিস্থিতি, তখন বাংলার দারিদ্র্যপীড়িত নিরন্ন জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে অভূতপূর্ব গণতান্ত্রিক রায় নিয়ে আবির্ভূত হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। রক্তগঙ্গায় সেই আন্দোলনকে ভাসিয়ে দিতে ব্রতী হয়েছিলেন ইয়াহিয়া খান, এর পেছনে মার্কিন সমর্থন ছিল স্বতঃসিদ্ধ। নিরন্ন প্রশাসনের অবস্থানের কারণে অন্যান্য পশ্চিমা দেশও নিয়েছিল বশংবদের ভূমিকা। আর তৃতীয় দুনিয়ার সদ্য স্বাধীন দেশগুলোর অধিকাংশ ছিল পশ্চিমা প্রভাববলয়ে। আরব দুনিয়া তো মার্কিনদের করুণানির্ভর, তদুপরি ইসলামি পাকিস্তান ভাঙার প্রচেষ্টায় ছিল নাখোশ। বাংলাদেশ আন্দোলনের পক্ষে তাই ছিল একমাত্র ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বাধীন গুটিকয়েক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। ফলে একাত্তরে যখন বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম শুরু হলো, তখন ক্ষমতাস্বত্ব পশ্চিমা বিশ্ব ছিল এক অবস্থানে আর পশ্চিমা সমাজ, বিশেষভাবে নবজাগ্রত তরুণেরা ছিল আরেক অবস্থানে। সে কারণেই বাংলাদেশের সংগ্রামের ন্যায্যতা ও মানবিকতার উপাদান অমন বিপুল আলোড়ন তুলতে পেরেছিল দেশে দেশে, হাজার হাজার মানুষ নেমে এসেছিল রাজপথে, আন্দোলনে এবং কতভাবেই না তারা প্রকাশ করেছে সংহতি। এই বিশাল আন্দোলনের হৃদিস গ্রহণ এবং আন্দোলনকারীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন বাংলাদেশের নৈতিক দায়িত্ব।

### তথ্যসূত্র

1. www.amarblog.com,
2. www.somewhereinblog.com
3. info@prothom-alo.info,
4. www.wikipedia.com



ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট রুখ জান্নাত, জিডি(পি) ২৪ ডিসেম্বর ২০০৮ সালে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে জিডি(পি) শাখায় কমিশন লাভ করেন। তিনি বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর বিভিন্ন হেলিকপ্টার স্কোয়াড্রনে কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ৩১ নং স্কোয়াড্রনে স্কোয়াড্রন পাইলট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।



# যুদ্ধবিহীন ভবিষ্যত পৃথিবী : ইউটোপিয়ান ভাবনা অথবা বাস্তবতা- একটি পর্যালোচনা

ক্যাপ্টেন খন্দকার মিসবাহ উল আজীম, (ট্যাজ), পিএসসি, বিএন

## ভূমিকা

সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই মানব ইতিহাসের পাতায় ঠাই পেয়েছে সংঘাত আর সংঘর্ষ। প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সংঘাতের হাত ধরেই সূচিত হয় সামাজিক সংঘর্ষ এবং পরবর্তীতে রাষ্ট্রযন্ত্র গঠন হবার পর থেকে এবং দেশভিত্তিক সামরিক বাহিনীর আবির্ভাবের ফলে পৃথিবীতে যুদ্ধ আর সংঘাত একটি অমোঘ বাস্তবতা। শান্তির অন্বেষণে পৃথিবীর মানুষের নিরন্তর হাহাকার বরাবরই বাধাহ্রস্ত হয়েছে মানুষের সম্পদ, ক্ষমতা আর প্রতিহিংসার কাছে। সভ্যতার ইতিহাসের প্রথমদিকে মিশরিয় ফেরাউনদের সম্পদ আর ক্ষমতালিপ্সার দ্বন্দ্ব, গ্রিক-রোমানদের সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রচেষ্টা, মধ্যযুগে আরব, তুর্কি আর মোঘলদের শৌর্য আর বীরত্বগাঁথা কিংবা পরবর্তীতে ব্রিটিশ-পতুগিজ উপনিবেশিক শাসন ইত্যাদি ঐতিহাসিক ক্রম ঘটনাবলী বস্তুত যুগে যুগে সংঘাতময় এক পৃথিবীর চিত্রই তুলে ধরে।

মধ্যযুগীয় ধারাবাহিকতায় আধুনিক যুগে নব নব প্রযুক্তির আবিষ্কারের ফলে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সামরিক যুদ্ধে ধ্বংস আর মৃত্যুর ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায় আরো বহু গুণে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে প্রায় ১ কোটি ৬৫ লক্ষ মানুষ এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে প্রায় ৬ থেকে ৮ কোটি মানুষ প্রাণ হারায় যা ছিল পৃথিবীর তৎকালীন জনসংখ্যার প্রায় আড়াই থেকে তিন শতাংশ। বিশ্বযুদ্ধসমূহে ধ্বংস হয় শত শত শহর, বন্দর, লোকালয় এবং ঘরছাড়া হয় কোটি কোটি মানুষ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পরবর্তী সংঘটিত বিভিন্ন আন্তঃরাষ্ট্রীয় যুদ্ধ যেমন- কোরিয়ান যুদ্ধ, ভিয়েতনাম যুদ্ধ, পাক-ভারত যুদ্ধ, ফকল্যান্ড যুদ্ধ, ইরান-ইরাক যুদ্ধ এবং আরব-উপসাগর যুদ্ধ ইত্যাদি বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে সংঘটিত হলেও এর ব্যাপকতা অবশ্য প্রথম বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে অদ্যাবধি আন্তঃরাষ্ট্রীয় যুদ্ধের ব্যাপকতা কমে আসার পিছনে আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহের যেমন- জাতিসংঘের বহুমুখী প্রচেষ্টা এবং পাশাপাশি মহাযুদ্ধের করুণ পরিণতির দুঃসহ স্মৃতি অন্যতম কারণ বলে মনে করা হয়। পাশাপাশি কিছু কিছু বৃহৎ রাষ্ট্রের কাছে নিউক্লিয়ার অস্ত্রের প্রাপ্যতার

কারণে স্নায়ুযুদ্ধের প্রসার ঘটায় ব্যাপক আকারে পরিপূর্ণ যুদ্ধের সম্ভাবনা কমে এসেছে বলেও ধারণা করা হয়। তাই বলে পৃথিবীতে সংঘাত আর যুদ্ধ থেমে থাকেনি। উত্তরণ ঘটেছে জাতিগত সংঘর্ষের, উত্থান ঘটেছে রাষ্ট্রযন্ত্রের বাইরের বিভিন্ন ধর্মীয় ও অনানুষ্ঠানিক জঙ্গী সংগঠনের। এর পাশাপাশি সম্পদ, ক্ষমতা এমনকি নিছক ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্বের কারণেও ঘটেছে দেশে দেশে যুদ্ধ আর সংঘাতের ঘটনা। ফলে সার্বিকভাবে যুদ্ধ সংঘাতের সংখ্যা বা ব্যাপকতা বাস্তবে কমে আসছে কিনা এবং ব্যাপক বা Total War এর উন্মাদনা বাস্তবিকই পৃথিবী থেকে মুছে যাচ্ছে কিনা তা পর্যালোচনা করে দেখা প্রয়োজন।

## যুদ্ধ-সংঘর্ষের সাম্প্রতিক গতি-প্রকৃতি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবী থেকে যুদ্ধ-যুগের অবসান এবং এর সম্ভাব্যতা নিয়ে গবেষণায় বারবারই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা আলোচনায় এসেছে। কিন্তু বাস্তবিকভাবে স্নায়ুযুদ্ধকাল ছাড়া বিশেষ করে ১৯৯০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের অবলুপ্তি পরবর্তী পৃথিবীতে তৃতীয় মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা জাগার মত কোনো বাস্তব পরিস্থিতির উদ্ভব হয়নি। সংঘর্ষ বা সংঘাত অবশ্য প্রতিনিয়তই ঘটেছে কিন্তু ব্যাপক আকারে আন্তঃরাষ্ট্রীয় যুদ্ধের ঘটনা চোখে পড়ে খুব কম। যদিও ব্যাপক আকারের বা বিশাল ব্যাপ্তি সম্বলিত যুদ্ধের কোনো সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড বা সংজ্ঞা অদ্যাবধি নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি। তবে সাধারণভাবে যুদ্ধ-সংঘর্ষ কমপক্ষে দুই বা ততোধিক স্বাধীন দেশের মাঝে সংঘটিত হলে এবং এতে হতাহতের সংখ্যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে (সেনা ও সাধারণ জনগণসহ) প্রতি বছরে এক হাজারের বেশি হলে এ ধরনের যুদ্ধকে ব্যাপক আকারের যুদ্ধ বলে ধরে নেয়া হয়।

যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দেশের সংখ্যা	হতাহতের সংখ্যা (সামরিক ও বেসামরিক মোট)
দুই বা ততোধিক স্বাধীন দেশ	প্রতি বছর ১০০০ জনের বেশি

টেবিল-১ : ব্যাপক যুদ্ধের মানদণ্ড





এই স্থূল মানদণ্ডের ভিত্তিতে ২০০৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ইরাক অভিযানের পরবর্তীতে প্রথাগত যুদ্ধের হার অত্যন্ত কমে এসেছে বলা যায়। যদিও সম্প্রতি বেশ কিছু ছোট ছোট সংঘর্ষ, যেমন- ২০০৮ সালে রাশিয়া ও জর্জিয়ার মাঝে সংঘটিত ক্ষণস্থায়ী সংঘর্ষ, উত্তর এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মাঝে চলমান ছোট ছোট সংঘাত অথবা থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ার মাঝে সংঘটিত সীমান্ত সংঘর্ষসমূহ এই মানদণ্ডের নিরিখে ব্যাপক যুদ্ধের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না।

বর্তমান যুগে প্রায় সকল স্বাধীন রাষ্ট্রেরই পর্যাপ্ত রাজনৈতিক ও সামরিক প্রস্তুতি থাকার ফলে তাদের মাঝে যুদ্ধ সংঘটিত হলে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহ ব্যাপকভাবে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হবে— এ ধারণা পৃথিবীতে ক্রমেই প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। যুদ্ধের অনুকূলে মতামতের জন্য সুপরিচিত যুক্তরাষ্ট্র কিংবা মিত্ররাষ্ট্রগুলোর জনগণ এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের মাঝেও যুদ্ধের নেতিবাচক দিকগুলো সম্প্রতি আলোচনায় আসছে ব্যাপকভাবে। গত ২০০২ সালে পাকিস্তান ও ভারত যুদ্ধের প্রায় দ্বারপ্রান্তে এসেও লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণহানির সম্ভাবনা বিবেচনা করে দু'দেশই পরবর্তীতে পিছিয়ে আসে সংঘর্ষের পথ থেকে। উত্তর এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মাঝে সীমান্ত সংঘর্ষের ঘটনা কিংবা সম্প্রতি গণচীনে সামরিক শক্তির উত্থান এবং ফলস্বরূপ পার্শ্ববর্তী সমুদ্র অঞ্চলে পেশীশক্তির প্রদর্শন ইত্যাদি ঘটনাবলী সামরিক উত্তেজনা সৃষ্টি করলেও এর মাধ্যমে ব্যাপক যুদ্ধের জন্ম হবার সম্ভাবনা কম বলে ধারণা করা হয়। আর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সহায়তায় সামরিক শক্তির প্রয়োগ ঘটানোর সম্ভাবনা থাকলেও হাঁসের ডিমের জন্য রাজহাঁসকে হত্যার মত বোকামির কথা বিবেচনা করে ভবিষ্যতে চীন ব্যাপক কোনো যুদ্ধে জড়াবে কিনা তা এখনো প্রশ্নবিদ্ধ। এছাড়া সম্প্রতি ব্রিটিশ পার্লামেন্টে সিরিয়া যুদ্ধবিরোধী ঐতিহাসিক বিল পাশ এবং পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক সিরিয়া আক্রমণের দ্বারপ্রান্ত থেকে ফিরে আসার ঘটনাও এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। ফলে সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনায় সাম্প্রতিক বিশ্বে আন্তঃরাষ্ট্রীয় যুদ্ধ-সংঘটনের সম্ভাবনা খুবই কম বলে ধরে নেয়া যেতে পারে।

প্রথাগত আন্তঃরাষ্ট্রীয় যুদ্ধ-সংঘটনের সম্ভাবনা কমে গেলেও বিভিন্ন সামাজিক, জাতিগত ও ধর্মীয় দাঙ্গা এবং সংঘর্ষ চলমান শতক তথা ভবিষ্যতেও চলমান থাকবে বলে ধারণা করা যায়। তবে ব্যাপকতার মানদণ্ডে এসব সংঘর্ষে বছরে সহস্রাধিক প্রাণহানির ঘটনা সম্প্রতি ঘটেনি। আফগানিস্তান যুদ্ধে অদ্যাবধি প্রায় ৫০০০ আফগান জনগণ ও ৫০০ হতে ১০০০ আমেরিকান সৈন্য মৃত্যুবরণ করলেও একই ধরনের সংঘর্ষে ভিয়েতনাম যুদ্ধে প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার ভিয়েতনামি জনগণ এবং প্রায় ৫ হাজার আমেরিকান সৈন্য হতাহত হয়। সে হিসেবে আফগান যুদ্ধের ধ্বংস ব্যাপকতা ভিয়েতনাম যুদ্ধের চেয়ে তুলনামূলকভাবে অনেক কম বলা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হতে যুদ্ধ এবং এর ব্যাপকতার হার বিশ্লেষণ করলে নিচের টেবিলে একই ধরনের চিত্র ফুটে উঠে :

যুদ্ধকাল	হতাহতের সংখ্যা (গড়)	মন্তব্য
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন (১৯৩৯-১৯৪৫)	৩০০ জন	প্রতি ১ লক্ষ মানুষের মধ্য হতে
কোরিয়ান যুদ্ধকালীন (১৯৫০-১৯৫৩)	৩০ জন	
ভিয়েতনাম যুদ্ধকালীন (১৯৬৫-১৯৭৫)	১০ জন	
শ্রীযুযুদ্ধ (১৯৯০) পরবর্তী	১ জন	
২১ শতক		

টেবিল-২ : বিভিন্ন যুদ্ধে গড় হতাহতের তুলনামূলক চিত্র

লক্ষ্য করলে দেখা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সাধারণভাবে কোনো দেশের সীমান্তরেখা শুধু যুদ্ধের মাধ্যমে তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটেনি বললেই চলে। জাতিসংঘের কোনো সদস্য দেশই অপর দেশের আক্রমণের স্বীকার হয়ে সার্বভৌমত্ব বা স্বাধীনতা হারায়নি। কোরিয়ান যুদ্ধের ব্যাপক প্রাণহানি কিংবা ইরাকের কুয়েত দখল বা ইসরায়েল কর্তৃক ১৯৬৭ পরবর্তী ভূমি দখল ইত্যাদির ফলে বিভিন্ন দেশের সীমান্ত এলাকা সাময়িকভাবে পরিবর্তিত বা দখল হলেও পরবর্তীতে তা প্রায় পূর্ব অবস্থানে ফিরে এসেছে অথবা সামান্য পরিবর্তনের মাধ্যমে স্থিরাবস্থা বিরাজ করছে।



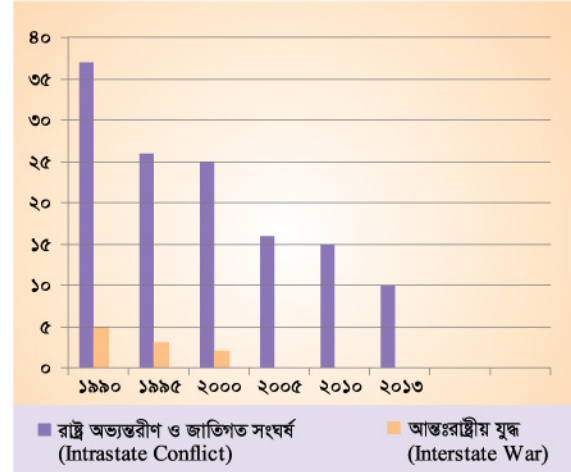
সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকে এমনকি ১৮ বা ১৯ শতকেও ভূমি সম্পদকেই উন্নয়নের মূল উৎস বলে বিবেচনা করা হত। ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাবিকাঠি হিসেবে অন্য দেশের সম্পদপূর্ণ ও সম্ভাবনাময় ভূমি এলাকা বিজয় বা দখল করা ছিল যুদ্ধের বাস্তবতা। কিন্তু আধুনিক যুগে আন্তঃদেশীয় বাণিজ্য, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়েছে। তাই যুদ্ধ বরং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিপন্থী বলেই বিবেচিত হচ্ছে এবং যুদ্ধের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের শ্লোগান পৃথিবীতে যে ক্রমেই আবেদন হারাচ্ছে তা নির্দিষ্ট বলা যায়।

### যুদ্ধ-সংঘর্ষের ক্রমধারা

২১ শতকে যুদ্ধ-সংঘর্ষের ধারা পর্যালোচনা করলেও সনাতন প্রথাগত সামরিক সংঘর্ষের বদলে ক্রমেই আধা-সামরিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক সামরিক শক্তির (Non State Actors) উত্থানের বিষয়টি চোখে পড়ে। এ প্রেক্ষিতে পৃথিবীব্যাপী নানা সংঘর্ষে সামরিক বাহিনীর প্রশিক্ষিত সৈন্যদের চেয়ে সাধারণ নাগরিকরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। গত ১৯ শতকে যুদ্ধ-সংঘর্ষে সামরিক ও বেসামরিক নাগরিকের হতাহতের গড় অনুপাত ছিল প্রায় সামরিক ৯০% এবং বেসামরিক ১০% জনগণ। কিন্তু বিগত কয়েক দশকে এই অনুপাত প্রায় ৫০ : ৫০ এ এসে ঠেকেছে। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে মিত্র ও অক্ষ বাহিনীর যুদ্ধবিমান শহরের পর শহরে যেভাবে সাধারণ ঘরবাড়ি ধ্বংস আর বেসামরিক হতাহতের ঘটনা ঘটিয়েছে সে তুলনায় বিগত দশকের আত্মত্যাগী সুইসাইড বোম্বার বা জাতিগত দাঙ্গার ভয়াবহতা অনেক কমই বলা যায়।

বস্তুত শ্রীযুদ্ধের (Cold War) পর থেকেই পৃথিবীতে ক্রমাগত যুদ্ধ-সংঘর্ষের ধারা নিম্নগতিতে ধাবমান বলে বিভিন্ন গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ১৯৯০ সালে বড় আকারের যুদ্ধ এবং রাষ্ট্র-অভ্যন্তরীণ ও জাতিগত দাঙ্গা ইত্যাদি মিলে সংঘর্ষের সংখ্যা ছিল মোট ৩৭টি এবং এর বিপরীতে ২০১০ সালে এ সংখ্যা কমে মোট জাতিগত দাঙ্গা ১৫ এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় যুদ্ধের সংখ্যা শূন্যতে এসে ঠেকেছে। একই ধরনের গবেষণায় দেখা যায়, ১৯৯২ সালে পৃথিবীর প্রায় ৩০ ভাগ দেশ বা অঞ্চল কোনো না

কোনো প্রকার যুদ্ধ-সংঘর্ষে জড়িয়ে ছিল। কিন্তু সম্প্রতি ২০১৩ সাল নাগাদ যুদ্ধ-সংঘর্ষের এ হার মাত্র ১৩ শতাংশে নেমে এসেছে। বিশেষ করে ২১ শতকের প্রথম দশকে আন্তঃরাষ্ট্রীয় (Interstate) যুদ্ধ-সংঘর্ষের হার ছিল মাত্র ৭ শতাংশ (মোট ২৯টি সংঘর্ষের মধ্যে ২টি) এবং আশ্চর্যজনকভাবে সত্যি, গত প্রায় ১০ বছরে (২০০৪ হতে অদ্যাবধি) দুটি স্বাধীন দেশের মাঝে কোনো প্রথাগত সংজ্ঞার সামরিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। আন্তঃরাষ্ট্রীয় যুদ্ধবিহীন সময়কাল বিবেচনায় এত দীর্ঘ (প্রায় এক দশক) বিরতি পৃথিবীর ইতিহাসে একটি বিরল ঘটনা। এ প্রেক্ষিতে ১৯৯০ সাল থেকে অদ্যাবধি পৃথিবীতে সংঘটিত আন্তঃরাষ্ট্রীয় ও জাতিগত সংঘর্ষের একটি তুলনামূলক চিত্র নিচে তুলে ধরা হলো :



গ্রাফ ১ : যুদ্ধ-সংঘর্ষের ধারা (১৯৯০ ও পরবর্তী)

চলমান শান্তিপূর্ণ পরিবেশের স্থায়িত্বকাল নির্ভর করে নতুন করে কোনো যুদ্ধ সংঘটনের উদ্ভব হওয়া বা না হওয়ার উপর। বিগত কয়েক দশক ধরেই চলমান আন্তঃরাষ্ট্রীয় যুদ্ধ বা রাষ্ট্র অভ্যন্তরীণ ও জাতিগত সংঘর্ষের ধারা পর্যালোচনা করলে নতুন সৃষ্টি হওয়া যুদ্ধ-সংঘর্ষের সংখ্যা খুবই কম বলে লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর (১৯৫০-৬৭) দেশে দেশে ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকালে বেশ কিছু নতুন দেশে সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা হয়। ফলে নতুন বেশ কিছু সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। পরবর্তীতে পুনরায় ১৯৮৯-৯৩ সময়ে শ্রীযুদ্ধের অবসানের সাথে সাথে বেশ কিছু নতুন সংঘর্ষের উদ্ভব হয়। কিন্তু পরবর্তী সময়কালে চলমান সংঘর্ষের বাইরে সম্পূর্ণ নতুনভাবে তেমন আর কোনো সংঘর্ষের সূত্রপাত লক্ষ্য করা যায় না।





ভৌগোলিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, সম্প্রতি সময়ে ইউরোপ ও আমেরিকা মহাদেশে সংঘটিত যুদ্ধের সংখ্যা পূর্বের তুলনায় অনেক কমে এসেছে। নব্বইয়ের দশকের শুরুতে বলকান অঞ্চলে জাতিগত ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় যুদ্ধের ফলে ইউরোপে সর্বশেষ যুদ্ধের হার বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গিয়েছিল। অপরদিকে, মধ্য এবং দক্ষিণ আমেরিকায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সর্বশেষ সংঘর্ষ উপাত্তের বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায় ১৯৮০ সালে। বর্তমান সময়ে সবচেয়ে বেশি সংঘর্ষ (বিশেষ করে আন্তঃরাষ্ট্রীয় জাতিগত দাঙ্গা) লক্ষ্য করা যায় আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশ অঞ্চলে। তবে কিছু আন্তর্জাতিক ভূমিকা থাকলেও সেগুলো সবই রাষ্ট্র-অভ্যন্তরীণ (Intrastate) সংঘর্ষ বলে বিবেচনা করা যায়। যুদ্ধ-সংঘর্ষে বিভিন্ন দেশের অংশগ্রহণের ধারা পর্যালোচনা করে দেখা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৫০ সালে সংঘটিত কোরিয়ান যুদ্ধে সর্বোচ্চ ২০টি দেশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। পরবর্তীতে ১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধে প্রায় ৩০টি দেশ অংশগ্রহণ করে। এছাড়া আফগানিস্তান যুদ্ধে ৩৯টি, ইরাক যুদ্ধে ৩৩টি এবং জঙ্গী সংগঠন আল-কায়েদার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে প্রায় ১৮টি দেশ যৌথভাবে অংশগ্রহণ করে।

যুদ্ধ-সংঘর্ষের মৃত্যুহার বিশ্লেষণ করলে দৃশ্যমান হয় যে প্রথম আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মৃত্যুহার অদ্যাবধি সংঘটিত বিভিন্ন যুদ্ধ-সংঘর্ষের তুলনায় অনেক অনেক গুণ বেশি। এর কারণ হিসেবে পৃথিবীতে যুদ্ধের চরিত্র পরিবর্তনের বিষয়টি সামনে চলে আসে। সম্প্রতি আন্তঃরাষ্ট্রীয় (Interstate) সংঘর্ষের চেয়ে রাষ্ট্র-অভ্যন্তরীণ (Intrastate) জাতিগত সংঘর্ষের হার অনেক বেড়ে গেছে। ফলে সশস্ত্র বাহিনীর সুসংগঠিত অস্ত্র-সরঞ্জাম কম ব্যবহার হওয়ায় মৃত্যুহার কম হতে পারে বলে ধারণা করা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীতে হতাহতের দিক থেকে ভয়াবহতার শীর্ষ তালিকায় উল্লেখ করা যায় ৫০ দশকের কোরিয়ান যুদ্ধ ও চীনের সামাজিক যুদ্ধ এবং পরবর্তীতে ভিয়েতনাম যুদ্ধ (১৯৬৫-৭৫), ইরান-ইরাক যুদ্ধ (১৯৮০-৮৮) এবং সোভিয়েত-আফগান যুদ্ধকে। এছাড়া জাতিগত সংঘর্ষে হতাহতের সর্বোচ্চ সংখ্যা ছিল কঙ্গো (১৯৯৬-২০০১) ও রুয়ান্ডায় (১৯৯৪) সংঘটিত জাতিগত দাঙ্গায়। তবে সার্বিক বিশ্লেষণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হতে অদ্যাবধি যুদ্ধ-

সংঘর্ষে হতাহতের সংখ্যা যে ক্রমেই নিম্নগামী তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

### যুদ্ধ-সংঘর্ষের নিম্নগতির প্রভাবক

বিগত কয়েক শতাব্দীর মধ্যে বর্তমান শতাব্দীতে দেশে দেশে যুদ্ধের হার সবচেয়ে কম বলে ধারণা করা হচ্ছে। যুদ্ধের এই নিম্নগতি বিশ্লেষণে বেশ কিছু সাম্প্রতিক তথ্য উল্লেখযোগ্য :

ক। **অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি** : অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যুদ্ধ-সংঘর্ষের নিম্নগতির অন্যতম নিয়ামক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বাৎসরিক প্রবৃদ্ধির হার কম এবং মাথাপিছু আয় বা মাথাপিছু জিডিপি কমসম্পন্ন দেশসমূহে অপেক্ষাকৃত বেশি সংখ্যক জাতিগত দাঙ্গা বা সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। সামাজিক বৈষম্যের ব্যবধান কমে আসার সাথে সাথে বিভিন্ন দেশে জাতিগত সংঘর্ষের নিম্নগতি উল্লেখ করার মত। এছাড়া আমদানি দ্রব্য—বিশেষ করে জ্বালানী এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের উপর পর-নির্ভরশীলতা আন্তঃরাষ্ট্রীয় বা রাষ্ট্র অভ্যন্তরীণ জাতিগত সংঘর্ষ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ বলে বিবেচিত হচ্ছে। বিগত দশকগুলোতে পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ মনোযোগী হওয়ায় যুদ্ধ-সংঘর্ষের সাধারণ গতি নিম্নদিকে ধাবমান বলে ধারণা করা হয়।

খ। **রাজনৈতিক পরিস্থিতি** : সংশ্লিষ্ট দেশ বা দেশসমূহের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বা সরকারব্যবস্থা যুদ্ধ-সংঘর্ষের ধারাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। সাধারণ বিবেচনায় দেশের স্থিতিশীলতা যুদ্ধ-সংঘর্ষের ধারাকে নিচের দিকে রাখতে সক্ষম হলেও সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার ব্যবস্থাও এক্ষেত্রে অন্যতম নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। গতানুগতিক ধারণার ব্যতিক্রম হিসেবে লক্ষ্য করা যায়, শুধু গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা সংঘর্ষের নিম্নগতি রক্ষায় একমাত্র বা মূল প্রভাবক নয়। গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার পাশাপাশি স্থিতিশীল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যৌথভাবে যুদ্ধ সংঘটনের হার নিচের দিকে রাখতে সহায়তা করে থাকে। বিশ্বব্যাংকের বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ পল কোলি গবেষণায় প্রমাণ



করেন, একটি গণতান্ত্রিক দেশের জনগণের মাথাপিছু বাৎসরিক আয় ২৭০০ মার্কিন ডলারের সীমারেখা (Threshold) অতিক্রম করলে সে সমস্ত দেশে শান্তি অবস্থা সাধারণত দীর্ঘ সময় ধরে বিরাজ করে থাকে। যুদ্ধ পরিণতির জন্য স্বৈরাচারী সরকারের চেয়ে বরং আধা-গণতান্ত্রিক বা অস্থিতিশীল সরকার ব্যবস্থা বেশি দায়ী বলে লক্ষ্য করা যায়। স্বৈরাচারী অথবা অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক দেশ তুলনামূলকভাবে অস্থিতিশীল আধা-গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন দেশের তুলনায় যুদ্ধ সংঘটনের হারকে নিচের দিকে রাখতে বেশি সক্ষম বলে গবেষণায় দৃষ্ট হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সুদৃঢ় গণতন্ত্র এবং পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে মনোযোগী হওয়ায় দেশে-দেশে যুদ্ধের হার নিম্নগতির অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

গ। সার্বিক যুবসংখ্যা : একটি দেশের জনসংখ্যা এবং জনসংখ্যার বিভিন্ন বয়সভিত্তিক বিভাজন যুদ্ধ-সংঘর্ষের ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক হারকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। একটি দেশের জনসংখ্যার মধ্যে ১৫ হতে ২৪ বৎসর বয়সী যুবসংখ্যার শতকরা হারকে যুদ্ধের ইতিবাচক উপাত্ত বলে ধারণা করা হয়। এছাড়া ঘনবসতি সম্পন্ন দেশসমূহে কম ঘনবসতিসম্পন্ন দেশসমূহের তুলনায় যুদ্ধ-সংঘর্ষের সম্ভাব্যতা বেশি বলে বিবেচনা করা হয়। গত তিন দশকে পৃথিবীতে যুবগোষ্ঠীর (১৫ হতে ২৪ বৎসর) হার ক্রমাগত কমে এসেছে। বিগত ১৯৮০ সালে পৃথিবীতে যুবগোষ্ঠীর হার ছিল মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩৫ ভাগ, ক্রমাগত নেতিবাচক ধারায় যুবগোষ্ঠীর সংখ্যা ২০৩০ সালের মধ্যে পৃথিবীর মোট জনশক্তির ২৫% এবং ২০৫০ সালে মাত্র ২০% এর অংশীদার হবে বলে পরিসংখ্যানে পাওয়া যায়। যুবগোষ্ঠীর এই নিম্নহার পৃথিবীতে ২০৫০ সালের মধ্যে সংঘর্ষ-সংঘাতের হার ১৫% এর নিচে নিয়ে আসবে বলে ধারণা করা যায়।

ঘ। পরিবর্তিত সামষ্টিক মানসিকতা : পৃথিবীর ইতিহাসে যুদ্ধের কারণ হিসেবে সম্পদ তথা ভূমি দখলের জন্য যুদ্ধ আর সংঘর্ষের ঘটনা চোখে পড়ে সবচেয়ে বেশি। কিন্তু বিগত দশকগুলোতে শুধু

সম্পদের জন্য এরূপ সংঘর্ষের হার অনেক কমে এসেছে। তথ্য-বিশ্লেষণে ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখলের ঘটনাকে সম্পদের জন্য পৃথিবীর বুকে শেষ যুদ্ধ বলে অনেকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ কুয়েঙ্গী রাইটের মতে ‘বিশ্বায়ন (Globalization) এর ফলে পৃথিবীতে সম্পদ ক্রয়, দস্যুবৃত্তি বা চৌর্যবৃত্তির মাধ্যমে সম্পদ আহরণের চেয়ে সার্বিকভাবেই সুলভ’। সমুদ্র-সম্পদের জন্য সম্প্রতি দক্ষিণ-চীন সাগর এলাকা বা অন্যান্য এলাকায় উত্তেজনাঙ্কর পরিস্থিতি প্রাকৃতিক সম্পদের প্রয়োজনীয়তা বা ভাগাভাগির বিরোধের কারণে নয় বরং তীব্র জাতীয়তাবাদের স্কুলিঙ্গে জ্বলে উঠার সম্ভাবনা অনেক বেশি বলে গবেষকরা মনে করেন। তবে জাতিগত দাঙ্গার ক্ষেত্রে সম্পদের ভূমিকা এখনও বিশেষ নিয়ামক। যদিও বিগত দিনগুলোতে অন্যান্য কারণের তুলনায় ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে সংঘর্ষের হার জাতিগত সংঘর্ষের ক্ষেত্রে অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৪০ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে মোট জাতিগত সংঘর্ষের প্রায় ২৫ শতাংশ সংঘটিত হয়েছিল ধর্মীয় কারণে। পাশাপাশি ২১ শতকের প্রথম বছরে এ হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৩ শতাংশে। সম্পদ এবং অন্যান্য বিষয় যেমন-পরিবেশ বা আবহাওয়া পরিবর্তনের বদলে যুদ্ধ-সংঘর্ষের ধারণা পরিবর্তিত হয়ে ক্রমেই ধর্মীয় চেতনা, জাতীয় চেতনা ইত্যাদি মানসিক দিকসমূহ আধুনিক মননে বেশি প্রভাব ফেলায় পৃথিবীতে প্রথাগত দেশভিত্তিক যুদ্ধের হার কমে আসছে। অন্যদিকে, অঞ্চলভিত্তিক জাতিগত দাঙ্গার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। সার্বিকভাবে সম্প্রতি সামষ্টিক মানসিকতার পরিবর্তন-এ ধারার প্রেক্ষাপটে আন্তঃরাষ্ট্রীয় যুদ্ধ সংঘটনে নেতিবাচক প্রভাবক হিসেবে কাজ করছে বলে ধারণা করা যায়।

### অন্যান্য নেতিবাচক উপাত্ত

ক। শ্লাঘ্যযুদ্ধের (Cold War) পরিসমাপ্তি : শ্লাঘ্যযুদ্ধকালে এটি বাস্তব সত্য ছিল যে যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজ নিজ প্রভাব বলয় বজায় রাখার স্বার্থে বিভিন্ন সশস্ত্র গ্রুপ বা গোষ্ঠীকে সাহায্যের মাধ্যমে তৃতীয় অপর দেশে পরোক্ষ বা প্রক্সি (Proxy) যুদ্ধ পরিচালনা করতো।





উদাহরণস্বরূপ নিকারাগুয়া, এল সালভেদর, এঙ্গোলা এবং মোজাম্বিকে সংঘটিত যুদ্ধ-সংঘর্ষের কথা উল্লেখ করা যায়। স্নায়ুযুদ্ধের পরিসমাপ্তির সাথে সাথে বৃহৎ ও শক্তিশালী দেশগুলো এরূপ সরাসরি সামরিক সাহায্যের মাধ্যমে যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটানোর কার্যক্রম থেকে অনেকটাই সরে এসেছে। সম্প্রতি এরকম কিছু সন্দেহজনক সংঘর্ষের ঘটনা থাকলেও নিশ্চিতভাবে বা খোলাখুলিভাবে অপর দেশে প্রস্তুি যুদ্ধ পরিচালনার ঘটনা বর্তমানে অদৃশ্য বললেই চলে। পৃথিবীতে যুদ্ধ-বিগ্রহের হার কমাতে বিষয়টি বিশেষ প্রভাব ফেলেছে। ফলে স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তীতে যুদ্ধ-বিগ্রহের হারে ব্যাপক নিম্নগতি লক্ষ্য করা যায়।

খ। জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর ভূমিকা : বিশ্বের বুকে শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টায় জাতিসংঘের অনেক দুর্বলতা এবং সমালোচনা থাকলেও অনেক ক্ষেত্রেই যুদ্ধ পরিস্থিতি সামাল দিতে, যুদ্ধ বন্ধ করতে বা যুদ্ধ পরবর্তী পরিস্থিতি উন্নয়নে জাতিসংঘ যে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। পৃথিবীর বুকে বিভিন্ন মিশনে প্রায় ১ লক্ষের উপর সেনাদল ইউএন পতাকার আওতায় বিশ্ব শান্তিতে ব্যাপক ভূমিকা রেখে চলেছে। অপরপক্ষে, নিরাপত্তা এবং সাধারণ পরিষদের কিছুটা দুর্বলতা থাকলেও যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে জাতিসংঘ বিগত কয়েক দশকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। পৃথিবী জুড়ে বর্তমানে যুদ্ধ-দামামার নিম্নগতির অন্যতম কারণ হিসেবে জাতিসংঘের ইতিবাচক অবদান অনস্বীকার্য।

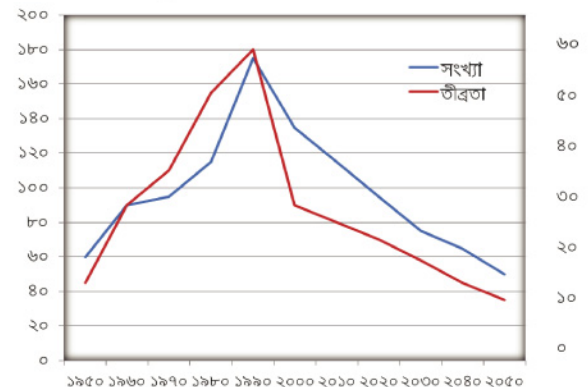
গ। আন্তর্জাতিক সমতা ও বিচার : স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর থেকেই আন্তর্জাতিক বিচারালয় (ICJ) এর কর্মপরিধি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক আইন (International Law) ও মানবতাবিরোধী অপরাধ-আইন, লিঙ্গ-বৈষম্য ইত্যাদি বিষয়ের বাস্তব প্রয়োগ এবং যুদ্ধাপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ ও আন্তর্জাতিক আইন বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বিচার প্রক্রিয়ার পক্ষে দেশে দেশে ব্যাপক সচেতনতার সৃষ্টি হয়েছে। যুদ্ধকালে সীমা অতিক্রম করার মত কার্যকলাপ নিবৃত্ত করতে এ ধরনের বিচার প্রক্রিয়া অত্যন্ত কার্যকর বলে প্রতীয়মান

হচ্ছে। যুদ্ধ সংঘটনের দীর্ঘদিন পরেও বিচার প্রক্রিয়া সংঘটনের বেশ কিছু ঘটনায় দেশে দেশে যুদ্ধবাজ নেতা, সেনাসদস্য ও সুবিধাবাদী গোষ্ঠীর যুদ্ধ প্রবৃত্তির উপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে সার্বিক যুদ্ধের হারে বিষয়টি উল্লেখযোগ্য নেতিবাচক প্রভাব রাখছে বলে প্রতীয়মান।

## যুদ্ধের অবসান ও ইউটোপিয়ান ভাবনা

সাধারণ বিবেচনায় মানব ইতিহাসে যুদ্ধ-বিগ্রহের অবসান একটি অকল্পনীয় বিষয় বলেই মনে হতে পারে। কিন্তু সার্বিকভাবে বিগত বছরগুলোতে যুদ্ধ-সংঘর্ষের ধারা বিশ্লেষণ করে যুদ্ধের ধারা অব্যাহত থাকবে কিনা তা ভাববার বিষয়। পৃথিবী থেকে যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পূর্ণভাবে মুছে যাওয়ার বিষয়টি অবশ্যই অকল্পনীয় তবে সার্বিক বিশ্লেষণে যুদ্ধ-বিগ্রহের সংখ্যা যে ভবিষ্যতে অত্যন্ত নগণ্য আকার ধারণ করবে তা নিশ্চিত করে বলা যায়। তবে সনাতন প্রথাগত যুদ্ধের সংজ্ঞার বিপরীতে আগামী দিনের যুদ্ধ তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর বা অন্যান্য আধুনিক প্রযুক্তিকে ভর করে সূচনা হতে পারে বলে ধারণা করা যায়। তবে যে কোনো প্রেক্ষাপটেই সার্বিকভাবে যুদ্ধ-বিগ্রহের ক্রমধারা যে ক্রমেই নিম্নমুখী তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। সার্বিক বিশ্লেষণে নেতিবাচক এই ধারা ক্রমাগত অব্যাহত থেকে বর্তমান শতকের শেষে এসে প্রায় শূন্যের কোটায় ঠেকবে বলে মনে করা হচ্ছে।

অদূর ভবিষ্যতে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম একটি যুদ্ধবিহীন শান্তিময় পৃথিবীর দেখা পাবে বলে সত্যিই আশা করা যায়। নিম্নে বিগত শতক হতে আগামী ২০৫০ সাল পর্যন্ত যুদ্ধ-বিগ্রহের একটি তুলনামূলক ভবিষ্যত চিত্র তুলে ধরা হলো :



গ্রাফ-২ : যুদ্ধ-সংঘর্ষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত



যুদ্ধ-সংঘর্ষের সংখ্যা ও তীব্রতার এই লেখচিত্র নিবিড় পর্যবেক্ষণে অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় বর্তমান এবং একই ধারাবাহিকতায় ভবিষ্যত পৃথিবীতে সনাতন রাষ্ট্র বনাম রাষ্ট্রের মাঝে যুদ্ধের হার কমে ক্রমেই শূন্যের কোটায় আসবে সে চিত্রই ফুটে উঠে। যদিও কিছু কিছু বিষয় যেমন- জ্বালানী সম্পদ বা পানি সম্পদের কারণে তথা অর্থনৈতিক যুদ্ধ স্কুলিঙ্গ পৃথিবীর নানা স্থানেই বর্তমান রয়েছে। এছাড়া ধর্মীয় অথবা জাতিগত বিভাজনের কারণেও যুদ্ধ বিস্তৃতির বিষয়টি উড়িয়ে দেয়া যায় না। তবে সার্বিক বিবেচনায় যুদ্ধের বিপরীতে শান্তি তথা যুদ্ধবিহীন পৃথিবীর সম্ভাবনাই আলোকিত হয়ে উঠে। জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার ইতিবাচক ভূমিকা, পৃথিবীর সাধারণ জন-মানুষের যুদ্ধবিমুখ সামষ্টিক মানসিকতা এবং দেশে দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জয়গানে পৃথিবীতে তাই যুদ্ধের দামামা নয় বরং শান্তির কপোতের চিরন্তন বিচরণের সম্ভাবনাই বেশি বলে বিবেচনা করা যায়।

### উপসংহার

পৃথিবীর দীর্ঘদিনের যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাস পর্যালোচনায় বর্তমান শতকে এবং বিশেষ করে বিগত

শতকের শেষ সময়ে শ্রায়ুযুদ্ধের অবসানের পর থেকে অদ্যাবধি পৃথিবীতে যুদ্ধ ও সংঘাতের সংখ্যা ক্রমেই কমে আসছে। বিগত দিনগুলোতে অনেক বোদ্ধা ভবিষ্যত পৃথিবীকে সংঘাতময় বলে চিহ্নিত করেছিলেন। সম্পদের ক্রমাগত সংকোচন, জনসম্পদের বৃদ্ধি, ধর্মীয় চেতনা ও জাতীয়তাবাদের উত্থান ইত্যাদি বিবিধ কারণে সভ্যতার সংঘর্ষ, সম্পদ সংঘর্ষ বা পরিবেশ দ্বন্দ্ব ইত্যাদি নানা মোড়কে পৃথিবী সংঘাতে পরিপূর্ণ থাকবে বলেই ধারণা করা হয়েছিল। কিন্তু এরূপ নেতিবাচক ধারণার বিপরীতে সভ্যতার ক্রমবিকাশ, বিচার বিবেচনার উৎকর্ষ আর মানসিকতার ব্যাপক পরিবর্তনের ফলে বর্তমান পৃথিবীতে যুদ্ধ-বিগ্রহের হার ব্যাপকভাবে কমে আসছে এবং ভবিষ্যতে এই হার আরো অনেক কমে এসে শূন্যের কোটায় এসে ঠেকবে বলে ধারণা করা যায়। সার্বিক বিবেচনায় পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধবিহীন শান্তিময় আগামী পৃথিবী তাই আর কোনো ইউটোপিয়ান বা আকাশ-কুসুম কোনো ভাবনা নয় বরং সত্যিকার অর্থেই একটি বাস্তবতা বলে ধরে নেয়া যায়। এই বাস্তবতায় আমাদের আগামী প্রজন্ম যুদ্ধ-সংঘর্ষের বিষবাস্প হতে দূরে থাকুক- এ প্রত্যাশা পৃথিবীর শান্তিকামী প্রতিটি মানুষের।

### তথ্যসূত্র

- ১। গ্লোবাল ট্রেন্ড ইন আরমড কনফ্লিক্ট, হালভার্ড বুহাগ এন্ড আদার্স, আন্তর্জাতিক পিস্ রিসার্চ ইনস্টিটিউট জার্নাল, অসলো (পিআরআইও), সেপ্টেম্বর ২০১২।
- ২। ওয়ার রিয়েলি গোয়িং আউট অব স্টাইল, জসুয়া গোল্ডস্টাইন ও স্টিফেন পিনকার, আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় জার্নাল, নিউইয়র্ক, ডিসেম্বর ২০১১।
- ৩। দি ডিমাইস অব আর্কস : দি এন্ড অব ওয়ার, ক্রনো টেরটারিস, ইয়েল ইউনিভার্সিটি, দি ওয়াশিংটন কোয়টারলি, নং ৩, ২০১১।
- ৪। দি বেটার এনজেলস অব আওয়ার নেচার : হোয়াই ভায়োলেস হ্যাঙ্গ ডিক্লাইড, পেঙ্গুইন গ্রুপ, নিউইয়র্ক, ২০১১।



ক্যাপ্টেন খন্দকার মিসবাহ উল আজীম, (ট্যাজ), পিএসসি, বিএন রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ হতে এসএসসি ও এইচএসসি উভয় পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করেন এবং অফিসার ক্যাডেট হিসেবে ১ জানুয়ারি ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে যোগদান করেন। তিনি রয়্যাল মালয়েশিয়ান নেভাল ট্রেনিং ডিপার্টমেন্ট থেকে সফলতার সাথে প্রশিক্ষণ শেষে ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে এক্সিকিউটিভ শাখায় কমিশন লাভ করেন। তিনি ভারত থেকে টর্পেডো এন্ট সাবমেরিন (ট্যাজ) বিষয়ে স্পেশলাইজেশন কোর্স এবং ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজ, মিরপুর ও ভারতের ওয়েলিংটনে অবস্থিত ডিফেন্স সার্ভিসেস স্টাফ কলেজ হতে কৃতিত্বের সাথে স্টাফ কোর্স সম্পন্ন করেন। তিনি বাংলাদেশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে MDS এবং মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত থেকে ডিফেন্স ও স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ বিষয়ে প্রথম শ্রেণীতে MSc ডিগ্রি অর্জন করেন। কর্মজীবনে তিনি লজিস্টিক শিপ, মাইন সুইপার, সাবমেরিন চেজার, ওপিভি এবং প্রশিক্ষণ ফ্রিগেট বিএনএস ওমর ফারুকসহ বিভিন্ন ধরনের নৌ জাহাজে অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া তিনি সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ ও নৌ সদর দপ্তরে স্টাফ দায়িত্ব, বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে প্রশিক্ষক এবং বিএন জেএসসি ও ডিএসসিএসসি, মিরপুরে ডাইরেক্টিং স্টাফসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ইউএন মিশন লেবানন (UNIFIL) এ ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে নিয়োজিত বিএনএস ওসমানের নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। উপকূলীয় অঞ্চলে চোরাচালান ও জলদস্যু বিরোধী অভিযানে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য তিনি ১৯৯৪ সালে নৌ প্রধানের প্রশংসাসূচক ইনসিগনিয়া অর্জন করেন। এছাড়া তিনি শ্রেষ্ঠ প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে ভারতে বালাক্ষনান ট্রফি ও ডিএসসিএসসি মিরপুরে বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ রুহুল আমিন ট্রফি-২০০০ (শ্রেষ্ঠ কমান্ড্যান্ট'স পেপারের জন্য) লাভ করেন। তিনি মালয়েশিয়া, যুক্তরাজ্য, ভারত, কঙ্গো, লেবাননসহ বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি বিএনএস তিতুমীরের অধিনায়ক হিসেবে কর্মরত আছেন।





## পার্বত্য চট্টগ্রামে সম্প্রীতি ও উন্নয়নে সেনাবাহিনীর ভূমিকা

লেঃ কর্নেল এ কে এম সাজেদুল ইসলাম, পিএসসি, জি, আর্টিলারি

বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তার আওতায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যরা পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত রয়েছে। সমগ্র এলাকার পাহাড়ি ও বাঙালি জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে যে কোনো সময়ে জীবন বাজি রেখে অপারেশন পরিচালনা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে এখানকার জীবনধারায় পরিবর্তন আনয়নে দক্ষ সেনাবাহিনীর রয়েছে বেশ কিছু সফলতা। তথাপিও পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর কার্যক্রম নিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে অস্পষ্ট ধারণা রয়েছে। তা স্পষ্টিকরণই প্রাথমিকভাবে এ লেখার উদ্দেশ্য।

### ভূমিকা

উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া এবং ধর্ম, বর্ণ, জাতি নির্বিশেষে সকলেরই অত্যন্ত প্রত্যাশিত এবং আকাঙ্ক্ষিত বিষয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমগ্র এলাকা যেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং শান্তির এক লীলাভূমি। তবে ১৯৭৬ সাল হতে শুরু করে দু-দশক ধরে এখানকার পাহাড়ি জনগোষ্ঠী (নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী) এবং কিছু কিছু আঞ্চলিক নেতাদের নানাবিধ দাবীর কারণে এই এলাকার নিরাপত্তা, শান্তি ও সৌন্দর্য পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং শুরু হয় ইস্যুরাজেসি অপারেশন। ফলশ্রুতিতে পাহাড়ি-পাহাড়ি/বাঙালি-পাহাড়ি সম্প্রীতি ও নিরাপত্তা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে এবং উন্নয়ন কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এমনই এক পরিস্থিতি মোকাবিলার উদ্দেশ্যে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তার নিমিত্তে সরকারী আদেশে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ২৪ পদাতিক ডিভিশনের নেতৃত্বে রিজিয়ন (ব্রিগেড) সদর দপ্তরের সার্বিক তত্ত্বাবধানে অধীনস্থ সেনা জোন (রেজিমেন্ট/ব্যাটালিয়ন) এবং নিরাপত্তা বাহিনীর অন্যান্য সদস্য (বিজিবি, পুলিশ, আনসার ও ভিডিপি ইত্যাদি) সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে (যার আয়তন ১৩,২৯৫ বর্গ কিঃ মিঃ - বাংলাদেশের আয়তনের এক দশমাংশ) মোতায়েন করা হয়। এরপর থেকেই শুরু হয় সাফল্য গাঁথা। ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং পরবর্তীতে সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নতির পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক পর্যায়েও প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। সেনাবাহিনীর জোনসমূহের মোতায়েন সাধারণত উপজেলাভিত্তিক এবং উপজেলার নামে নামকরণ করা হয়ে থাকে। তবে

কিছু কিছু সেনা জোন ২/৪টি উপজেলার আংশিক স্থানসমূহ নিয়ে গঠিত সমগ্র এলাকায় নিরাপত্তা বিধান নিয়োজিত হয়ে থাকে। বর্তমানে কাজ মূলত শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন এবং এলাকায় নিরাপত্তা পরিস্থিতি বজায় রাখতে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা করা। পাশাপাশি অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার, সন্ত্রাসী গ্রেফতার এবং অবৈধ চাঁদা সংগ্রহ না করতে দেয়াও অন্যতম। অধিকাংশ উপজেলার অন্তর্গত মৌজা এবং পাড়া অত্যন্ত দুর্গম এলাকায় অবস্থিত। এসব এলাকায় বেসামরিক প্রশাসনের কোনো অঙ্গ প্রতিষ্ঠানই যথাযথভাবে পৌঁছতে সক্ষম নয়। সেনা ক্যাম্পগুলো এসব দুর্গম ও দুর্ভেদ্য এলাকার নিকটবর্তী হওয়ায়, অলিখিতভাবে যে কোনো উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এই অকুতোভয় সেনাসদস্যদেরকেই ছুটে যেতে হয়। সকল সমস্যার সমাধানে নিরীহ, শান্তিপ্ৰিয় পাহাড়ি-বাঙালির পাশে দাঁড়াতে হয়। এমনটাই চলে আসছে গত চার দশক ধরে। তারই পরিক্রমায় বর্তমানে সেনাবাহিনীর সকল রিজিয়ন এবং জোন দায়িত্বপূর্ণ এলাকার উন্নয়নে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অভাবনীয় ভূমিকা পালন করে চলেছে; যা পাহাড়ি অঞ্চলে অবস্থিত সকল জনগণের জীবনচক্রে নতুন আশার সঞ্চার করেছে। অশিক্ষিতকে শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত করেছে। কর্মক্ষম বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। সর্বোপরি, বাংলাদেশ সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিঃস্বার্থ ও ন্যায়পরায়ণতা সহকারে অর্পিত দায়িত্ব পালন করে চলেছে। বর্ণনার সুবিধার্থে ক্ষেত্রবিশেষে এলাকাভিত্তিক উন্নয়নের বর্ণনা প্রণিধানযোগ্য।



## সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বৃদ্ধি

পাহাড়ি-বাঙালিদের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক ভাল। তবে কিছু স্বার্থান্বেষী মহল উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে পাহাড়ি-বাঙালি সম্পর্ককে অত্যন্ত নেতিবাচকভাবে বিভিন্ন মহলে উত্থাপিত করার অপপ্রয়াস চালান। বাস্তবে এ সম্পর্ক খারাপ নয় বরং অত্যন্ত সৌহার্দপূর্ণ এবং বিশ্বাসের ভিত্তিতে রচিত। ইতিহাস হতে জানা যায় যে পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি জেলার লক্ষ্মীছড়ি উপজেলার সন্নিহিত ফটিকছড়ি উপজেলায় সমতলভূমি অবস্থিত হওয়ায় সতের শতকের শুরু হতেই এখানে বাঙালিদের বসবাস ছিল। লক্ষ্মীছড়ি সদর এবং ময়ূরখীল মৌজার মাইজভান্ডারের জমির মালিকানা এখনও চট্টগ্রামবাসীর হাতে রয়েছে। সেই থেকেই বাঙালিরাও এখানে শত শত বছর ধরে বংশানুক্রমে বসবাস করছে। বাঙালিরা পাহাড়িদেরকে তাদের পরিবারের সদস্য হিসেবে মনে করতো। এমনও উদাহরণ রয়েছে যে, পাহাড়িরা এইসব সদরে অবস্থিত বাঙালিদের বাসায় জায়গির থেকে লেখাপড়া করে বড় হয়েছে। সেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সময়ের আবর্তে নানাবিধ কারণে অনেকটাই বিনষ্ট হয়েছে। এই দুর্বল এবং মিশ্র সম্পর্ক উন্নয়নে সেনা জোন নানাবিধ কার্যক্রম হাতে নিয়ে থাকে :

ক। পাহাড়ি-বাঙালিদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে পাড়া, মৌজা, ইউনিয়ন, উপজেলা এবং সর্বশেষে জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন খেলাধুলার আয়োজন।

খ। ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বালক ফুটবল টুর্নামেন্ট’ এবং ‘বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা বালিকা ফুটবল টুর্নামেন্ট’ এর আয়োজনে সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান। এই সহায়তা প্রদানে বিভিন্ন সেনা জোনের স্বপ্রণোদিত সহায়তার কারণে কিছু কিছু পশ্চাৎপদ উপজেলা অভূতপূর্ব সফলতা অর্জন করে। যেমন- লক্ষ্মীছড়ি উপজেলা দল সমগ্র খাগড়াছড়ি জেলায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

গ। জোনের সার্বিক অর্থায়নে সংগীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। সংগীত বিদ্যালয় হতে পাহাড়ি-বাঙালি ক্ষুদ্রে শিল্পীর সৃষ্টি হচ্ছে। তাদের অনেকেই

জাতীয় পর্যায়ে ক্ষুদ্রে শিল্পী অন্বেষণের আয়োজনে যোগদান করছে। উল্লেখ্য যে গুইমারা রিজিয়ন এবং লক্ষ্মীছড়ি জোনের সার্বিক সহায়তায় নির্মিত ‘লক্ষ্মীছড়ি সংগীত নিকেতন’ এর অন্যতম ক্ষুদ্রে শিল্পী পায়েল সমগ্র খাগড়াছড়ি জেলায় শ্রেষ্ঠ শিশু শিল্পীর মর্যাদা পেয়েছে। এরূপ অনেক সংগীত নিকেতন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পাহাড়ি-বাঙালি ছেলেমেয়েদের সুকোমল মনোবৃত্তির চর্চায় আগ্রহী করে তোলায় সেনাবাহিনীর ২৪ পদাতিক ডিভিশন কার্যকর ভূমিকা রেখে চলছে।

ঘ। রিজিয়ন ও সেনা জোন কর্তৃক জেলা/ উপজেলার যে কোনো সমস্যা দূরীকরণের লক্ষ্যে জেলা/উপজেলা প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা (পাহাড়ি-বাঙালি নির্বিশেষে), উপজেলা পরিষদের সকল নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি (পাহাড়ি-বাঙালি নির্বিশেষে), এলাকার গণ্যমান্য পাহাড়ি-বাঙালি ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে ত্রৈমাসিক/মাসিক ভিত্তিতে ‘মত-বিনিময় সভা’ এর আয়োজন করা হচ্ছে। জেলা/ উপজেলার সকল পাহাড়ি-বাঙালিদের সমস্যা দূরীকরণে সেনা তত্ত্বাবধানে আয়োজিত এই সভা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বৃদ্ধিতে প্রভূত ভূমিকা রাখে। অধিকন্তু, এই সভা মানুষের মাঝে সংযোগ বৃদ্ধি (People to people contact), সমঝোতা এবং বিশ্বাস বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। সকল পাহাড়ি-বাঙালি প্রতি মাসের এই মত-বিনিময় সভায় আগমনের প্রত্যাশায় তৃষ্ণার্তভাবে অপেক্ষা করতে থাকে। আলোচনার মাধ্যমে যে গুরুতর সমস্যাও সমাধান করা যায়; তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ ও ক্ষেত্র এই মত-বিনিময় সভা।

ঙ। জাতীয় সকল দিবসগুলোতে রিজিয়ন/জোন এবং জেলা/উপজেলা প্রশাসনের সমন্বয়ে পাহাড়ি-বাঙালিদের মিলনমেলার আয়োজন। অধিকন্তু নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীদের সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠান নিরাপত্তার সাথে পালনে সহায়তা, রিজিয়ন/জোনের কর্মকর্তাদের উপস্থিতি এবং রিজিয়ন/জোন কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন





প্রীতিভোজে পাহাড়ি-বাঙালিদের আমন্ত্রণ যা সার্বিকভাবে পাহাড়ি-বাঙালি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গঠনে ভূমিকা রাখে।

চ। জনগোষ্ঠীর স্বকীয়তা ধারণ ও চর্চার উদ্দেশ্যে পাহাড়ি-বাঙালিদের সম্পৃক্ততায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বৃদ্ধিতে উপযুক্ত কার্যক্রমগুলো প্রভূত সফলতা বয়ে নিয়ে এসেছে। ফলে এই সকল পন্থার যে কোনোটিই অন্যান্য যে কোনো স্থান/এলাকার পরিস্থিতি পরিবর্তনে অনুসরণযোগ্য।

### স্বাস্থ্য সেবা

স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। তবে উপজেলার জনগণ এতই দরিদ্র যে প্রায়শই এই মৌলিক চাহিদা হতে তারা বঞ্চিত হয়ে থাকে। স্থানীয় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসকের অনুপস্থিতি এবং নানাবিধ অসুবিধার কৃত্রিম জটিলতার কারণে এলাকার জনগণ চিকিৎসা সেবা হতে চরমভাবে বঞ্চিত হয়। এ সকল সমস্যা দূরীকরণে জোনের ব্যবস্থাপনায় সেনাবাহিনীর চিকিৎসকের মাধ্যমে দুর্গম ও চলাচল অযোগ্য এলাকায় পীড়িত পাহাড়িদের চিকিৎসা প্রদান, সাপ্তাহিক বাজারের দিনগুলোতে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ঔষধ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। উল্লেখ্য যে, একটি সেনা জোন প্রতিমাসেই ২০০০-৩০০০ পাহাড়ি-বাঙালিকে বাজারের দিনগুলোতে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ঔষধ প্রদান করে থাকে। অধিকন্তু উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সহায়তায় স্থানীয় জেলা/উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসকের উপস্থিতি বৃদ্ধি, চিকিৎসা সহায়তা প্রদানে সক্ষমতা বৃদ্ধি আনয়নে সকল সেনা জোনের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। পুরো বৎসর জুড়ে জোন ভেদে নিম্নোক্ত কার্যক্রম আয়োজন করা হয়ে থাকে :

ক। প্রতি বৎসর সংশ্লিষ্ট উপজেলা সদরের অন্তর্গত দুর্গম এলাকায় সুচারু ব্যবস্থাপনায় বৃহৎ আকারে বিনামূল্যে ঔষধ ও স্বাস্থ্য সেবা ক্যাম্পইনের আয়োজন। এ জাতীয় এক একটি ক্যাম্পইনে আনুমানিক ১৫০০-৪০০০ পাহাড়ি-বাঙালিদের স্বাস্থ্য সেবা ও ঔষধ প্রদান করা হয়ে থাকে। উপজেলায় সাধারণত কোনো

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক থাকে না। তাই সেবাই ধর্ম- এই মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য জেলাসমূহ হতে সার্জারি বিশেষজ্ঞ, চক্ষু বিশেষজ্ঞ, গাইনি বিশেষজ্ঞ, শিশু বিশেষজ্ঞ, মেডিসিন বিশেষজ্ঞ এবং সেনাবাহিনীর সুযোগ্য চিকিৎসকদের সমন্বয়ে দুর্দশাগ্রস্থ রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ঔষধ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

খ। প্রতি বৎসর বিনামূল্যে চক্ষু অপারেশন ক্যাম্পইনের আয়োজন। এ প্রক্রিয়ায় এযাবৎ সেনাবাহিনী কর্তৃক অসংখ্য রোগীকে বিনামূল্যে চক্ষু অপারেশন করানো হয়েছে এবং পাহাড়ি-বাঙালিদের মাঝে বিনামূল্যে চশমা বিতরণ করা হয়েছে।

গ। স্যানিটেশন এবং বাসস্থানের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ কর্মসূচির আয়োজন। জন্মকালীন মৃত্যুরোধে ধাত্রী প্রশিক্ষণ প্রদানের আয়োজন- উপজেলায় মা ও শিশু মৃত্যুর হার অনেক কমিয়ে দিয়েছে। যা ‘মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল’ অর্জনে বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছে।

ঘ। দুর্গম এলাকায় অবস্থিত পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর নিকট চিকিৎসা সেবা পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে ক্যাম্প পর্যায়ে সেনাবাহিনীর চিকিৎসক প্রেরণপূর্বক স্বাস্থ্য ক্যাম্পের আয়োজন।

ঙ। জোনের নিজস্ব অর্থায়নে কুকুরে কামড়ানো ব্যক্তি বিশেষ করে ৫-১২ বৎসরের শিশুদের ভ্যাকসিনেশন প্রদান। এ চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। সম্পূর্ণ কোর্সে ৪-৫টি ভ্যাকসিন ব্যবহার করা হয়ে থাকে, যার মূল্যমান প্রায় ২,৫০০.০০ টাকা। স্থানীয় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এ চিকিৎসা প্রদানের কোনো ব্যবস্থা নাই।

চ। উল্লিখিত খাত ছাড়াও জটিল রোগের সুচিকিৎসা ও অপারেশন সম্পন্নকরণে সেনা জোন কর্তৃক এককভাবে এবং সম্মিলিতভাবে



স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণে আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং সঠিক চিকিৎসা সম্পাদন।

ছ। উপজেলার পঙ্গু ব্যক্তিবর্গের মাঝে বিনামূল্যে হুইল চেয়ার বিতরণ।

### শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়ন ও সহায়তা

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। যে জাতি যত শিক্ষিত সে জাতি তত উন্নত। সমগ্র পার্বত্য এলাকাতেই বাঙালি শিক্ষার হার অনেক কম। পাহাড়ের ঢল, শ্রোতময় ছড়া, কোনো কিছুই পাহাড়ি শিশুদের শিক্ষা অর্জন হতে বাধা তৈরি করতে পারেনি। তাই যথারীতি পাহাড়ি শিক্ষার হার বাঙালি শিক্ষার হারের তুলনায় দ্বিগুন যা প্রায় ৬০%। তবে স্কুলের স্বল্পতা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধার কারণেও অনেকেই শিক্ষা গ্রহণ কার্যক্রমের বাইরেই থেকে যায়। সার্বিক এই পরিস্থিতি হতে উত্তরণের মাধ্যম হিসেবে সেনা রিজিয়ন এবং জোনের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় এবং অর্থায়নে সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম জুড়েই অনেকগুলো ইংরেজি ও বাংলা মাধ্যমের স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। তন্মধ্যে গুইমারা রিজিয়ন এবং লক্ষ্মীছড়ি জোন কর্তৃক পরিচালিত যথাক্রমে শহিদ লেঃ মুশফিক (ইংরেজি মাধ্যম) স্কুল এবং মানিকছড়ি ইংলিশ স্কুল উল্লেখযোগ্য। একইভাবে বিভিন্ন সেনা জোন কর্তৃক দিবা ও নৈশ স্কুল পরিচালনা করা হয়। এতে শিক্ষার হার বৃদ্ধিতে সেনাবাহিনীর অকুতোভয় সদস্যরা প্রভূত ভূমিকা পালন করেছে। উল্লেখ্য যে, প্রতিটি উপজেলায় ন্যূনতম একটি কলেজ থাকা বাঞ্ছনীয় হওয়া সত্ত্বেও কিছু উপজেলায় বর্তমানে কোনো কলেজ নেই। ফলে মাধ্যমিক শ্রেণি পাস করে অনেক ভাল ছাত্র-ছাত্রীই আর্থিক অসঙ্গতির কারণে কিংবা বাসস্থান হতে কলেজের অধিক দূরত্বের কারণে পড়তে যেতে পারে না। এ সমস্যা হতে উত্তরণের উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনীর জোনসমূহ স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয়পূর্বক কলেজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে চলেছে। শিক্ষাক্ষেত্রের উন্নয়নে অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড নিম্নে আলোচনা করা হলো :

ক। সমগ্র পার্বত্য এলাকায় সরকারী ও বেসরকারীভাবে নির্মিত সকল হাইস্কুল, জুনিয়র

উচ্চ বিদ্যালয় এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সবগুলোতেই অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে সেনাবাহিনী কর্তৃক বিনামূল্যে শিক্ষা সহায়ক সামগ্রী: বই-পুস্তক, খাতা-পেন্সিল, কলম এবং চকলেট বিতরণ।

খ। মনন ও সুকোমল মনোবৃত্তির চর্চা বৃদ্ধিতে সকল স্কুলে ভাল পুস্তক, খেলাধুলার সামগ্রী (ফুটবল, কেরামবোর্ড, ক্রিকেট ব্যাট ও বল, দাবা, মেয়েদের জন্য স্কিপিং রোপ) বিতরণ।

গ। শিক্ষিত মা সন্তান লালন-পালন ও গঠনে অত্যন্ত মূল্যবান ভূমিকা রাখেন। সেই ভিত্তিতেই ৬০ : ৪০ অনুপাত হারে (মেয়ে ও ছেলে) প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে মেধাবী মেয়ে ও ছেলে শিক্ষার্থীকে সেনা জোন কর্তৃক ষান্মাষিক ভিত্তিতে প্রতিজনকে ১৫০০-১৮০০ টাকা করে বৃত্তি প্রদান করা।

ঘ। কলেজ ও উচ্চ শিক্ষা লাভে ইচ্ছুক পাহাড়ি-বাঙালি ছাত্র-ছাত্রীকে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি, পোশাক তৈরি এবং বই ক্রয় করার জন্য এককালীন অনুদান প্রদান।

ঙ। আধুনিক প্রযুক্তির সেবা গ্রহণ ও তা ব্যবহারে পারদর্শী করে তোলার জন্য প্রায় সকল সেনা রিজিয়ন ও জোন কর্তৃক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা। এ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পাহাড়ি-বাঙালি প্রশিক্ষণার্থী কম্পিউটার প্রশিক্ষণে দক্ষতা অর্জন করেছে যা তাদের কর্মসংস্থান বা চাকুরি পেতে প্রভূত সহায়তা করবে। সর্বোপরি, এই পিছিয়ে পড়া জনপদের মানব উন্নয়ন প্রক্রিয়া সমুন্নত করা এবং সকলের নিকট সর্বোচ্চ সুবিধা পৌঁছে দেয়াও ছিল অন্তর্নিহিত লক্ষ্য।

চ। উপজেলার অধীন সকল স্কুল-কলেজে শিক্ষা সহায়ক সামগ্রী হিসেবে চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ ও আলমারিসহ শিক্ষা সহায়ক সামগ্রী প্রদান।





## নারীর ক্ষমতায়ন এবং আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি

পাহাড়ি নারীরা সাধারণত মাঠে কাজ করে থাকে। বর্ষা মৌসুমে আবহাওয়াজনিত কারণে নিরুপায় হয়ে তারা ঘরে বসে থাকে। অন্য কোনো কর্মসংস্থান প্রক্রিয়াও তাদের অজানা। একইভাবে বাঙালি মহিলারাও স্বল্প শিক্ষার কারণে মর্যাদাসম্পন্ন কোনো কর্মকাণ্ডে জড়িত হতে পারে না। বাসায় বাসায় কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। তবে এটাও স্থায়ী কোনো কর্মসংস্থান মাধ্যম নয়। ফলে দারিদ্র্যের কষাঘাতে তাদের পারিবারিক সম্পর্ক ও অবস্থান নষ্ট হতে থাকে। অধিকন্তু বিষপানে আত্মহত্যার প্রবণতাও বাড়তে থাকে এবং এটা একটি সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়ে পড়ছে। পাহাড়ি-বাঙালি মহিলাদের এরূপ স্থবিরতা ও অক্ষমতা দূরীকরণে রিজিয়ন সদরের পৃষ্ঠপোষকতায় সকল সেনা জোন নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করে যার কিছু বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো :

ক। সেনা ক্যাম্পের সন্নিহিত অথবা উপজেলার সুবিধাজনক স্থানে হতদরিদ্র পাহাড়ি-বাঙালি মহিলাদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার প্রয়াসে কুটিরশিল্প ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই কেন্দ্রের মাধ্যমে অনেক পাহাড়ি-বাঙালি মহিলাকে শীতের চাদর, থামি, লুঙ্গি ও গামছা তৈরির প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এ সকল প্রশিক্ষণার্থীদের অনেকেই স্বনামখ্যাত বয়ন টেক্সটাইল, রাঙামাটি এবং বাংলাদেশের অন্যান্য গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীতে চাকুরি পেয়েছে। এই প্রশিক্ষণ তাদের মাঝে আত্মবিশ্বাস তৈরিতে অনেক সাহায্য করেছে। আর বাকী প্রশিক্ষণার্থীরা এসকল প্রতিষ্ঠানেই উল্লিখিত সামগ্রী তৈরি করছে। জোনসমূহ তৈরিকৃত সামগ্রী স্থানীয় ও বড় বাজারে বিপণন ও বিক্রয়ে সর্বাঙ্গিক সাহায্য করে থাকে। এই প্রতিষ্ঠানে কাজের মাধ্যমে প্রতি পাহাড়ি-বাঙালি মহিলা কমপক্ষে ৫,০০০.০০ (পাঁচ হাজার) টাকা আয় করছেন যা দিয়ে মোটামুটি স্বচ্ছলভাবে এবং নিয়মিতভাবে তারা সংসারের

উন্নতিতে, পরিবারের অন্যান্য সদস্যের দেখভালকরণে একক সামর্থ্য অর্জন করে। এতে করে বিষপানে মৃত্যুর হার একেবারেই দূরীভূত হয়েছে। এ উদ্যোগ বাস্তবায়নে সেনা রিজিয়ন/জোন কর্তৃক বিভিন্ন তাঁত তৈরি ও কাঁচামাল ক্রয়বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ সংগঠনকারীদের প্রদান করা হয়। সম্পূর্ণরূপে স্বাবলম্বী হয়ে গেলে এরূপ প্রতিষ্ঠানগুলো (সকল সামগ্রীসহ) পাহাড়ি-বাঙালি মহিলাদের স্থায়ীভাবে প্রদান করাই এই নিঃস্বার্থ প্রকল্পের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য।

খ। বিভিন্ন গুচ্ছগ্রামে মহিলাদের কর্মসংস্থান তৈরিতে উদ্ভাবনী পদ্ধতিতে মুরগীর ফার্ম পরিচালনা ও এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান, মাশরুম/স্ট্রবেরি/ ডাগন ফল চাষের প্রশিক্ষণ ও প্রত্যক্ষ সহায়তা প্রদান, সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।

গ। সর্বোপরি, সরকারের সকল উদ্যোগের পাশাপাশি সেনাবাহিনী মহিলাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় আরও পারদর্শী ও দক্ষ করার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়ে চলেছে।

## পানির স্বল্পতা দূরীকরণ ও সুপেয় পানির প্রাপ্যতা

সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামেই ছড়া ও কুয়ার পানিই আপামর জনগণের একমাত্র ভরসা। তবে দুর্গম পাহাড়ি এলাকা উচ্চতার কারণে এবং শুষ্ক মৌসুমে ব্যবহার্য এবং বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব মাঝে মাঝেই প্রকট আকার ধারণ করে। উদাহরণস্বরূপ, খাগড়াছড়ি জেলার দুর্গম লক্ষীছড়ি উপজেলার কথা উল্লেখ করা যায়। এই উপজেলার দুর্গম ও পাহাড়ি বার্মাছড়ি ও দুলাতলী ইউনিয়নের অন্তর্গত এলাকায় সুপেয় পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিতকল্পে সংশ্লিষ্ট জোনের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় উপজেলা প্রশাসনের সরকারী সহায়তায় ৭ লক্ষ টাকা খরচপূর্বক দুইটি গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়



এবং এরই মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে এই প্রথম গভীর নলকূপ স্থাপনের নজির রচিত হয়। পাশাপাশি উপজেলার সমতল এলাকায় সকলের জন্য বিশুদ্ধ পানি নিশ্চিতকল্পে অসংখ্য টিউবওয়েল এবং সাধারণ নলকূপও স্থাপন করা হয়। এতে দীর্ঘদিন হতে চলমান সুপেয় পানির অভাব অনেকাংশই দূরীভূত হয়।



গভীর নলকূপ হতে পাহাড়িদের পানি সংগ্রহ

### জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড

পাঠকের বোঝার সুবিধার্থে নির্দিষ্টভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি দুর্গম উপজেলা লক্ষ্মীছড়ির উদাহরণ তুলে ধরা হচ্ছে। লক্ষ্মীছড়ি উপজেলার আয়তন ২২০ বর্গ কিঃমিঃ এবং সর্বমোট জনসংখ্যা ৩৫ হাজার। পাহাড়ি জনগোষ্ঠী ২৩ হাজার ৫ শত এবং বাঙালি ৮ হাজার প্রায়। শিক্ষার হার অতি নগণ্য। অনুন্নত সড়ক যোগাযোগ ও সহজ যোগাযোগের (রাস্তা কম, ছড়া বা নালার আধিক্য বেশি) ব্যবস্থা না থাকায় অত্র উপজেলা অনুন্নত, অবহেলিত এবং আধুনিক উন্নয়নের ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত বিষয় যুক্তিসংগতভাবেই গরীবের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি। সে কারণেই পার্বত্য চট্টগ্রামে মোতামেনরত অন্য যে কোনো জোনের চেয়ে লক্ষ্মীছড়ি উপজেলায় অন্যান্য দুর্গম অঞ্চলের চেয়ে অধিক হারে হতদরিদ্র পাহাড়ি-বাঙালিদের নিকট সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে বিবিধ জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড নিয়মিতভাবে পরিচালনা করে থাকে। যেমন- গ্রীষ্ম মৌসুমে পাহাড়িদের পরিধানের জন্য থামি, লুঙ্গি বিতরণ, বাঙালিদের জন্য শাড়ি এবং শিশুদের নানাবিধ জামা বিতরণ করা হয়ে থাকে। শীত মৌসুমে পাহাড়ি এলাকা

বিধায় চরম ঠান্ডা পড়ে। সেই শীতের প্রকোপ হতে রক্ষার জন্য হাজার হাজার কম্বল, শীতবস্ত্র (সুয়েটার, গরম উলেন প্যান্ট, উলেন চাদর) আপামর জনগণের মাঝে বিতরণ করা হয়ে থাকে। এছাড়াও, গাড়ির জন্য অপেক্ষমান ব্যক্তিদের জন্য বাসস্ট্যাণ্ডে যাত্রী ছাউনি ও গণশৌচাগার নির্মাণ উল্লেখযোগ্য দৃশ্যমান কর্মকাণ্ড। প্রায়শই স্কুলে স্কুলে গমনপূর্বক শিশুদের মাঝে শিক্ষা সামগ্রী এবং চকলেট বিতরণ করা হয়। সর্বোপরি, দুঃস্থ পরিবারদেরকে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে আদা-হলুদ-কচু চাষ প্রকল্প পরিচালনার জন্য রিজিয়ন এবং জোন কর্তৃক আর্থিক সহায়তা প্রদান জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডগুলোর অন্যতম।

এছাড়াও সড়ক দুর্ঘটনায় আক্রান্ত ব্যক্তিবর্গের সুচিকিৎসা নিশ্চিতকল্পে আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং অধিকতর চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম হাসপাতালে প্রেরণের সু-ব্যবস্থাও করা হয়ে থাকে। অগ্নিকাণ্ড নির্বাপণে অন্য যে কারো পূর্বে সেনাসদস্যদের ঘটনাস্থলে গমন এবং নিজের প্রাণ বাজি রেখে আগুন নিভানোও জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পাশাপাশি অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদেরও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে।

### পরিবেশ, বনজসম্পদ সংরক্ষণ ও রাজস্ব উদ্ধার

সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে সংরক্ষিত বনাঞ্চল এবং অন্যান্য এলাকায় প্রচুর পরিমাণে বনজ সম্পদ (ফল-মূল এবং গাছপালা) এবং বাঁশ উৎপাদিত হয়। নিয়ম মারফিক বৈধ আদেশে রাজস্ব প্রদানপূর্বক গাছ এবং বাঁশ কাটা হোক - এটাই সকলের কাম্য। তবে এই এলাকায় তা কদাচিৎ হয়ে থাকে। বরং অবৈধভাবে বনবিভাগকে রাজস্ব প্রদান না করে প্রচুর পরিমাণে কাঠ ও বাঁশ অত্র এলাকা হতে অন্যত্র (সমতল এলাকায়) পাচার হয়ে থাকে। লক্ষ্মীছড়ি সেনা জোনের মাধ্যমে জানা যায় যে, উক্ত জোন তা প্রতিরোধে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রেখেছে এবং গত ২ বৎসরে ৬৭৮০ সিএফটি অবৈধ কাঠ এবং ১০৫০০ পিস বাঁশ আটক করে, যার





মূল্যমান প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা (বর্তমান বাজার দর)। উল্লেখ্য যে, এ পরিমান রাজস্ব উদ্ধার সম্ভব হয়েছে কেবলমাত্র ১টি জোনের মাধ্যমে। সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম জুড়ে এমন অনেকগুলো জোনেই এরূপ দায়িত্ব পালন করে থাকে। বন বিভাগে রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে এ অবৈধ কাঠ ও বাঁশ পাচার হয়ে গেলে সরকারের চরম আর্থিক ক্ষতি হতো। পাশাপাশি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সারা বৎসর জুড়েই পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য ‘বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি’ পালন করে থাকে। অধিকন্তু বনজ সম্পদ সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে সকল পাহাড়ি-বাঙালিকে প্রেষণা প্রদান করে থাকে।

### ভৌত ও কাঠামোগত উন্নয়ন

এক্ষেত্রে সকল রিজিয়ন এবং জোন প্রভূত ভূমিকা রেখেছে। নানাবিধ সচেতনতামূলক কার্যধারা এবং কল্যাণময় কার্যক্রমের মাধ্যমে সেনা জোন সাধারণ পাহাড়ি-বাঙালির নিকটতম বন্ধুতে পরিণত হয়েছে। জয় করেছে দারিদ্র্য, পাহাড়ি-বাঙালিদের হৃদয় ও মন। সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত নিম্নোক্ত কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য :

ক। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কারিগরি প্রতিষ্ঠান, ঘর-বাড়ি নির্মাণে পরিবার ও প্রতিষ্ঠানভেদে ৪-২০ বান করে টিন এবং অন্যান্য নির্মাণসামগ্রী প্রদান। এক্ষেত্রে এযাবৎ অসংখ্য হতদরিদ্র পাহাড়ি-বাঙালিকে ঘর নির্মাণে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। শনের তৈরি ঘর টিনের ঘর দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে কেবল সৌন্দর্যই বাড়েনি, পাশাপাশি স্থায়ীত্বও কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছে।

খ। জোনের দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় অসংখ্য কিয়াংঘর এবং মসজিদ নির্মাণসামগ্রী প্রদান, মাইক প্রদান, মেঝে পাকা করার ক্ষেত্রে আর্থিক অনুদান প্রদান এবং সর্বোপরি বিভিন্ন পূজা পার্বণ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার নিমিত্তে আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থাকরণ।

গ। ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ অর্থাৎ মহান ২১শে ফেব্রুয়ারি সুষ্ঠুভাবে পালন এবং শহিদদের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যম

হিসেবে বিভিন্ন উপজেলায় বৃহৎ পরিসরে ‘শহীদ মিনার’ নির্মাণ।

সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামেই যোগাযোগ ব্যবস্থার বিবিধ উন্নয়ন করা হলেও কালের আবর্তে, সময়ানুযায়ী মেরামত ও পুনঃনির্মাণের অভাবে সমগ্র যোগাযোগ ব্যবস্থা কিছুটা হলেও কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। কয়েকশ’র উপর বেইলী ব্রীজ মেরামতের অভাবে প্রতিদিনই কার্যকারিতা হারাচ্ছে, পাকা রাস্তা জায়গায় জায়গায় গর্ত হয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ভূমিধ্বস এবং অত্যধিক বৃষ্টিও এই রাস্তা, কালভার্ট, ভগ্ন ব্রীজ এবং বেইলী ব্রীজের সক্ষমতা কমিয়ে ফেলছে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সেনাবাহিনীর Engineering Construction Battalion (ECB)’র মাধ্যমে এ পর্যন্ত সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে ৫১৪ কিঃমিঃ নতুন রাস্তা তৈরি এবং পুরাতন রাস্তা মেরামত করা হয়েছে। অনেকগুলি ব্রীজ তৈরি এবং বেইলী ব্রীজ স্থাপন করা হয়েছে। স্থানীয় সেনা জোন যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নে ECB’র ন্যায় প্রত্যক্ষ কোনো ভূমিকা না রাখলেও সকল জোনই তাদের দায়িত্বপূর্ণ এলাকার অন্তর্গত রাস্তাঘাটের মেরামত, ছোট ব্রীজ বা কালভার্ট তৈরি এবং কাঠের ব্রীজ ও সাঁকো তৈরিতে অগ্রণী ভূমিকা রেখে চলেছে। স্থানীয় দায়িত্বশীল প্রশাসনিক অফিসের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে এই কাজটি করা হয়ে থাকে। অধিকন্তু ভূমিধ্বস বা অত্যধিক বৃষ্টিতে ভেঙে পড়া রাস্তা মেরামতে সেনা সদস্যগণ প্রত্যক্ষভাবে তা মেরামতে অংশগ্রহণ করে থাকে। এছাড়াও সেনা জোনের অর্থায়নে তড়িঘড়ি করে বেইলী ব্রীজের ভেঙে যাওয়া Span পুল স্থাপন এবং দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় জনগণের যাতায়াতের সুবিধার্থে ছোট ছোট নদী ও খালের উপর সেতু ও সাঁকো নির্মাণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

### জিওসি (জেনারেল অফিসার কমান্ডিং), রিজিয়ন কমান্ডারদের সম্প্রীতি ও উন্নয়ন কর্মসূচি

জোন কমান্ডারদের প্রাত্যহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক এবং ষান্মাসিক কার্যক্রম ও উন্নয়ন কার্যক্রমের বাইরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বৃদ্ধি, পারস্পরিক বিশ্বাস স্থাপন এবং দুঃস্থদের সাহায্যের জন্য প্রায়শই জিওসি ও



রিজিয়ন কমান্ডার (ব্রিগেড কমান্ডার) কর্তৃকও জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড ‘সম্প্রীতি ও উন্নয়ন কার্যক্রম’ পরিচালিত হয়ে থাকে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে জিওসি এবং রিজিয়ন কমান্ডারগণ পাহাড়ি-বাঙালিদের সান্নিধ্যে আসেন এবং দুঃস্থ-অসহায় পরিবার, ব্যক্তিদের মাঝে নিজ হাতে লক্ষাধিক টাকার সাহায্য সামগ্রী তুলে দেন। তাছাড়া, জটিল বিষয়াদি সমাধানে ভূমিকা রাখেন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও নিরাপত্তা বাহিনীর শ্রান্তিহীন প্রয়াস, পাহাড়ি-বাঙালিদের মাঝে বিদ্যমান ভুল-ভ্রান্তি দূরীকরণে এবং পাহাড়ি-বাঙালি নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে সম্পর্কোন্নয়নে যথেষ্ট কার্যকর ভূমিকা রাখে।

### সেনাবাহিনী কর্তৃক যথাযোগ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতি বজায় রাখা পার্বত্য এলাকায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত - একটি নির্মোহ বিশ্লেষণ

পার্বত্য এলাকায় দু’দশক ধরে আবর্তিত ইন্টারজেন্সি পরিস্থিতি এলাকায় বিরাজমান শান্তি ও সম্প্রীতি একেবারেই নষ্ট করে দিয়েছিল। সরকারি কর্তৃপক্ষ এ পশ্চাৎপদ এলাকায় উন্নয়ন করতে চাইলেও নিরাপত্তা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে কোনো ঠিকাদার বা নির্মাতা প্রতিষ্ঠানই এলাকার উন্নয়নে এগিয়ে আসতে পারেনি। এমন এক পরিস্থিতিতে সরকারি আদেশে সেনাবাহিনীর অকুতোভয় যোদ্ধারা জীবন বাজি রেখে ১৯৭২ সাল থেকে এই পার্বত্য এলাকায় মোতায়েন হয় এবং পর্যায়ক্রমে যথাযথ নিরাপত্তা পরিস্থিতি বজায় রাখতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। ইতোমধ্যে পার্বত্য এলাকার সার্বিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি বজায় রাখতে এবং শান্তি আনয়নে সেনাবাহিনীর ৩৫১ জন সদস্য নিভীকচিহ্নে প্রাণ দান করে শহিদ হয়েছেন। শ্রদ্ধাভরে আমরা তাঁদের এই অবদানকে স্মরণ করব। বিগত দিনে চাঁদাবাজদের উপদ্রব এবং নিরাপত্তার অভাবে পার্বত্য এলাকায় উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হলেও তা বাস্তবায়ন করা যেতো না। সময়ের আবর্তে সেনাবাহিনীসহ সকল নিরাপত্তা বাহিনীর সহায়তায় এবং অক্লান্ত প্রচেষ্টায় সমগ্র পার্বত্য এলাকাতেই নিরাপত্তা পরিস্থিতির ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছে। নিভীকচিহ্নে এলাকায় পাহাড়ি-বাঙালি জনগণ ঘুরে ফিরে জীবিকা অর্জন করতে পারছে। অধিকন্তু, জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন সকল পর্যায়েই নানাবিধ

উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ এবং সেগুলোর বাস্তবায়ন সফলতার মুখ দেখছে। দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় সন্তোষী আগমন এবং তাদের কর্তৃক পরিচালিত অধিকাংশ কার্যক্রমই সেনা জোনের নিবিড় নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। ফলে এলাকায় জনগণ অর্থনৈতিকভাবেও উন্নয়নের ছোঁয়া পেতে শুরু করেছে। নিম্নে পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকার কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো :

ক্রঃ	প্রকারভেদ	বৎসর			মন্তব্য
		১৯৮৭-৯০	১৯৭১-৮০	১৯৮১ হতে অদ্যাবধি	
১	বিশ্ববিদ্যালয়	-	-	*০১	*ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে
২	মেডিকেল কলেজ	-	-	*০১	
৩	উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ	০৬	১১	২৩৩	
৪	কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	০১	০১	০৩	
৫	হাসপাতাল (থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্র)	০২	০৩	২৫	(প্রতিটি উপজেলায় ০১ টি করে থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্র)
৬	স্টেডিয়াম	-	-	০৫	
৭	ফ্যাক্টরী ও কটেজ ইন্ডাস্ট্রি	০২	১৯৩	১৩২৮	
৮	যোগাযোগ	-	৪৮ কিমি	১৫০০ কিমি	

সূত্র : ২৪ পদাতিক ডিভিশন সিআই শাখা এবং বিভাগীয় পরিসংখ্যান অফিস, চট্টগ্রাম।

উপর্যুক্ত উন্নয়ন চিত্র হতে সুস্পষ্টভাবে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, সেনাবাহিনীসহ অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর সক্রিয় উপস্থিতি এবং যথাযথ ভূমিকার কারণে পর্যায়ক্রমে নিরাপত্তা পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন হয়েছে। ফলে স্থাপনাগুলো নির্মাণ, পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে। সর্বোপরি, পাহাড়ি জনপদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিপ্লব এসেছে, দারিদ্র্যের হার কমেছে, রাস্তা-ঘাট উন্নত হয়েছে, বাজার অর্থনীতি এবং বিপণন সফলতার মুখ দেখেছে, শিক্ষার হার বেড়েছে, স্বাস্থ্য সেবায় সূচক উন্নত হয়েছে, চাষাবাদ বেড়েছে, জীবনধারায় পরিবর্তন





এসেছে। নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নতি না হলে, সেনাবাহিনী মোতায়ন না হলে এ পরিবর্তন (অর্থনীতির ভাষায় Structural Change) কখনই আনা সম্ভব হতো না।

### উপসংহার

স্বনামধন্য অর্থনীতিবিদগণ বলেছেন, যে উন্নয়ন দারিদ্র্য দূর করে না, কর্মসংস্থান তৈরি করে না এবং ধনী-গরীবের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য কমায় না; তথাপিও দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় বাড়তে থাকে – সে উন্নয়নকে টেকসই উন্নয়ন বলা যাবে না। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে মোতায়নের পর হতে সামাজিক সকল সূচকই উর্ধ্বগতি পেয়েছে। পাহাড়ি জনপদে উন্নয়ন ও প্রাণের স্পন্দন এসেছে। কর্মসংস্থান তৈরির মাধ্যমে দারিদ্র্যের হার কমেছে। শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। অতি দরিদ্র ব্যক্তিবর্গ অনেকাংশেই দারিদ্র্যসীমা (Poverty Line)’র উপরে উঠে এসেছে। বলাই বাহুল্য কোনো উন্নয়নই একদিনে এবং একটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে

করা সম্ভব নয়। বেসামরিক-সামরিক উভয় প্রশাসনের সম্মিলিত চেষ্টাতেই ইহা আনয়ন সম্ভব। নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নতি হলেই অর্থনৈতিক ও সামষ্টিক উন্নয়ন সম্ভব। সেনাবাহিনীসহ অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনী যদিও উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে পার্বত্য এলাকায় মোতায়ন হয়নি, তথাপিও পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান অবস্থার পরিশ্রেক্ষিতে অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী অংশীদারদের মতোই ‘সর্বত্র আমরা পরের তরে’ - এই মূলমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়েই নানাবিধ উন্নয়ন কার্যক্রমে অবদান রেখে চলেছে। উপরে আলোচিত উন্নয়ন কার্যক্রম একটি সেনা জোন কর্তৃক অবশ্যকরণীয়/বাধ্যবাধকতামূলক কর্মকাণ্ড নয়। এটা সম্পূর্ণরূপেই স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম। আলোচনার বাইরেও এই পার্বত্য চট্টগ্রামে মোতায়নের সেনাবাহিনীর প্রতিষ্ঠান আরও অনেক অভিনব পদ্ধতিতে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। সামগ্রিক অর্থে সমগ্র দেশমাতৃকার উন্নয়নে অবিরত, নিঃস্বার্থভাবে অর্পিত দায়িত্ব অত্যন্ত সততা ও দক্ষতার সাথে পালন করে চলেছে- আমাদের প্রিয় সেনাবাহিনী।

### তথ্যসূত্র

- ১। পার্বত্য চট্টগ্রাম : সবুজ পাহাড়ের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হিংসার বর্ণাধারা, হুমায়ুন আজাদ, আগস্ট ১৯৯৭।
- ২। বিদায় চুম্বন : পার্বত্য চট্টগ্রাম, আনিসুল হক, ফেব্রুয়ারি ২০০৯।
- ৩। পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস, জামাল উদ্দিন, ফেব্রুয়ারি ২০১১।
- ৪। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা, আনিসুল হক, এপ্রিল ২০১২।
- ৫। জিওসি ২৪ পদাতিক ডিভিশন ও রিজিয়ন কমান্ডারগণের সাথে কথোপকথন ও নানাবিধ নির্দেশনাবলী, ২০১০-২০১৩।
- ৬। পার্বত্য চট্টগ্রামে ক্যাম্প কমান্ডার, ব্রিগেড মেজর, জোন টুআইসি এবং জোন কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে লব্ধ অভিজ্ঞতা, ১৯৯৬, ২০০৭, জুন ২০১০ - জানুয়ারি ২০১৩।



লেঃ কর্নেল এ কে এম সাজেদুল ইসলাম, পিএসসি, জি, আর্টিলারি ২০ ডিসেম্বর ১৯৯২ সালে ২৭তম বিএমএ দীর্ঘমেয়াদী কোর্সের সাথে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ‘রেজিমেন্ট অব আর্টিলারি’তে কমিশন লাভ করেন। তিনি ফিল্ড রেজিমেন্ট এবং মিডিয়াম ব্যাটারী আর্টিলারির বিভিন্ন নিযুক্তিতে চাকুরীর পাশাপাশি ৭২ পদাতিক ব্রিগেড এর জিএসও-৩ (অপারেশন) এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে অবস্থিত অপারেশনাল ব্রিগেডের ব্রিগেড মেজর হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি স্কুল অব আর্টিলারির একজন ডিস্টিংগুইশ্ট প্রশিক্ষক ছিলেন। তিনি একটি এডহক মিডিয়াম ব্যাটারী, পার্বত্য চট্টগ্রামে সদর দপ্তর ২৪ আর্টিলারি ব্রিগেড এবং অপারেশন উত্তরণের আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রামে ১২ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারির অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বাংলাদেশ হতে গানারি স্টাফ কোর্স, ইন্ডিয়া হতে লং গানারি স্টাফ কোর্স, মিরপুর হতে আর্মি স্টাফ কোর্সসহ দেশে-বিদেশে নানাবিধ পেশাগত কোর্স সম্পন্ন করেন। তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হতে এমএসসি (টেকনিক্যাল) এবং এমডিএস ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ২০০১ সালে সিয়েরালিয়নে ব্যান আর্টিলারি-২ এর সাথে ব্যাটালিয়ন কমিউনিকেশন অফিসার হিসেবে এবং ২০০৮ সালে ডিআর কন্ট্রোল মিলিটারি পর্যবেক্ষক হিসেবে জাতিসংঘ মিশনে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ (এএফডি), প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা পরিদপ্তরে জিএসও-১ হিসেবে কর্মরত আছেন।



## বীরশ্রেষ্ঠদের জীবনগাঁথা ও নব প্রজন্মের শিক্ষা

মেজর মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, পিএসসি, এসি

### ভূমিকা

দেশপ্রেম এক অনন্য উপলব্ধি। এই অনুভূতি শুধু বুকে আগলে রাখার বিষয় নয়; পরিচর্যার বিষয়। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সমন্বিত দেশপ্রেম হতে পারে অপ্রতিরোধ্য, অপরাজেয়। ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতাযুদ্ধ বাঙালি জাতির জীবনে এক অন্যতম গৌরবময় অধ্যায়। আপামর জনসাধারণের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সশস্ত্র বাহিনীসহ সকল স্তরের জনগণ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে যে স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছিল, তার নজির বোধ হয় পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি আর নেই। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ তাই শুধু পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে জয় নয়। বরং এ জয় সমন্বিত উপলব্ধি, জাতীয়তাবোধ আর অসীম দেশপ্রেমের।

১৯৭১ সালে এদেশের বীর সন্তানেরা নিজের বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে এদেশকে শত্রুমুক্ত করে। বিশ্বের বুকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে অধিষ্ঠিত করে একটি দেশ - বাংলাদেশ। ত্রিশ লক্ষ শহিদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের এই স্বাধীনতা। এসব শহিদের প্রত্যেকেই কোনো না কোনোভাবে তাদের আত্মত্যাগের উদাহরণ রেখেছেন। তবে ‘প্রচুর প্রতিকূল অবস্থার বিপরীতে মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ের বীরত্বপূর্ণ কাজ, যে কাজ না করলে শত্রু বাংলাদেশ বাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করতে পারতো। উপরন্তু ঐ বীরত্বপূর্ণ কাজের ফলে শত্রুর ব্যাপক ক্ষতি সাধনের মাধ্যমে যুদ্ধের গতি প্রকৃতিকে স্বপক্ষে প্রভাবিত করেছে’ - এমন কিংবদন্তিসম কর্তব্যবোধ, আত্মত্যাগ, দেশপ্রেম, সহমর্মিতা ও সাহস এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন যে সাতজন, তাঁরা হলেন ‘বীরশ্রেষ্ঠ’।

এই সাতজন বীরশ্রেষ্ঠের মধ্যে তিনজন সেনাবাহিনী হতে - শহিদ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর, শহিদ সিপাহী হামিদুর রহমান ও শহিদ সিপাহী মোস্তফা কামাল, একজন নৌবাহিনী হতে - শহিদ ইঞ্জিনরুম আর্টিফিসার মোহাম্মদ রুহুল আমিন,

একজন বিমান বাহিনী হতে - শহিদ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান এবং দুইজন তৎকালীন ইপিআর হতে - শহিদ ল্যান্স নায়েক মুন্সী আব্দুর রউফ ও শহিদ ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ।

এদেশের প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধা বিশেষত যারা সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে মাতৃভূমিকে স্বাধীন করার জন্য সম্মুখ সমরে জীবন আত্মাহুতি দিয়ে শহিদ হয়েছেন; আমাদের তরুণ ও ভবিষ্যত প্রজন্ম তাঁদের জীবন থেকে শিক্ষা নেয়ার রয়েছে অনেক কিছু। কালজয়ী জাতীয় এই সাত বীরশ্রেষ্ঠের সংক্ষিপ্ত জীবনগাঁথা ও তাঁদের এই জীবনযাপনের আলোকে নবপ্রজন্মের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ আলোকপাত করার ক্ষুদ্র প্রয়াস নেয়া হয়েছে এই লেখাটিতে।

### মুক্তিযুদ্ধে বীরশ্রেষ্ঠদের অবদান

সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর ৭নং সেক্টর এর মহোদিপুর সাব-সেক্টরে নেতৃত্বদানকালে ১৯৭১ সালের ৪ আগস্ট চাঁপাইনবাবগঞ্জ এলাকা শত্রুমুক্ত করতে গিয়ে চরম সাহসিকতার পরিচয় দেন এবং গ্রেনেড নিক্ষেপ করে শত্রুর বাংকার ধ্বংস করতে গিয়ে স্লাইপারের গুলিতে শাহাদত বরণ করেন। অকুতোভয় সিপাহী হামিদুর রহমানও একইভাবে ১৯৭১ সালের ২৮ অক্টোবর ধলই যুদ্ধে যুদ্ধরত অবস্থায় শত্রুর দুটি মেশিনগান ধ্বংস করতে গিয়ে মেশিনগানের গুলিতে শহিদ হন। অপরদিকে ১৯৭১ সালের ১৮ এপ্রিল গঙ্গাসাগর নামক স্থানে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধকালে একাই কাভারিং ফায়ার দিয়ে সহযোদ্ধাদের নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়া নিশ্চিত করতে গিয়ে সিপাহী মোস্তফা কামাল শত্রুর গুলিতে শাহাদত বরণ করেন।

নৌবাহিনীর ইঞ্জিনরুম আর্টিফিসার মোহাম্মদ রুহুল আমিন চরম কর্তব্যবোধের পরিচয় দিয়ে ১৯৭১ সালের ৯ ডিসেম্বর শত্রুর যুদ্ধবিমানের গুলিতে তৎকালীন নৌবাহিনীর যুদ্ধ জাহাজ ‘পলাশ’-এ আগুন লেগে গেলে সাতারে তীরে উঠার সময় শত্রুর গুলিতে শহিদ হন।





বিমান বাহিনীর ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে ১৯৭১ সালের ২০ আগস্ট তাঁর সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ দিতে ফ্লাইট সেক্টি অফিসার হওয়ার সুবাদে টি-৩৩ বিমান নিয়ে সলো মিশনে অংশগ্রহণরত পাকিস্তানি পাইলটকে বিমানের ড্রটির সংকেত দেখানোর মাধ্যমে বিমান থামিয়ে ক্লোরোফর্ম মেশানো রুমাল দিয়ে পাইলটকে অবচেতন করে যুদ্ধবিমানটি হাইজ্যাক করেন। পাকিস্তানিদের র‍্যাডার ও বিমানের ধাওয়া এড়াতে খুব নিচু দিয়ে প্রবল বেগে যুদ্ধবিমানটি চালানোর সময় টেক অফ করার ১২ মিনিট পর পাকিস্তানের মাসরুর ঘাঁটি থেকে ৬৪ নটিক্যাল মাইল দূরে মরু অঞ্চলের বালির ঢিবিতে আঘাত করে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে তিনি শহিদ হন।

ল্যাপ্স নায়েক মুন্সি আব্দুর রউফ ১৯৭১ সালের ৮ এপ্রিল চট্টগ্রামের নানিয়ারচর এলাকায় বাকছড়ি পার্বত্য এলাকায় অবস্থিত প্রতিরক্ষা ব্যুহকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা শত্রুর বিরুদ্ধে একাই লাইট মেশিনগান নিয়ে যুদ্ধ করে শত্রুর স্পিডবোট ধ্বংস করে অনেক শত্রুকে হতাহত করেন এবং নিজ কোম্পানির ১৫০ জন সহযোদ্ধার নিরাপদ অবস্থানে চলে যাওয়া নিশ্চিত করেন। যুদ্ধরত অবস্থায় শত্রুর মর্টারের শেলের আঘাতে একসময় তিনি শাহাদত বরণ করেন।

ল্যাপ্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ ১৯৭১ সালের ৫ সেপ্টেম্বর সুতিপুর এলাকার গোয়ালহাটি নামক স্থানে মাত্র ৪ জন সহযোদ্ধা নিয়ে তিন দিক থেকে ঘিরে ফেলা শত্রুর বিরুদ্ধে চরম সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ পরিচালনা করে মূল প্রতিরক্ষা অবস্থানকে শত্রুর আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করেন। সহযোদ্ধা সিপাহী নান্নু মিয়া এ যুদ্ধে গুলিবিদ্ধ হলে তাঁকে কাঁধে নিয়ে নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার সময় ডান কাঁধে গুলিবিদ্ধ ও হাঁটুতে মর্টারের শেলের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় একাই এসএলআর এর মাধ্যমে যুদ্ধ করে সহযোদ্ধাদের নিরাপদে মূল প্রতিরক্ষা অবস্থানে ফিরে যেতে সাহায্য করেন। এভাবে যুদ্ধরত অবস্থায় একসময় তিনি শহিদ হন।

### বীরশ্রেষ্ঠ খেতাবে ভূষিতকরণ

যুদ্ধকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা, শত্রুর বিশাল ক্ষতিসাধন, সম্মুখ সমরে দিকনির্দেশনা আর

আক্রমণাত্মক অভিযানে নেতৃত্বদানকারী আত্মত্যাগী ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীরকে সর্বোচ্চ সম্মান জানাতে মরণোত্তর ‘বীরশ্রেষ্ঠ’ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। দেশপ্রেম আর কর্তব্যবোধে বলীয়ান হয়ে সিপাহী হামিদুর রহমান অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে সর্বোচ্চ খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা ‘বীরশ্রেষ্ঠ’ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। আত্মত্যাগ, কর্তব্যবোধ, দেশপ্রেম এবং ব্যক্তিগত সাহসী সিদ্ধান্তে সহযোদ্ধাদের প্রাণরক্ষায় অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য জাতি সিপাহী মোস্তফা কামালকে মুক্তিযুদ্ধের সর্বোচ্চ সম্মান মরণোত্তর ‘বীরশ্রেষ্ঠ’ খেতাবে ভূষিত করে। দেশমাতৃকার জন্য সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে নিজের জীবনের বিনিময়ে রেখে যাওয়া বিরল দৃষ্টান্তের স্বীকৃতিস্বরূপ রুহুল আমিনকে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সম্মান মরণোত্তর ‘বীরশ্রেষ্ঠ’ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। মহান মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি প্রশিক্ষণ যুদ্ধবিমান ছিনতাই করে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করার অদম্য ইচ্ছে ও দুঃসাহসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে সারাবিশ্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার স্বীকৃতিস্বরূপ স্বাধীন বাংলাদেশ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমানকে মরণোত্তর ‘বীরশ্রেষ্ঠ’ উপাধিতে ভূষিত করে। অভূতপূর্ব সাহসিকতা ও নিজের জীবনের বিনিময়ে সহযোদ্ধাদের জীবন রক্ষায় মহান আত্মত্যাগের পরিচয় দেয়ায় জাতি সিপাহী মুন্সি আব্দুর রউফকে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শনের স্বীকৃতিস্বরূপ ‘বীরশ্রেষ্ঠ’ খেতাবে ভূষিত করে। ১৯৭৩ সালে তাঁর এই অসামান্য অবদানের জন্য তাঁকে মরণোত্তর সৈনিক হতে ‘ল্যাপ্স নায়েক’ পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়। দুঃসাহসিক ভূমিকা আর দেশ ও সহযোদ্ধাদের প্রতি চরম আত্মত্যাগের কারণে মুন্সি আব্দুর রউফকে মরণোত্তর ‘ল্যাপ্স নায়েক’ পদে পদোন্নতি দেয়া হয় এবং দেশের সর্বোচ্চ সম্মান ‘বীরশ্রেষ্ঠ’ খেতাবে ভূষিত করা হয়।

### তরুণ প্রজন্মের জন্য শিক্ষণীয়

তরুণরা উদ্যমী, প্রত্যয়ী; তারা ছিনিয়ে আনতে পারে জয়। যুগে যুগে যে কোনো ক্রান্তিলগ্নে এই তরুণরাই ভয়-বাধা উপেক্ষা করে এগিয়ে এসেছে। এগিয়ে এসেছে মানবতার স্বার্থে ভাল কিছু করার লক্ষ্যে। এই তরুণ প্রজন্মই পারে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। যুগের পর যুগ ধরে তাই সকলেই তরুণদের উজ্জীবিত করেছেন। কবি-সাহিত্যিকরা এদেরকে নিয়েই রচনা করেছেন কবিতা,



উপন্যাস, গান; এদের নিয়েই তৈরি করা হয়েছে চলচ্চিত্র, নাটক। আর কেউ কেউ নিজের জীবন উৎসর্গ করে তরুণদের জন্য দিয়ে গেছেন দিকনির্দেশনা, রচনা করে গেছেন অনন্য উদাহরণ। তার পদচিহ্ন আমরা দেখতে পাই ৫২'র ভাষা আন্দোলনে, ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানে এবং সর্বোপরি ৭১ এর স্বাধীনতা যুদ্ধে। ১৯৭১ সালে লক্ষ লক্ষ অকুতোভয় নারী-পুরুষ নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে শুধু দেশমাতৃকার স্বাধীনতাকেই ছিনিয়ে আনেনি, বরং তাঁরা ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য রেখে গেছেন ভাল কিছু করার, দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া আর জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে প্রতিষ্ঠিত হবার অনন্য উদাহরণ। এই উদাহরণ প্রতিষ্ঠায় যাদের সবচেয়ে সম্মানের সাথে স্মরণ করা হয় তাঁরা হলেন আমাদের 'বীরশ্রেষ্ঠগণ'। এদের কাছ থেকে তরুণ প্রজন্মের শিক্ষণীয় রয়েছে অনেক কিছু।

### স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় ত্যাগ স্বীকার

স্বাধীনতা একটি জাতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। এই স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে আমাদের বীরশ্রেষ্ঠগণ স্ত্রী-সন্তান, বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজনদের মায়া ত্যাগ করে অসীম সাহসিকতা, দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ আর ত্যাগ স্বীকার করে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। বীরশ্রেষ্ঠদের অধিকাংশই ছিলেন তরুণ। আমাদের নবপ্রজন্ম তথা সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্যদের তাই বীরশ্রেষ্ঠদের মতো স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের মতো অমূল্য সম্পদকে রক্ষা করার জন্য নিঃস্বার্থভাবে দায়িত্ব পালন ও ত্যাগ স্বীকার করার ব্রত নেয়া উচিত।

### দেশের উন্নয়ন ও বিপর্যয়ে নিঃস্বার্থভাবে কর্তব্যপালন

আমাদের বীরশ্রেষ্ঠগণ নিজ নিজ এলাকার উন্নয়নে ছিলেন সদা সচেষ্ট। নিঃস্বার্থভাবে তাঁরা সকলকে সাহায্য করতেন। ছোটবেলা থেকেই তাঁদের এই গুণাবলী মুক্তিযুদ্ধের সময়ও তাঁরা বহাল রাখেন। যুদ্ধে পর্যুদস্ত নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-শিশু সবার প্রতি তাঁরা অকাতরে সাহায্যের হাত বাড়াতেন। আমাদের নবপ্রজন্মের তরুণরা অবশ্য এ থেকে পিছিয়ে নেই। দেশের বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, পাহাড়ধ্বস কিংবা সম্প্রতি সাভারের রানা প্লাজা নামক ভবন ধ্বসের মতো

দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে সশস্ত্র বাহিনীসহ সকল স্তরের জনগণ বিশেষত তরুণেরা নিঃস্বার্থভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে এক অনন্য দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। তাই দেশের উন্নয়ন ও বিপর্যয়ে নিঃস্বার্থভাবে কর্তব্যপালনের এই ধারাবাহিকতাকে ধরে রাখতে সদা সচেষ্ট থাকাই হবে তাদের পরবর্তী শিক্ষা।

### নেতৃত্ব ও সাহসিকতার শিক্ষা গ্রহণ

বীরশ্রেষ্ঠগণের প্রত্যেকের মাঝে ছিল সম্মুখ থেকে নেতৃত্ব প্রদানের গুণাবলী। দেশ ও স্বাধীনতার স্বার্থে তাঁরা সামনে থেকে নেতৃত্ব প্রদান করেছেন। কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নেতৃত্ব দিয়ে তাঁরা সমসাময়িক অফিসার ও সৈনিকদের অনুপ্রাণিত করেছেন। শত্রুর মুহুমুহু গুলি, চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলা শত্রু এসব কিছুই তাঁদের অদম্য সাহসিকতার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। আর তাঁদের এই সাহস ও নেতৃত্বের কারণেই মুক্তিযোদ্ধারা সুসজ্জিত পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে সীমিত সংখ্যক অস্ত্র-জনবল নিয়ে যুদ্ধ করে জয়ী হতে সক্ষম হয়েছিলেন। তরুণরাই একদিন দেশ পরিচালনা করবে। আর দেশ পরিচালনার জন্য প্রয়োজন সঠিক নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষমতা। দেশের জন্য ভালো কিছু করার ইচ্ছে না থাকলে, ক্ষমতার লোভে নেতৃত্ব দিতে গেলে সাধারণ জনগণ সেই নেতৃত্বকে মেনে নেয়না। আজকের নবপ্রজন্ম ভাল-মন্দ বিবেচনা না করে, উদ্দেশ্যবিহীনভাবে নেতৃত্ব প্রদান করতে গিয়ে মারামারি, খুন, হত্যার মতো জঘন্য অপরাধে লিপ্ত হয়ে পড়ছে। বীরশ্রেষ্ঠদের কাছ থেকে তাই তাদের এই শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত যে নেতৃত্ব প্রদান করতে হবে সামনে থেকে, সাহসী হয়ে দেশ ও জাতির স্বার্থে ভাল কিছু করার জন্য।

### অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা মনুষ্যত্ব তথা প্রবল ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। বীরশ্রেষ্ঠরা প্রত্যেকেই ছিলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার ও প্রতিবাদী। ১৯৭১ সালে পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে তাঁরা শুরু থেকেই প্রতিবাদ করেন। উপরন্তু বীরশ্রেষ্ঠ জাহাঙ্গীর, হামিদুর, নূর মোহাম্মদ শেখ, আব্দুর রউফ, রুহুল আমিন - তাঁরা প্রত্যেকেই নিজ কর্মস্থল থেকে পালিয়ে এসে এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে নিজের জীবন বিসর্জন





দিতে হতে পারে জেনেও তাঁরা কখনো পিছপা হননি। তরুণরাই একটি জাতির মূল চালিকাশক্তি। তরুণদেরই তাই সর্বপ্রথম এগিয়ে আসতে হবে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে। জাতির গর্বিত সন্তান বীরশ্রেষ্ঠগণ হতে পারেন তাদের জন্য এক অনন্য উদাহরণ।

### শিক্ষার প্রতি একাগ্রতা

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। একটি শিক্ষিত জাতিই দেশকে নিয়ে যেতে পারে উন্নতির মহিসোপানে। সুশিক্ষা মানুষকে ভাল সম্বন্ধে ভাবতে শেখায়, মনকে করে উদার। এ বিষয়টি আমাদের বীরশ্রেষ্ঠরা সকলেই উপলব্ধি করতেন। আর উপলব্ধি করতেন বলেই দারিদ্র্য, সংসারের অস্বচ্ছলতা, পরিবার পরিজন ছেড়ে ভাল কোনো স্কুল/কলেজে পড়তে যাওয়া, নিকটাত্মীয়দের হারানোর বেদনা এরকম আরো নানা প্রতিকূলতাকে ছাপিয়ে তাঁদের কেউ কেউ লেখাপড়া চালিয়ে যেতে না পারলেও তাঁদের মাঝে ছিল অদম্য স্পৃহা। শিক্ষার প্রতি তাঁদের এহেন একাগ্রতা দেখে আমাদের তরুণ প্রজন্মের এ দীক্ষায় দীক্ষিত হতে হবে যে, ভাল জাতি হতে হলে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। আর তাই শিক্ষিত জাতি হিসেবে তাদের নিজেদের গড়ে তুলতে হবে।

### পেশাগত দক্ষতা অর্জন

বীরশ্রেষ্ঠগণ প্রত্যেকেই তাঁদের নিজ নিজ অবস্থানে পেশাদারিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। পশ্চিম পাকিস্তানিদের বাঙালিদের প্রতি অসম মূল্যায়নও তাই তাঁদের উন্নতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। বরং তাঁদের পেশাগত দক্ষতা দেখে পাকিস্তানি অফিসার, সৈনিকরাও অনুপ্রাণিত হতেন। বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাক-ভারত যুদ্ধে পেশাগত দক্ষতার সফল উদাহরণ দিয়ে এই পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নিকট থেকে তমঘা-ই-জং ও সিঁতারা-ই-হারম নামক দুটি মেডেল লাভ করেছিলেন। পেশাগত দক্ষতায় বীরশ্রেষ্ঠ জাহাঙ্গীর, মতিউর, রুহুল আমিনও সফলতার পরিচয় দিয়েছেন। বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফও ছিলেন লাইট মেশিনগান চালনায় বিশেষ পারদর্শী যা তাঁর পেশাগত দক্ষতারই পরিচায়ক। পেশাগত দক্ষতা আত্মবিশ্বাসের পাশাপাশি সফলতা ও সম্মান বয়ে নিয়ে আসে। আমাদের নব প্রজন্ম আজ বিভিন্ন পেশায় দেশে ও বিদেশে তাদের পেশাগত দক্ষতার স্বাক্ষর রাখতে শুরু করেছে। নিজ নিজ অবস্থানে পেশাগত দক্ষতা অর্জন করে তারা দেশকে আরো সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে -

বীরশ্রেষ্ঠদের জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে তাই তাদের হতে হবে আরো প্রত্যয়ী, আরো উদ্যমী।

### পরিবারের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ

বীরশ্রেষ্ঠদের জীবনগাঁথা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় হামিদুর রহমান, নূর মোহাম্মদ শেখ, মুন্সি আব্দুর রউফ এরা প্রত্যেকেই তাঁদের পরিবারের কথা চিন্তা করে নিজের বেতনের সিংহভাগ অংশ বাবা-মার কাছে পাঠাতেন। মতিউর রহমান প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও স্ত্রী-সন্তানদের খেয়াল রাখতেন, পরিচর্যা করতেন। পারিবারিক বন্ধনের শিথিলতার কারণে আজকাল সমাজে পারিবারিক অশান্তি, সন্তানদের মাদক আর নেশার দিকে ঝুঁকে পড়া এবং এক সময় পরিবারের প্রিয়জনদের হত্যা করার মতো জঘন্য অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। সামাজিক মূল্যবোধ আর অবক্ষয়ের দিকে ধাবিত হচ্ছে তরুণ সমাজ। আজকের পুত্র-কন্যা আগামীরা স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা। পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালবাসা, মমত্ববোধ, দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যবোধের দীক্ষায় দীক্ষিত হওয়া উচিত আমাদের তরুণ প্রজন্মের। পরিবারের প্রতি বীরশ্রেষ্ঠদের শ্রদ্ধা, ভালবাসা, দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ থেকে আমাদের নবপ্রজন্মের শিক্ষা নেয়া উচিত। মনে রাখতে হবে যে পারিবারিক বন্ধনই কেবল ভবিষ্যতে তাদের প্রত্যয়ী করে তুলতে পারে।

### সৎ ও সাধারণ জীবনযাপন

বীরশ্রেষ্ঠগণ সকলেই অত্যন্ত সৎ ও সাধারণ জীবনযাপন করতেন। পারিবারিক অস্বচ্ছলতা থাকলেও তাঁদের চারিত্রিক দৃঢ়তা এতটাই প্রবল ছিল যে লোভ-লালসা, প্রলোভন তাঁদের কখনোই বিচলিত করতে পারেনি। অফিসার হয়েও বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর একটি মোটা কাপড়ের লুঙ্গি, তিন পকেটের জামা, লাল গামছা আর ক্যানভাসের লাল জুতা পরিধান করে মুক্তিযুদ্ধের পুরোটা সময়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন। আজ মূল্যবোধ ও নৈতিকতার বিপর্যয়ের কারণে সমাজে দুর্নীতিপরায়ণ হওয়ার প্রবণতা বেড়ে গেছে। আমাদের তরুণ সমাজও এই দুর্নীতির প্রভাবমুক্ত নয়। আজকের তরুণ আগামী দিনের কাঙারি। তারাই একদিন দেশের দায়িত্ব তুলে নিবেন নিজেদের কাঁধে। বীরশ্রেষ্ঠগণের কাছ থেকে তাই সৎ ও সাধারণ মানুষ হবার শিক্ষা নিয়ে তাদেরকেই একদিন নেতৃত্ব দিতে হবে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ে তোলার জন্য।



## নিয়মিত খেলাধুলা করা

খেলাধুলা মনকে সতেজ ও প্রফুল্ল করে। দেহকে সুস্থ ও সুঠাম করে গড়ে তোলে। আর সুস্থ ও সুঠাম দেহ মানুষকে সাহসী করে তোলে। এছাড়াও খেলাধুলা জেতার ইচ্ছেশক্তি বাড়ায়। ছোটবেলা থেকে শেখায় সাহসী, উদ্যোগী, উদ্যমী, সহমর্মী আর সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবী হওয়ার। বীরশ্রেষ্ঠরা সকলেই খেলাধুলার প্রতি অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই তাঁরা প্রত্যেকে নিয়মিতভাবে মাঠে বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা করতেন। আর এ কারণেই তাঁরা ছিলেন সুঠামদেহী। পাকিস্তানি জওয়ানদের সাথে পাল্লা দিয়ে তাঁরা হতে পেরেছিলেন এক একজন গর্বিত সৈনিক। বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর ছিলেন একজন বক্সার। উদ্যোগী, উদ্যমী, সাহসী আর সহমর্মী হওয়ার শিক্ষাও পেয়েছিলেন তাঁরা এই খেলার মাঠ থেকেই। আমাদের তরুণ প্রজন্ম আজ প্রযুক্তিভিত্তিক খেলাধুলা ও বিনোদনের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ছে যা তাদের শুধু স্থলদেহী ও কুঁড়েই করছেন, উপরন্তু তাদের সৃজনশীল চিন্তাশক্তি ও বিভিন্ন পরিস্থিতি মোকাবিলা করার মানসিক সক্ষমতাকে দুর্বল করে ফেলেছে। আর এ কারণেই তারা হয়ে পড়ছে মাদকাসক্ত। আমাদের তরুণদের তাই প্রযুক্তিভিত্তিক বিনোদন ও খেলাধুলার গন্ডি থেকে বেরিয়ে এসে মাঠে খেলতে নামতে হবে। মনে রাখতে হবে যে খেলাধুলা তাদের সুস্থ রাখার পাশাপাশি সৃজনশীল চিন্তাশক্তি বাড়াতে সাহায্য করবে।

## উপসংহার

জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীরশ্রেষ্ঠগণ নবপ্রজন্মের জন্য অনন্য এক উদাহরণ। আমরা বর্তমান বিশ্বের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিত্বদের দেখে অনুপ্রাণিত হই, তাঁদের

আদর্শকে বুকে ধারণ করার স্বপ্ন দেখি, তাঁদের অনুকরণ করি। আমাদের বীরশ্রেষ্ঠগণই হতে পারেন নবপ্রজন্মের জন্য উৎকৃষ্ট উদাহরণ। দেশ ও মানুষের প্রতি ভালবাসা, মানবতার স্বার্থে আত্মত্যাগ, দেশ ও জাতির উন্নয়নে নিঃস্বার্থ কর্তব্যবোধ, পারিবারিক বন্ধনের একাগ্রতা, সৎ ও সাধারণ জীবনযাপন, সহমর্মিতা, সম্মুখ থেকে নেতৃত্ব, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ইত্যাদির মতো আরো অনেক মানবিক মূল্যবোধের শিক্ষা আমরা তাঁদের জীবন থেকেই গ্রহণ করতে পারি। এক অর্থে তাঁদের জীবনগাঁথা নবপ্রজন্মের জন্য হতে পারে একটি সুস্থ ও সুন্দর জীবন গঠন এবং পরিচালনার উদাহরণ। স্বাধীনতার পর আজ ৪২ বছর পেরিয়ে গেছে। আমরা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে ভুলতে বসেছি। ভুলতে বসেছি জাতির গৌরব বীর মুক্তিযোদ্ধাদের, যারা অকাতরে তাঁদের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে ছিনিয়ে এনেছেন আমাদের এই দেশ, এই স্বাধীনতা। আজকের তরুণ প্রজন্ম আগামীর সম্ভাবনা ও ভবিষ্যত। দেশ পরিচালনার দায়িত্বে একদিন তাদেরই এগিয়ে আসতে হবে। সে কারণে এখন থেকেই তাঁদের নিজেদের প্রস্তুত করতে হবে, সুসজ্জিত করতে হবে মানবিক গুণাবলীতে। আর নিজেদের প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাদের জন্য প্রকৃষ্ট উদাহরণ, আদর্শ, অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় হতে পারেন জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীরশ্রেষ্ঠগণ। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বীরশ্রেষ্ঠদের জীবন থেকে আমাদের তরুণ প্রজন্ম শিক্ষা গ্রহণ করে একদিন ঠিকই গর্বিত জাতি হিসেবে বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে, এ দেশকে মাথা উঁচু করে দাঁড় করাতে সক্ষম হবে। একদিন এ স্বপ্ন নিশ্চয়ই সত্যি হবে, কারণ - ইতিহাস ভুলে যাওয়া যে বড়ই কঠিন।



মেজর মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, পিএসসি, এসি ১১ জুন ১৯৯৮ সালে ৩৮তম বিএমএ দীর্ঘমেয়াদী কোর্সের সাথে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে সাজোয়া কোরে কমিশন লাভ করেন। তিনি আর্মার্ড কোর সেন্টার এন্ড স্কুলে প্রশিক্ষক শ্রেণি 'সি' ও বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমিতে প্লাটুন কমান্ডার হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজ, মিরপুরের একজন গ্র্যাজুয়েট। এছাড়াও তিনি ২০০৭ সালে লাইবেরিয়ায় ব্যানব্যাট-১৩ এ কমান্ড সাপোর্ট প্লাটুন কমান্ডার হিসেবে জাতিসংঘ মিশনে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, বেসামরিক ও সামরিক সংযোগ পরিদপ্তরের জেনারেল স্টাফ অফিসার গ্রেড-২ হিসেবে কর্মরত আছেন।





## বৈষম্য থেকে সংগ্রাম অতঃপর স্বাধীনতা বাংলার ইতিহাসের আরেক পুনরাবৃত্তি - ‘দক্ষিণ সুদান’

লেঃ কমান্ডার মেহেদী আমীন মিয়া, (জি), পিএসসি, বিএন

### প্রারম্ভিক

১৪ নভেম্বর ২০১০, এক পশলা বৃষ্টি শেষে অস্বাভাবিকভাবে কর্দমাক্ত দক্ষিণ সুদানের ‘মালাকালে’ লাল আঠালো মাটিতে পা রাখলাম। গন্তব্য মালাকালে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ফোর্স রিভারাইন ইউনিট BANFRU ঘাঁটিতে এক বছরের জন্য মিশনে যোগদান। ইউনিটে ফিরতে ফিরতেই কড়কড়ে রোদে মাটি শুকিয়ে খটখটে হয়ে উঠল। যখন রুমের সামনে নামলাম নীল নদের পাশে ২০০ বর্গমিটার এলাকা জুড়ে BANFRU ঘাঁটি আর মাঝে প্রকাণ্ড বাবলা গাছ দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। ইটালির তৈরি UN এ কর্মরতদের জন্য আবাসন নাজুক করিমেক (Container House) এ ঢোকার আগেই ছোটখাট গড়নের চকচকে কালো বর্ণের এক ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে শুভেচ্ছা জানালেন। তার নাম পিটার টু। তিনি BANFRU এর সবচেয়ে অভিজ্ঞ রিভারাইন পাইলট। আমাকে অনুরোধ জানালেন বুটের গায়ে লেগে থাকা শুকনো কাঁদা মাটি মুছে যেন রুমে যাই। সামনে ঝোলানো এক টুকরা কাপড় পানিতে ভিজিয়ে বুটের পাশের লাল কাঁদামাটি মুছতে থাকলাম কিন্তু পুরোপুরি পরিষ্কার হচ্ছিল না। পিটার টু শ্মিত হেসে বললেন, “সাহেব সাবান ব্যবহার করুন, এ মাটি তৈলাক্ত, পানি দিয়ে ঘষলে যাবে না। যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন তার কিছুটা গভীরেই তেলের স্তর - হয়তো এ সম্পদের জন্যই আমরা আজও পরাধীন। আমাদের প্রতি উত্তর-সুদান আর পশ্চিমা য়ে বৈষম্য প্রদর্শন করেছে - যেভাবে আমরা অবহেলিত আর নিষ্পেষিত হয়েছি - সে ইতিহাস আপনাদের জানা থাকা উচিত। আপনারা বাংলাদেশী; আমাদের সাথে আপনারদের ঐতিহাসিকভাবে অদ্ভুতরকম মিল; তবুও কেন আপনারদেরই আগমন আমার দেশে? সেলুকাস!! ওয়েলকাম টু মালাকাল! সাহেব ওয়েলকাম”।

### ইতিহাসের ক্রমধারায় সুদান

মধ্যযুগে আরবরা জাতিগতভাবে আফ্রিকানদের উপর নির্যাতন চালাতো। মধ্যযুগে আরবদের উন্নত সমরাস্ত্রের কারণে আফ্রিকানদের দাসত্ববরণে বাধ্য করা হতো। সে যুগে আরব সভ্যতার পিরামিড থেকে শুরু করে সুউচ্চ অট্টালিকা আফ্রিকান দাসদের শ্রমের বিনিময়ে প্রস্তুত করা হয়। আফ্রিকানদের উপর তুর্কি ইজিপশিয়ানদের সাম্রাজ্যবাদী বর্বরতা, দাসপ্রথা সাময়িকভাবে ১৮৯২ সালে বন্ধ করা হয় ব্রিটিশ-বেলজিয়ানদের হস্তক্ষেপে। পরবর্তীতে ১৮৯৮ সালে ফ্রেঞ্চরা ব্রিটিশদের সাথে যুক্ত হয়ে সুদানে যৌথ শাসন প্রতিষ্ঠা করে। ক্রমান্বয়ে ১৯০০ সালে ফরাসি বাহিনী চলে গেলে ১৮৯৮ হতে ১৯৪৭ পর্যন্ত ব্রিটিশরাই সুদানে একচ্ছত্র শাসন প্রতিষ্ঠা করে। ব্রিটিশ শাসনামলে আফ্রিকার বিভিন্ন উপজাতিদের যেন দাসত্ববরণে বাধ্য করা না হয় সে কারণে আরব ধ্যান-ধারণার ধারক উত্তর সুদান আর আফ্রিকান সংস্কৃতির ধারক দক্ষিণ সুদানকে Close District Ordinance 1920 আইনের মাধ্যমে আলাদা করা হয়। ক্রমান্বয়ে এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাতায়াতের ক্ষেত্রে পাশ প্রবর্তন করা হয় ১৯২২ সালে। ট্রেড পারমিট চালু হয় ১৯২৫ সালে আর ভাষা ও সংস্কৃতিরক্ষণ পলিসি প্রবর্তন করা হয় ১৯২৮ সালে। এতে দক্ষিণ সুদানের প্রধান ভাষা আরবির পরিবর্তে ইংরেজিকে দাপ্তরিক ভাষা করার পাশাপাশি গুলুক, ডিংকা, নুয়ের বারি, লাটুকু ও জাভি (Zandi) ভাষাকে স্থানীয় উপজাতীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। ব্রিটিশরা এরই মাঝে NSAC – North Sudan Advisory Council 1943 প্রতিষ্ঠা করে ও দুই দেশের সীমানা নির্ধারণ করে প্রায় ৭৩% খনিজ সম্পদ দক্ষিণ সুদানের রাষ্ট্রীয় সীমানায় অন্তর্ভুক্ত করে। NSAC-1943 এর দ্বারা উত্তর সুদানকে খার্তুম, কর্দোফান, দারফুর, পূর্ব প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ ও ক্রনাইল এই ছয় অঞ্চলে ভাগ করে উত্তর সুদানিদের হাতে প্রাদেশিক শাসনভার হস্তান্তর করা হয় কিন্তু দক্ষিণ



সুদান ব্রিটিশদের হাতে রয়ে যায়। যার ফলে আইনসিদ্ধভাবে উত্তর ও দক্ষিণ সুদান নামে দুটি আলাদা অঞ্চলের সৃষ্টি হয়।



চিত্র-১ : ইতিহাসের ক্রমধারায় সুদানের বিভক্তি ও পাক-ভারত বিভক্তি

স্বাধীন বাংলায় ব্রিটিশ-ইংরেজদের হাতে ২০০ বছরের পরাধীনতার ইতিহাস—১৭৫৭ সালের পলাশী থেকে ১৯৪৭ সালের দেশভাগ—সেই একই সূতোয় গাঁথা। ব্রিটিশরা হিন্দুস্থান আর পাকিস্তান নামে ধর্মীয় মতাদর্শে দুটি আলাদা রাষ্ট্রের সূচনা করে গেলেও পরবর্তী বিভাজনের সুপরিচালিত বীজ বুনে যায় শত মাইল দূরে পূর্ব আর পশ্চিম পাকিস্তান নামে দুটি ভিন্ন সংস্কৃতির দেশ সৃষ্টি করে যার মাঝে দাঁড়িয়ে ছিল হিন্দুস্থান বা বর্তমান ভারত। সময়ের আবর্তে নিশ্চিত পরিণতি হবে বিভাজন - এই অপেক্ষার প্রহরই যেন গুনছিল ইতিহাস যেমনটির পুনরাবৃত্তি হয়েছে উত্তর আর দক্ষিণ সুদানের ক্ষেত্রে। ব্রিটিশ সৃষ্ট জাতিগত, সামাজিক, ভাষাগত আর সাংস্কৃতিক বৈষম্যের কারণে নিশ্চিত পরিণাম স্বাধীনতায়ুদ্ধের পথ বেছে নিতে হয় দক্ষিণ সুদানকে যেমনটি হয়েছিল ১৯৭১ সালে - বাংলাদেশের ক্ষেত্রে।

### পরাদীনতা ও সাম্রাজ্যবাদ

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন আমলে লর্ড ফেডরিক লুগাই Indirect Rule শাসন ব্যবস্থা চালু করেন। এই ব্যবস্থায় উত্তর ও দক্ষিণ সুদানে একই সাথে আর্থ-সামাজিকভাবে উন্নত হওয়ার রূপরেখা প্রবর্তিত হলেও সম্পদসমৃদ্ধ দক্ষিণ সুদানের সকল কাঁচামাল আর অপরিশোধিত তেল উত্তর সুদানে তেল শোধনাগার স্থাপন করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। অপরদিকে মিশনারি স্থাপনের মাধ্যমে দক্ষিণ সুদানের বিভিন্ন গোত্রকে ব্যাপকভাবে খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়। খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত গোত্রসমূহকে শিক্ষা, চিকিৎসা ও জমিজমা চাষাবাদের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। উত্তর

ও দক্ষিণ সুদানের মাঝে সাংস্কৃতিক বৈষম্যের পাশাপাশি এই ধর্মীয় বৈষম্য দুই দেশের মধ্যে আরও দূরত্ব সৃষ্টি করতে থাকে। ইতোমধ্যে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী উত্তর সুদানের মত দক্ষিণ সুদানেও Advisory Council প্রবর্তনের মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করেন। উত্তর সুদানের তেল শোধনাগার রক্ষণাবেক্ষণ ও অর্থনৈতিক চুক্তি (খার্তুম ডিক্লারেশন ১৯৪৬) অনুযায়ী দক্ষিণ সুদানের শাসনভার উত্তর সুদানের শাসকগোষ্ঠীর হাতে সোপর্দ করা হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এই স্বার্থপরতায় হতবাক দক্ষিণ সুদানের উপজাতি গোত্র আবারও পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয় উত্তর সুদানের হাতে। ফলে পৃথিবীর মানচিত্রে সমগ্র সুদান একরাষ্ট্র হিসেবে দেখানো হয়। আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর হঠকারিতাকে ‘দক্ষিণ সুদান এখনও স্বাধীনতা লাভের যোগ্যতা অর্জন করতে না পারায় মূল সুদানের সাথে একীভূত থাকাই শ্রেয়তর’- বলে উল্লেখ করা হয়। উত্তর সুদানের কাছে দক্ষিণ সুদানকে ব্রিটিশ শাসক কর্তৃক হস্তান্তরের এই প্রক্রিয়াকে পরবর্তীতে জুবা কনফারেন্স ১৯৪৭, সুদান লেজিসলেটিভ এসেমবলী ১৯৪৮ এবং কায়রো এগ্রিমেন্ট ১৯৫৩ এর সম্মেলনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা চালানো হয়। বিশ্ববাসীর কাছে উত্তর সুদান, মিশরীয় ও ব্রিটিশ শাসকদের ত্রিমুখী প্রতারণা স্পষ্টতর হয় যখন জাতিসংঘের শরণাপন্ন হবার কোনো সুযোগ না দিয়ে ব্রিটিশরা সম্পূর্ণভাবে উত্তর সুদানকে দক্ষিণ সুদানের প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ করে দেয়।



চিত্র-২ : উত্তর কর্তৃক দক্ষিণ সুদানে সাম্রাজ্যবাদ এবং বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা

দক্ষিণ সুদানের মতো ১৯৪৭ সালে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান নামে ধর্মীয় বিবেচনায় দুটি ভূখন্ডের সৃষ্টি হলেও দুটি দেশের ভাষা, সংস্কৃতি আর ঐতিহ্যগত বিভেদের কারণে ১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীনতা হারিয়ে ব্রিটিশ থেকে পশ্চিম





পাকিস্তান শোষণের শিকার হয়। সর্বপ্রথম পূর্ব পাকিস্তানের মাতৃভাষার উপর আঘাত আসে ১৯৫২ সালে। আর লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে বীর বাঙালি মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। একের পর এক সামরিক ও বেসামরিক ক্ষেত্রে দমন-পীড়ন চলতে থাকে পূর্ব পাকিস্তানিদের উপর যাকে বিশ্ব দরবারে Miscreants Suppression নামে অভিহিত করা হয়। ১৯৬৬ সালের গণভোট ও ৬ দফা, ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান আর অবশেষে ১৯৭১ সালের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ - এ সবই পরাধীনতা আর সাম্রাজ্যবাদের শিকল ছিঁড়ে স্বাধীনতার সূর্য ছিনিয়ে আনা সাহসী বাঙালি জাতির উপাখ্যানের স্বাক্ষর বহন করে।

### বৈষম্য থেকে সংগ্রাম

ব্রিটিশ শাসক কর্তৃক দক্ষিণ সুদানের শাসনভার উত্তর সুদানের কাছে হস্তান্তরের হঠকারী সিদ্ধান্তে বিমূঢ় দক্ষিণ সুদানের নৃ-গোষ্ঠী শিকার হয় চরম বৈষম্য আর অবমাননার। উত্তর আর দক্ষিণ সুদান এক হয় সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কিন্তু উন্নয়নের পরিবর্তে পরিলক্ষিত হল শুধুই পশ্চাৎপসারণ। সেন্ট্রাল সুদানিজ গভার্নমেন্ট কর্তৃক দক্ষিণ সুদানের অবহেলিত জনপদে যে সকল বৈষম্যের নজিরসমূহ পরিলক্ষিত হচ্ছিল তার একটি অংশ তুলে ধরা হলো :

ক। স্বাধীন ও একীভূত রাষ্ট্র হিসেবে সুদানকে পরিচালিত করার জন্য Sudan Legislative Council 1948 এ প্রতিষ্ঠিত হলেও সে রাষ্ট্র পরিচালনার দলে দক্ষিণ সুদানের কোন প্রতিনিধিকেই রাখা হয়নি।

খ। উত্তর সুদানের বশীর সরকার ও তৎপূর্ববর্তী সরকারসমূহ বিভিন্ন সময়ে দক্ষিণ সুদানে গোত্রসমূহের মধ্যে হিংসা, হানাহানি ও হত্যাযজ্ঞ বন্ধে বিশেষত তেল ও খনিজ সমৃদ্ধ অঞ্চলে সরাসরি অভিযান পরিচালিত করে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করে।

গ। দক্ষিণ সুদানে গুলুক, নুয়ের ও জাভি গোত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও বিভিন্ন প্রদেশে উত্তর সুদানের শাসক কর্তৃক সংখ্যালঘু ডিংকা ও

বারি গোত্র হতে আঞ্চলিক শাসক প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয়। ডিংকা গোত্র প্রধানত শিকারী ও বনে অবস্থান করতো এবং অপেক্ষাকৃত হিংস্র বিধায় তাদেরকে সাময়িক সুবিধা প্রদান করে অন্যান্য গোত্রকে অভ্যন্তরীণভাবে নিষ্পেষণ করতে থাকে।

ঘ। ঐতিহাসিকভাবে মিশরিয়রা উত্তর সুদানের জনপদের সাথে মিলিত হয়ে দক্ষিণ সুদানের সাধারণ মানুষকে দাসত্ববরণে বাধ্য করতো। সে কারণে আরবীয় ধ্যান-ধারণার ধারক উত্তর সুদানিদেরকে সম্পদসমৃদ্ধ ও আফ্রিকান সংস্কৃতিধারী দক্ষিণ সুদানি জনগণ সর্বদা শোষক আর অত্যাচারী হিসেবেই দেখেছে। ব্রিটিশদের মধ্যস্থতায় Cairo Agreement 1953 স্বাক্ষরের মাধ্যমে ১৯৫৬ সালে স্বাধীন সুদান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলেও সেখানে দক্ষিণ সুদানের আক্ষরিক অর্থে কোন প্রতিনিধিত্বই ছিল না। মিশরিয়-সুদানি শাসক ও ব্রিটিশদের উদ্দেশ্য ছিল একীভূত সুদান আর দক্ষিণ হতে উত্তরে তেল ও খনিজ সম্পদের পাচার।

ঙ। উত্তর সুদানে সম্পদের পুঞ্জীভূত পাহাড়ের সাথে সাথে অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা, আবাসন, শহুরীকরণ আর পাশ্চাত্যের ছোঁয়ায় আলোকিত হলো উত্তরের খার্তুম, কর্দোফান আর দারফুর। কিন্তু সম্পদের আঁধার দক্ষিণ সুদান আর তার বিশাল জনগোষ্ঠী অন্ধকার বনে প্রকৃতির করুণার পাত্র হয়ে রইল। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা আর নিরাপত্তার মতো মৌলিক চাহিদা হতে বঞ্চিত হতে থাকল ১৯৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত একীভূত সুদানের দক্ষিণ অঞ্চলের জনগণ।

চ। উত্তর সুদানি রাষ্ট্র পরিচালকগণ আরবীয় ও ইসলামিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে দক্ষিণ সুদানের উপজাতী গোত্রের উপর শরিয়া আইন প্রবর্তন করেন। শাসকগোষ্ঠী



শরিয়া আইনের মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য, সমতা, সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা পাবে বলে সবাইকে ধারণা দিয়ে পশুপূজারী বিধর্মীদের তৃতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে গণ্য করে আক্ষরিক অর্থে দক্ষিণ সুদানিদের রাষ্ট্রীয় সকল সুযোগ-সুবিধা হতে বঞ্চিত করতে থাকে। সংখ্যালঘু ডিংকা গোত্রের কিছু প্রভাবশালী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে প্রাদেশিক সরকারের অংশ হিসেবে যোগ দেয় এবং উত্তরের শাসকগোষ্ঠীর নির্দেশে নিজ দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ গোত্রের উপর দমন-পীড়ন চলমান রাখে।

ছ। উত্তর সুদানের শাসকগোষ্ঠীর ঘোষণা অনুযায়ী সুদানি জনগণকে শুধু আরব পরিচয়ে পরিচিত হবার নির্দেশনা দেয়া হয়। সেক্ষেত্রে সুদানি নাগরিকত্বের দাবিদার হওয়ার পূর্বশর্ত হিসেবে সমগ্র দক্ষিণ সুদানের নাগরিকদের চরম বৈষম্যের মুখোমুখি করে শুধু আরববংশীয় এবং সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী সর্বোচ্চ সংখ্যালঘু ডিংকা উপজাতিদের সুদানি নাগরিকত্বের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়।

জ। উত্তর সুদানের শাসকগোষ্ঠীর এরূপ বৈষম্যের বিষয়ে যে গোত্রই প্রতিবাদ করেছে তাদেরকে চরম নিপীড়ন আর সমূলে দমনের শিকার হতে হয়েছে। এই ‘সমূলে দমন’ আক্ষরিক অর্থেই সমূলে দমন করা যার আওতায় নারী, শিশু হতে শুরু করে গোত্রের সকলকে নৃশংস হত্যার শিকার হতে হয়। স্বাধীন সুদান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে উল্লেখযোগ্য Genocide হচ্ছে : ১৯৬৪ সালে কোডক ও মারিদি অঞ্চলের গণহত্যা, ১৯৬৫ সালের জুবা, ওয়াত্ত, তরিং, ওয়ারজুক, বোর, আকোবোতে ব্যাপক গণহত্যা, ১৯৮৭-৮৮ সালে ডেইন প্রদেশে শতাধিক মানুষকে গুলি করে হত্যা, ১৯৮৯-৯০ সালে দুই হাজারের অধিক সাধারণ মানুষকে জুবিবিলে হত্যা। সর্বোপরি ১৯৯১-২০০৫ জানুয়ারিতে গৃহযুদ্ধ

আনুষ্ঠানিক বন্ধের পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র দক্ষিণ সুদানে সরাসরি উত্তর সুদানি মিলিটারি কর্তৃক হত্যা, গুম, বিমান হামলায় অন্তত ত্রিশ লক্ষ মানুষ মারা যায়।

ঝ। সুদানের রাজধানী খার্তুম, কোর্দোফানসহ বড় বড় শহর ও আঞ্চলিক প্রদেশ হতে আরব ব্যতীত অন্যান্য গোত্রের আনুমানিক ৩.৩ মিলিয়ন উত্তর সুদানিকে বিতাড়িত করা হয় এবং অমানবিক জীবন সংগ্রামে বাধ্য করা হয়। এদের সকলকে খাদ্যের বিনিময়ে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হয়েছিল।

ঞ। রাজনৈতিক হত্যা, গুম ও কারাবাস সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রদেশসমূহে আশংকাজনক ভাবে বেড়ে গিয়ে যেন অতীতের দাসত্ব প্রথার পুনরাবির্ভাব হল যা স্পষ্টতরভাবে দুই সুদানের মধ্যে বিভেদের বিস্তৃতি আরও প্রসারিত করে স্বাধীনতাপ্রাপ্তিকে সময়ের প্রয়োজন হিসেবে বিবেচিত করে তোলে।



চিত্র-৩ : দক্ষিণ সুদানের নূয়ের গোত্রের যোদ্ধারা এবং বাংলার রাজপথে মুক্তিযোদ্ধাদের বিচরণ

দক্ষিণ সুদানের বৈষম্য ও নিষ্পেষণ এক কথায় মানবতাবিরোধী অপরাধ কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় আমরা আত্মবিস্মৃত হতে চলেছি স্বাধীনতা পূর্ববর্তী দমন-পীড়নের বাংলাদেশের ইতিহাস। বৃটিশদের পরিকল্পনায় ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের পর সাময়িক স্বস্তি এল যে ধর্মের ভিত্তিতে দেশের ভৌগোলিক সীমা নির্ধারিত হয়েছে। কিন্তু সময়ের আবর্তে স্পষ্টতর হয় দক্ষিণ সুদানের উপজাতি গোত্রের ন্যায় বাঙালি মুসলমানদের পশ্চিম পাকিস্তানিরা কখনই মুসলিম ভাই হিসেবে গণ্য করেনি। পশ্চিম-পাকিস্তানে পূর্ব-পাকিস্তান হতে সম্পদ আরোহণের উদ্দেশ্য স্পষ্টতর হল যখন তারা ৬ দফা দাবি আর জাতীয় নির্বাচনে প্রার্থী দিতে





বিভিন্ন অজুহাত সৃষ্টি করল। দক্ষিণ সুদানের সম্পদ শুষে নিয়ে উত্তর সুদানে যেভাবে সম্পদের পাহাড় তৈরি হয়েছিল তার সঠিক পরিসংখ্যান এখন না পাওয়া গেলেও পূর্ব-পাকিস্তানিদের উপর পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক অর্থনৈতিক শোষণের চিত্র নিচের এই তথ্যবহুল ছকে আরও স্পষ্ট হবে :

বিষয়	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ)
সরকার কর্তৃক বার্ষিক প্রবৃদ্ধি নির্ধারণ	৮.২%	৪.১%
সরকারী রপ্তানি আয়	৩০%	৭০%
সরকারী রাজস্ব উন্নয়ন ব্যয়	৫০০০ কোটি	১৫০০ কোটি
শিল্প, শিক্ষা ও কৃষিখাতে ব্যয়	৭৩%	২৭%
বৃহৎ প্রকিয়াজাত করণ, শিল্প ও মিল কারখানা	৮২%	১৮%
বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন ব্যয়	৭৮%	২২%

সূত্র : ফ্রম ইস্ট বেঙ্গল টু বাংলাদেশ - ডাইনামিক্স এন্ড পারস্পেকটিভ- শেখ মকসুদ আলী পৃ: ৭৩

### কষ্টার্জিত স্বাধীনতা এবং অনাগত ভবিষ্যৎ

উত্তর সুদানের শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক দক্ষিণ সুদানের মানুষদের তীব্র বৈষম্য ও অবমাননার ফলে সঙ্গবদ্ধ আক্রোশ বিভিন্ন অত্যাচারিত গোত্রের মাঝে দানা বাঁধতে শুরু করে। উত্তর সুদানের সামরিক বাহিনী ছাড়াও শাসকগোষ্ঠীর আশীর্বাদপুষ্ট সহযোগী সংখ্যালঘু ডিংকা গোত্রও দক্ষিণ সুদানের সাধারণ গোত্রসমূহের রোষানলে পড়ে। দক্ষিণ সুদানের প্রশাসনিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করা, বিচার প্রক্রিয়ায় অস্বচ্ছতা, দমন-পীড়ন আর বাধ্যতামূলকভাবে আরব সংস্কৃতি রূপান্তরের প্রতিবাদে ফুঁসে ওঠে দক্ষিণ সুদান। বিভিন্ন অত্যাচারিত গোত্রের জনপদ একত্রিত হয়ে গড়ে তোলে Anayanya Guerilla বা সর্পবিষধারী গেরিলা দল যারা সশস্ত্র উত্তর সুদানি সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে বনাঞ্চলে তীব্র প্রতিবাদ গড়তে সক্ষম হয়। ১৭ বছর স্থায়ী এই গৃহযুদ্ধ শেষ হয় ১৯৭২ সালে যেখানে সকল গোত্রের গণজাগরণসহ বিভিন্ন প্রতিরোধযুদ্ধে পর্যুদস্ত উত্তর

সুদানের সরকার দক্ষিণ সুদানে ১৯৭২ সালে আদিস-আবাবা চুক্তির মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসন প্রদানে বাধ্য হয়।

১৭ বছরের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হলেও ১৯৮৩ সালে স্বায়ত্তশাসক জাফর নিমিরি সম্পূর্ণ দক্ষিণ সুদানকে আপার নাইল, বার এল গাজাল ও ইকুটেরিয়া এই তিন অংশে বিভক্ত করে পুনরায় শরিয়া আইন জারি করেন। এই সিদ্ধান্ত দক্ষিণ সুদানে আরেকটি গৃহযুদ্ধ উসকে দেওয়ার পূর্বশর্ত মাত্র। এই সিদ্ধান্ত সুদানকে ত্রিবিভক্তই নয় বরং দক্ষিণ সুদানের তিন অঞ্চলের মাঝেও বৈষম্য সৃষ্টি করে। সামগ্রিক শাসন ও উন্নয়ন কার্যক্রমকে আরও প্রশ্রয়িত করে তুলে। উত্তর সুদানের শাসকগোষ্ঠীর মদদপুষ্ট নিমিরি সরকার বৃটিশ তেল অনুসন্ধান কোম্পানি শেভরনকে তেলসমৃদ্ধ দক্ষিণ সুদানের উত্তর অঞ্চলে অনুসন্ধানের কাজ ত্বরান্বিত করার কাজ দেয়। নিমিরি সরকার উত্তর ও দক্ষিণ সুদানের সীমানা পুনঃনির্ধারণের অংশ হিসেবে তেলসমৃদ্ধ বেনটিউ অঞ্চল ও আরেং, ইউরেনিয়ামসমৃদ্ধ আবেই প্রদেশকে উত্তরের সাথে সম্পৃক্ত করে। এর প্রতিবাদে মুখর হয় দক্ষিণ সুদানের সাধারণ জনতা আর জন্ম হয় Sudan's Peoples Liberation Movement (SPLM) যার সামরিক সদস্যরা পরিচিত হলেন SPLA-Sudanese Peoples Liberation Army নামে। এই দলের মূল লক্ষ্য হয় সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে এক নতুন সুদান প্রতিষ্ঠা করা যেখানে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল দক্ষিণ সুদানিদের প্রতি বৈষম্য দূর হবে। এই নতুন ধারার উদ্যোক্তা আর অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে দক্ষিণ সুদানিদের কাছে আবির্ভূত হন ড. জন গেরাং। জন গেরাং একীভূত সুদানে থেকেও সত্যিকার স্বায়ত্তশাসন কায়মের বিষয়ে গুরুত্ব দেন কিন্তু সমগ্র দক্ষিণ সুদানবাসী সম্পূর্ণ স্বাধীন হবার পক্ষে নিরন্তর সংগ্রামে লিপ্ত হয়। ইতোমধ্যে ১৯৮৯ সালে National Islamic Front (NIF) সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে দক্ষিণ সুদানের ক্ষমতা দখল করে। আরবীকরণের পদক্ষেপ হাতে নিলে NIF ও SPLM সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। অবশেষে ৯ জানুয়ারি ২০০৫ সালে কেনিয়াতে UN এর মধ্যস্থতায় Comprehensive Peace Agreement 2005 বা CPA চুক্তির মাধ্যমে গৃহযুদ্ধ সমাপ্ত হয়।



CPA এর সহায়তায় দুই পক্ষের যুদ্ধ সাময়িক বন্ধ হলেও ধর্ম ও রাষ্ট্রসীমার বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত না হওয়ায় জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় স্বাধীন সার্বভৌম সুদান রাষ্ট্রের বিষয়ে জনমত জরীপের সিদ্ধান্ত হয় সেই ব্রিটিশদের মধ্যস্থতায়। এর ৬ বছর পর অর্থাৎ ৯ জানুয়ারি ২০১১ সালে রায় কার্যকর হয়। পরে দক্ষিণ সুদানের জনগণ স্বাধীনতার প্রহর গুনতে লাগলো ৯ জুলাই ২০১১ থেকে।



চিত্র-৪ : দক্ষিণ সুদান সেনাবাহিনী এবং একই মঞ্চের দুই সুদানের প্রেসিডেন্ট

আফ্রিকার সাংস্কৃতিক স্বাভাবিক্যকে পিষে ফেলে আরবীয় রীতি গ্রহণে বাধ্য করা, সম্পদলুপ্তন আর অত্যাচার নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার সুদানবাসী Referendum 2011 তে দক্ষিণ সুদানের প্রতিষ্ঠার পক্ষে ৯৮.৮৩% রায় দেয় এবং পৃথিবীর ইতিহাসে ১৯৬ তম রাষ্ট্র হিসেবে জন্ম নেয় দক্ষিণ সুদান। ২০১১ সালে দক্ষিণ সুদানের গণভোটে সালভা ডি কইর মায়ারভিট প্রেসিডেন্ট হিসেবে অভিষিক্ত হন। দ্রুততম সময়ে আফ্রিকান ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার সহযোগী দেশের তালিকায় নাম সংযুক্ত করল দক্ষিণ সুদান। অতঃপর জুলাই ২০১৩ তে দক্ষিণ সুদান জেনেভার কনভেনশনে স্বাক্ষর করে।

উপর্যুপরি শোষণ আর অবমাননার ইতিহাসের সাক্ষী আমাদের এই বাংলাদেশ। বাঙালির ঐতিহ্য আর ভাষার উপর প্রথম আঘাত হানে পশ্চিম পাকিস্তানি স্বৈরশাসক মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ। দক্ষিণ সুদানের ন্যায় বাংলার শত বছরের ঐতিহ্যকে মুছে দিতে বাংলা ভাষাকে বদলে দিয়ে উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা করার অপচেষ্টা চালানো হয়। পশ্চিম-পাকিস্তানিরা পূর্ব-পাকিস্তানে সুদানের ন্যায় সম্পূর্ণ ইসলামিক রাষ্ট্র করার স্বপ্ন দেখেছিল আর দেশের সম্পদ লুপ্তনের নীলনকশা করেছিল। আর তা বাস্তবায়নের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উপর দমননীতি চালায় ১৯৫৭ পর্যন্ত ইয়াহিয়া খান, ১৯৬৬ পর্যন্ত আইয়ুব খান আর ১৯৭১ এর রক্তক্ষয়ী মুক্তিসংগ্রামের দিনগুলোতে জেনারেল টিক্কা খান। সকল দমন-পীড়ন আর শোষণ

ঠেলে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পৃথিবীর মানচিত্রে আবির্ভূত হয় রক্তস্নাত বাংলাদেশ নামের একটি লাল-সবুজের দেশ।



চিত্র-৫ : উত্তর সুদানের আরবিয় যাযাবর সংস্কৃতি ও দক্ষিণ সুদানের আফ্রিকান সংস্কৃতি

দক্ষিণ সুদানের সবই ঠিকভাবে চলছিল আর তার সাথে সমানভাবে চলছিল ক্ষমতা দখলের এক গুপ্ত লড়াই। ১৯ জুলাই ২০১১ তে দক্ষিণ সুদানের স্বাধীনতার পূর্বেই SPLM সংগঠনে সংখ্যালঘু ও উত্তর সুদানের শাসকদের কাছ থেকে সুবিধাভোগী ডিংকা গোত্রের আধিক্য ও তাদের নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলে অন্য ৬৩টি গোত্রের নেতারা। সংখ্যাগরিষ্ঠ গুলুক, নুয়ের, জাভি ও বারি গোত্রের জনগণ তাদের স্ব স্ব গোত্রের জনসংখ্যার উপর আনুপাতিক হারে সরকার ব্যবস্থা প্রতিনিধিত্ব দাবী করেন। স্বাধীনতার পূর্বে ও ঠিক পরেই এই বৈষম্যের কারণে ধীরে ধীরে SPLA ও বিভিন্ন গোত্রের মাঝে শুরু হয় সংঘাত। সেই সংঘাতের মাধ্যমে পরবর্তীতে গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। মৃত আর পোড়া লাশ সৎকারসহ মানবিক বিপর্যয় রোধে সকল কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে জুবা আর মালাকালে অবস্থিত বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীর সদস্যরা। এই বিভৎস হত্যায়জ্ঞের অভিজ্ঞতা ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়। গোত্রের সংঘাতের নিয়মানুযায়ী কোনো গোত্র অপর কোনো গোত্রকে আক্রমণ করলে কোনো এক গোত্র নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্যন্ত হত্যায়জ্ঞ চলতেই থাকবে যেখানে বাদ যায় না তিন মাস বয়সী শিশু হতে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা। মৃত্যুর পর পরাজিত যোদ্ধাদের লাশ নিয়ে যেতে দেয় না জয়ী যোদ্ধারা। তাদের দস্ত লাশ পরাজিতদের প্রকৃতি গ্রাস করে নেবে। সেক্ষেত্রে লাশ বহুদিন পর্যন্ত পঁচে নিশ্চিহ্ন হবার আগ পর্যন্ত মাটিতে পড়ে থাকে। UNHCR এর প্রতিনিধিরা সেই বিভৎস যুদ্ধের পরে বিশেষ পাউডার ছিটিয়ে লাশের পঁচন ত্বরান্বিত করে আর সেই কাজে এবং আহতদের সেবা করে বাংলাদেশের সুনাম উর্ধ্বে তুলে ধরেছিল বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর গর্বিত সদস্যরা।





### পরিশেষে কিছু প্রশ্ন

সুদান ও সেদেশের মানুষের জন্য নিবেদিত প্রাণ হয়ে কাজ করে যাওয়া বাংলাদেশী সদস্যদের প্রতি BANFRU পাইলট পিটার-টু থেকে শুরু করে সকল দক্ষিণ সুদানিদের একটি শ্রদ্ধা ও সমীহ কাজ করে। সুদানে নিয়োজিত বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা সুদানে জনকল্যাণমূলক কাজেই নিয়োজিত আছে। মানুষের কাছাকাছি গিয়ে মানবিক দিক বিবেচনায় এনে যে কোনো সমস্যার সর্বোত্তম সমাধান দিতে পারার কারণে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী সর্বত্র প্রশংসিত। BANFRU-6 এ সদস্য হিসেবে স্বল্প ও দীর্ঘ দূরত্বে সামরিক পরিদর্শক দলকে সাথে নিয়ে নীলনদ প্রতিনিয়ত পাড়ি দিতে হত। সমগ্র সুদান জুড়ে বিভিন্ন দেশের সামরিক বাহিনীর কার্যক্রম সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ আমার হয়েছিল। প্রায় সব দেশেরই সশস্ত্র বাহিনী কোনো না কোনো ভবিষ্যত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সুদানে কাজ করে যাচ্ছে। ফলে জনকল্যাণ বা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরাসরি সকল দেশের সশস্ত্র বাহিনীর স্বতঃস্ফূর্ত কার্যক্রম সমভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় না। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী আর্থ-সামাজিক ও মানব উন্নয়নে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করছে নিঃস্বার্থভাবে এবং সাধারণ মানুষের আস্থা ও গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে ব্যাপকভাবে। তবে বাংলাদেশের বিষয়ে পাইলট পিটার-টু এর কোনো অভিযোগ নেই বরং তুষ্টি আছে। ব্যক্তিগতভাবে পিটার-টু কে নিয়ে আমি ব্রিজ নির্মাণ, জেটি মেরামত, স্বাস্থ্য সেবার জন্য কমিউনিটি হাসপাতাল, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, সেনেটারি টয়লেট ও বিস্কন্দ পানির জন্য ফিল্টার টিউবওয়েল জাতীয় বেশ কিছু Civil Military Co-operation (CIMIC) প্রজেক্ট সম্পন্ন করি। স্থানীয় জনগণের মনে লাল-সবুজের জন্য সম্মান বৃদ্ধি করেছি যার স্বাক্ষী ছিল পিটার-টু নিজেই। সুদানে প্রথম পা রাখার পর তার শুভাগমনী বার্তা আমার মনে ছিল বলেই বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর নিঃস্বার্থ কাজের প্রমাণ তাকে সরেজমিনে দেখিয়েছিলাম। হয়তো এজন্যই সুদানে নিয়োজিত বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের বিষয়ে পিটার-টু সন্তুষ্ট ছিল।

কাজের স্বার্থে পিটার এর সাথে নানা বিষয়ে আলোচনা হতো আর সামগ্রিক আলোচনার শেষে কিছু প্রশ্ন আমাকে ভাবিয়ে তুলত। সত্যিকারভাবে সেসব

প্রশ্নের উত্তর হয়তো আরও গভীরে লুকিয়ে আছে বা সঠিক উত্তর পেতে হলে Birds Eye View প্রয়োজন হবে। পিটার আমাকে প্রশ্ন করেছিল সভ্যতা আর মনুষ্যত্ব নিয়ে - কারা সভ্য? অসুস্থ, পীড়িত মা-বাবাকে যারা ওল্ডহোমে বা একা হাসপাতালে ছেড়ে যায় তারা নাকি গোত্রের একজন সদস্য অসুস্থ হলেও সারারাত তোমাদের BANFRU-এর গেটের বাইরে মাটিতে বসে রাত কাটিয়ে দেয় কিছু মানুষ? কারা সভ্য- যারা শাসক নাকি যারা শোষিত? কারা সভ্য- আলো ঝলমলে নাইট ক্লাবে দামী গাড়ি আর হোটেল-ক্যাসিনোতে সন্ত্রাস হারানো মানুষ, নাকি বিস্তীর্ণ প্রান্তরে চাঁদের আলোয় নিম্ন গাছের নিচে রাত কাটানো জনপদ? সভ্যতা কী শ্রদ্ধাবোধে নাকি শ্রদ্ধাহীনতায়? পিটারের পরবর্তী প্রশ্ন - পৃথিবীর প্রায় সকল শান্তিরক্ষা মিশন আফ্রিকাতেই কেন? আমরা কী পৃথিবীর সকল দেশের জন্য বিশেষ অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ালাম যে শান্তিরক্ষার জন্য তোমাদের প্রয়োজন- নাকি অন্য কিছু? আমাদের মাঝে সংখ্যালঘু আর হিংস্র একটি গোত্রের হাতে শাসনভার তুলে দিল কারা? শান্তিরক্ষা কি একেই বলে নাকি শান্তিরক্ষার পরিস্থিতি সৃষ্টির প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে? শান্তিরক্ষার বিনিময়ে কী চলছে- সম্পদের তথাকথিত সুষমবন্টন? সম্পদ আহরণের চুক্তির আনুপাতিক হার মনোপুত না হলেই নতুন অশান্তি, হানাহানি- সেই হানাহানি আর অস্থিতিশীলতা বন্ধ করতে চাই নতুন চুক্তি বা জাতীয় স্বার্থের সাথে আপোষ- তাই নয় কী? প্রথমদিনই আমি তোমাকে বলেছিলাম- এই সম্পদের কারণে আমরা পরাধীন আর তোমাদের আগমন আমার দেশে। তুমি কী বিশ্বাস কর ৯ জুলাই ২০১১ তে আমরা সত্যি স্বাধীনতা পেয়েছি নাকি 'Compromise' পেয়েছি। সত্যি কী তোমরা বিশ্বাস কর আমাদের দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে?



চিত্র-৬ : দক্ষিণ সুদানে আত্মমানবতার সেবায় ও শান্তিরক্ষায় বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী



পিটার-টুর প্রশ্নগুলো আমাকে ভাবিয়ে তুলল তবে একইসাথে স্মিত হেসে নিজের বাম বাহুতে লাল সবুজের পতাকা দেখিয়ে বললাম তোমার ওসব প্রশ্ন তোমাদের জননেতা আর বিশ্বনেতাদের টেবিলে আলোচিত হওয়া উচিত, আমাদের মাঝে নয়। আমরা এই লাল-সবুজ পতাকাবাহী মানুষগুলো সত্যিকারভাবে সুদানের অসহায় মানুষের কল্যাণে নিবেদিত। আমাদের মধ্যে কোনো বিশেষ চুক্তি বা আপোষনামা নেই। তোমাদের ভাগ্য তোমাদেরই

গড়তে হবে, তবে নিঃস্বার্থ সহযোগিতায় আমরা তোমাদের পাশে আছি। তোমাদের ভাগ্য গড়তে হলে তোমাদের প্রত্যেককে এবং সমাজকেও শিক্ষিত হতে হবে। আর সেজন্য সকল জনকল্যাণমূলক কাজের পাশাপাশি দরকার শিক্ষার বিস্তার - চল আমাদের নতুন প্রজেক্ট BANFRU BANGLA SCHOOL এর কার্যক্রম শুরু করি। সাবলীলভাবে হেসে তীব্র রোদের মাঝেও আমার সাথে গুলুক গ্রামের উদ্দেশ্যে পা বাড়ায় পিটার-টু।

### তথ্যসূত্র

- ১। 'সাউথ সুদান হিন্দ্রি অব পলিটিক্যাল জেমিনেশন' - ড. রেইক মেকার।
- ২। দ্য টার্মোয়েল বিসাইড নাইল - লাম জোক ওয়েই।
- ৩। ফ্রম ইস্ট বেঙ্গল টু বাংলাদেশ - ডাইনামিস্ট্র এন্ড পারস্পেকটিভ - শেখ মকসুদ আলী।



লেঃ কমান্ডার মেহেদী আমীন মিয়া, (জি), পিএসসি, বিএন ১৯৯৯ সালের ১ জানুয়ারি বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে কমিশন লাভ করেন। তিনি রয়্যাল মালয়েশিয়ান নেভাল একাডেমিতে তার বেসিক কোর্স সম্পন্ন করেন এবং বানৌজা ইঁসা খানে ওয়ারফেয়ার কোর্স, মিসাইল কোর্স ও গানারি স্পেশলাইজেশন কোর্স সম্পন্ন করেন। তিনি মিরপুর স্টাফ কলেজের একজন গ্র্যাজুয়েট এবং ২০১০-২০১১ সালে সুদানে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ফোর্স রিভারাইন ইউনিট-৬ এর শেষ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে তিনি বানৌজা আলী হায়দার, বানৌজা মধুমতি, বানৌজা ওসমান, বানৌজা নির্ভয়, মিসাইল বোট স্কোয়াড্রন ও ৪১তম পিসিএস এ চাকুরি করেন। তিনি খুলনা নৌ অঞ্চলে বানৌজা শহীদ দৌলতের অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি সশস্ত্র বাহিনী বিভাগে গ্রেড-১ স্টাফ অফিসার হিসেবে পরিচালন ও পরিকল্পনা পরিদপ্তরে কর্মরত আছেন।





## মানবতার সেবায় ও নিরাপত্তায় বাংলাদেশ বিমান বাহিনী

স্কোয়াড্রন লীডার সালাহউদ্দিন আহমেদ, জিডি(পি)

মানব সভ্যতার শান্তি, প্রগতি ও যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাসে সাম্প্রতিক সংযোজন হল আকাশযান। গত শতাব্দির শুরুতে রাইট ভ্রাতৃদ্বয় সফলতার সাথে উড্ডয়ন করলেও, মাধ্যম হিসেবে আকাশপথ ব্যবহৃত হয়ে আসছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকেই। আর আজকের বিশ্ব উন্নয়নে ন্যূনতম সমৃদ্ধি বজায় রাখতেও আকাশ যোগাযোগ ব্যবস্থা একটি অপরিহার্য মাধ্যম। বৃটিশ সাম্রাজ্যের অংশ হওয়ায় ১৯১৮ সাল থেকে ভারতীয় উপমহাদেশের আকাশে বিমান চলাচল শুরু হয়। কার্যত বাংলার আকাশে বিমান চলাচল শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অনেক পূর্ব থেকেই। আজও অনেক অব্যবহৃত ও পরিত্যক্ত রানওয়ে এয়ার স্ট্রিপ ছড়িয়ে আছে সারা দেশে (নরসিংদীর আড়াইহাজার, কক্সবাজারের চিরিঙ্গা, নোয়াখালীর সুধারাম, কুমিল্লা, পটুয়াখালী ইত্যাদি)। অর্থাৎ ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও কৌশলগত দিক থেকে বাংলাদেশ একটি বিমান উড্ডয়নপ্রবণ দেশ। বৃটিশ রাজকীয় বিমান বাহিনী কর্তৃক জাপানি অগ্রাভিযানের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিখ্যাত 'বার্মা ক্যাম্পেইন' সমূহ এ অঞ্চল থেকেই পরিচালিত হয়। যার ফলে ঢাকার তেজগাঁও, কুর্মিটোলা, চট্টগ্রামের পতেংগা, হাটহাজারী, কক্সবাজার, চিরিঙ্গা, সিলেট, লালমনিরহাট, শমশের নগর, সাপুটিকর, ফেণী, কুমিল্লা, সিংগারবিল, যশোর, রহমতপুর, ঈশ্বরদী, ঠাকুরগাঁ এবং আরো বহুস্থানে অসংখ্য এয়ার স্ট্রিপস ও বিমানঘাঁটিসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়।



চিত্র-১ : ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বিমান

## সূচনায় বাংলাদেশ বিমান বাহিনী

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধকালে নাগাল্যাণ্ডের ডিমাপুরে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর জন্ম। একটি DC-3 ড্যাকোটা, একটি অটার ও একটি এ্যালুয়েট-III হেলিকপ্টার নিয়ে গঠিত বিমান বাহিনী অত্যন্ত সীমিত সুযোগ ও দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু করে। মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের যুদ্ধকালীন সফরের জন্য DC-3 ড্যাকোটা পরিবহন বিমান উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। দেশ মায়ের মুক্তির নেশায় মুক্ত বিহঙ্গের দামাল ছেলেরা অটার ও এ্যালুয়েট-III হেলিকপ্টারের মাধ্যমে শত্রুদের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহ যেমন- চট্টগ্রামের ইস্টার্ন রিফাইনারি, নারায়ণগঞ্জের গোদনাইল ফুয়েল ডাম্প ইত্যাদি স্থাপনায় অত্যন্ত দক্ষতার সাথে আক্রমণ পরিচালনা করে শত্রুর মনোবল দুর্বল করে দেয়। স্বাধীনতার পর প্রায় শূন্য থেকে নিজস্ব বাহিনী গঠনের সাথে সাথে দেশের সেবায় নিয়োজিত বাংলার বিমানসেনারা। আজকের এই উন্নত প্রযুক্তির বাংলাদেশ বিমান বাহিনী তাই একটি পেশাদার বাহিনী হিসেবে সারা বিশ্বে সুপরিচিত। মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আকাশ-প্রতিরক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। এ ক্ষমতা অর্জনে বিমান বাহিনীর প্রতিটি সদস্য বদ্ধপরিকর।

১৯৭১ সালের গৌরবোজ্জ্বল সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত আমাদের এই স্বাধীন ও সার্বভৌম মাতৃভূমি। সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ সালে জন্ম হয় স্বাধীন বাংলাদেশের বিমান বাহিনী। বিগত চল্লিশ বছরে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রতিটি সদস্য বাংলা মায়ের আকাশ-প্রতিরক্ষা ও আকাশ পথের পরিচালন ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে আসছে। দেশের বিভিন্ন দুর্যোগ ও প্রয়োজনে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর বিমান/হেলিকপ্টার অতি দ্রুত পৌঁছে যায় কর্তব্যের হাত বাড়িয়ে। দেশ ও জনগণের সেবায় নিয়োজিত বাংলাদেশ বিমান বাহিনী আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে।



## আর্তমানবতার সেবা

বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর যাবতীয় বিমান ও হেলিকপ্টার বিভিন্ন প্রয়োজনে সমগ্র দেশব্যাপী বিচরণ করে আসছে। এমনকি পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম এলাকায় প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী সরবরাহ ও নিরাপত্তা টহলসহ বিভিন্ন উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনায় বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টারসমূহ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। দেশের যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরবর্তী ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী পরিবহন বিমান ও হেলিকপ্টারের সাহায্যে দ্রুততম সময়ে দুর্গতদের উদ্ধার ও ত্রাণ বিতরণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে। সম্প্রতি এই ত্রাণ বিতরণ কাজকে আরো সহজ ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী নিজস্ব প্রযুক্তি ব্যবহার করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন Comprehensive Disaster Management Programme (CDMP) এর আর্থিক সহযোগিতায় ২০০০ কার্গো ড্রপিং প্যারাসুট তৈরি করেছে, যা দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে অসহায় মানুষের মধ্যে জীবন রক্ষাকারী ঔষধ, খাদ্য ও অন্যান্য ত্রাণসামগ্রী সরবরাহের কাজে ব্যবহার করা হবে। গত মে ২০১৩ এর বাংলাদেশের উপকূল এলাকায় বয়ে যাওয়া সাইক্লোন মহাসেন মোকাবিলায় বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর পক্ষ থেকে নেয়া হয় কার্যকর পদক্ষেপ। বিশেষ করে উপকূলবর্তী এলাকায় অবস্থিত বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ঘাঁটিসমূহে কর্মরত সদস্যদের নিরাপত্তা বিধান ছাড়াও ঘাঁটিতে বিদ্যমান সাইক্লোন শেল্টার ব্যবহারের মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী স্থানীয় জনসাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। তাছাড়াও সম্ভাব্য দুর্যোগ মোকাবিলায় বিমান বাহিনী সদর দপ্তরে চালু করা হয় সমন্বয় সেল। দেশের যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে সর্বাত্মক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টার ও পরিবহন বিমানসমূহ আর্তমানবতার সেবায় এগিয়ে আসছে যখন যেখানে প্রয়োজন। ১৯৯১ সালের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়, ২০০৭ সালের সিডর, আইলা প্রভৃতি দুর্যোগ এবং বিভিন্ন সময়ে বন্যাপীড়িত এলাকায় বিমান বাহিনীর বিমানসমূহের উদ্ধার ও পরিবহন কার্যক্রম প্রণিধানযোগ্য। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে বন্ধুপ্রতিম দেশসমূহে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে বিমান

বাহিনীর পরিবহন বিমান ও হেলিকপ্টারসমূহ। সম্প্রতি এশিয়ার ভয়াবহ ‘সুনামি’ ও মায়ানমারের ঘূর্ণিঝড় ‘নার্গিস’ এ বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর পরিবহন বিমান সি-১৩০, এন-৩২ এবং বেল-২১২ হেলিকপ্টারসমূহ জাপান, মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপে বিভিন্ন ত্রাণসামগ্রী প্রদানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। ভারতের গুজরাটের ভয়াবহ ভূমিকম্প পরবর্তী ত্রাণ কার্যক্রমে এন-৩২ পরিবহন বিমানের অংশগ্রহণ অনস্বীকার্য। এছাড়া ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ তারিখে ঢাকার ব্যস্ততম কাওরান বাজার বাণিজ্যিক এলাকায় অবস্থিত বিএসইসি ভবনে সংঘটিত হয় সুরণকালের এক ভয়াবহতম অগ্নিকাণ্ড। এ সময়ে ভবনের অভ্যন্তরে আটকেপড়া অসহায় মানুষদের উদ্ধার কাজে এগিয়ে যায় বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টারসমূহ। অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ও সম্পূর্ণ নতুন ধরনের এই অভিযান বাংলাদেশ বিমান বাহিনী সফলতার সাথে পরিচালনা করে।



চিত্র-২ : দুর্যোগ মোকাবিলায় বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টার

## বহির্বিশ্বে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী

১৯৯৩ সালের জানুয়ারি থেকে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সদস্যরা ইউরোপের যুদ্ধবিধ্বস্ত বসনিয়া হার্জেগোভিনায় জাতিসংঘ বাহিনীর শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হন। পরবর্তীতে কুয়েত, হাইতি, পূর্বতিমুর লাইবেরিয়া, মধ্য আফ্রিকা, ডি আর কঙ্গো, আইভরি কোস্ট ও সুদানসহ মোট ১৮টি দেশের শান্তিরক্ষা মিশনে উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখে আসছে। জাতিসংঘের মাধ্যমে পর্যবেক্ষক হিসেবে শান্তিরক্ষা মিশনে অংশ নিলেও আকাশ যোগাযোগে সক্ষম হেলিকপ্টারসহ কন্টিনজেন্ট বহির্বিশ্বে প্রথম মোতায়েন





হয় কয়েতে ১৯৯৫ সালে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৩ সালে আফ্রিকার কঙ্গোতে এমআই-১৭, ২০০৪ সালে পূর্ব তিমুরে বেল-২১২, ২০০৯ সালে চাঁদ ও আইভরিকোস্টে বেল-২১২ হেলিকপ্টার যোগ দেয়। ২০০৯ সাল বিমান বাহিনীর আরেকটি উল্লেখযোগ্য সক্ষমতার বছর। এ বছর স্ট্রাটেজিক (Strategic) C-130B পরিবহন বিমান আফ্রিকার কঙ্গোতে মোতায়েন করা হয়। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ঐ সকল এয়ার কন্টিনজেন্ট সংঘাতপূর্ণ দেশসমূহে মোতায়েনকৃত দেশী-বিদেশী বাহিনীর কার্যক্রমে ও সক্ষমতা অর্জনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। দুর্গম ও বিপদসংকুল এলাকায় বিভিন্ন রকম সামরিক অভিযান, জরুরি উদ্ধার কার্যক্রম ও বিভিন্ন রকম জনবল এবং পণ্য সরবরাহে অত্যন্ত সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছে।



চিত্র-৩ : উদ্ধার অভিযানে এম আই-১৭ হেলিকপ্টার

### সমুদ্রসীমার নিরাপত্তা

আমাদের সুবিশাল সমুদ্রসীমা বস্তুত অপার সম্পদ ও সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। সমুদ্র সম্পদের সঠিক ব্যবহার ও সমুদ্রযানের নিরাপদ চলাচল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে সমুদ্রসীমা নির্ধারণের পর এর সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা আমাদের জাতীয় কর্তব্য। বিদ্যমান নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার কিয়দংশই পূরণ করতে পারে। কাজেই স্বাধীন সার্বভৌম দেশের সমুদ্রসীমার নিরাপত্তায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে সক্ষমতার পাশাপাশি বিমান বাহিনীতেও প্রয়োজনীয় বিমান/সরঞ্জাম অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। নৌযানসমূহ স্বভাবতই মেরিটাইম (Maritime)

বিমানের চেয়ে ধীর গতির হয়ে থাকে। গভীর সমুদ্রে দেশীয় সম্পদের চোরাচালান, ভিনদেশী কর্তৃক অননুমোদিত মৎস্যসম্পদ আহরণ, বাণিজ্যিক জাহাজের সার্বিক নিরাপত্তা ইত্যাদি পর্যবেক্ষণের জন্য Maritime Patrol Aircraft (MPA) ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীতে যুক্ত হয়েছে। ভবিষ্যতে গভীর সমুদ্রবন্দর কার্যক্রম, সামুদ্রিক খনিজ সম্পদ আহরণ ও অন্যান্য বাণিজ্যিক কার্যক্রমে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। 'Friendship to all, Malice to none' আমাদের মূলনীতি হলেও অন্য কোনো দেশ বা গোষ্ঠীর অযাচিত হস্তক্ষেপ থেকে দেশের সামুদ্রিক সম্পদ রক্ষায় বিমান বাহিনীতে মেরিটাইম যুদ্ধবিমান, পরিবহন ও হেলিকপ্টার অন্তর্ভুক্তি এখন সময়ের দাবি।



চিত্র-৪ : Maritime Patrol Aircraft (MPA)

### দেশ রক্ষায় সদা প্রস্তুত

শান্তিকালের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও আকস্মিক দুর্ঘটনায় মানবতার সেবায় নিয়োজিত বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রতিটি সদস্য নিবেদিত প্রাণ। সামরিক বাহিনীর সদস্য হিসেবে কঠোর সামরিক রীতিনীতি, নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা দীক্ষার সাথে সাথে পেশাগত উৎকর্ষ লাভের জন্য কঠোর প্রশিক্ষণ বিমান বাহিনীর একটি চলমান প্রক্রিয়া। মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে বিমান বাহিনীর বৈমানিকগণ বিভিন্ন কলা-কৌশল রপ্ত করে প্রতিনিয়ত সে অনুযায়ী অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছেন। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর যুদ্ধ-বিমানসমূহ দেশ মাতৃকার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী। আরব-ইসরাইল ও পাক-ভারত যুদ্ধের অন্যতম সফল যোদ্ধা,



বৈমানিক গ্রুপ ক্যাপ্টেন সাইফুল আজম, গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধে বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান, স্কোয়াড্রন লীডার সুলতান মাহমুদ প্রমুখের আকাশ যুদ্ধ এবং উইং কমান্ডার (পরবর্তীতে গ্রুপ ক্যাপ্টেন) খাদেমুল বাশার, উইং কমান্ডার হামিদুল্লাহ খান ও স্কোয়াড্রন লীডার সদরুদ্দিন প্রমুখ সেক্টর কমান্ডারবৃন্দ যাদের স্থল যুদ্ধের বীরত্ব প্রতিটি বিমানসেনার পাথেয়। বিমান বাহিনীর সদস্যরা প্রকৃতপক্ষে আধুনিক প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের যুগে আকাশযুদ্ধে পারদর্শিতার সাথে সাথে স্থল যুদ্ধের কলা-কৌশলও রপ্ত করে থাকে। এসমস্ত যুদ্ধ কলা-কৌশল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ যা রপ্ত করতে বাংলাদেশের দামাল ছেলেরা সর্বদা সচেষ্ট।



চিত্র-৬ : ভবিষ্যৎ যুদ্ধবিমান



চিত্র-৫ : মিগ-২৯ যুদ্ধবিমান

### বিমান বাহিনীর আধুনিকায়ন

সবচেয়ে আধুনিক ও কার্যকর মাধ্যম হিসেবে বিমান পরিচালন ও অভিযান মানব সভ্যতার প্রভূত কল্যাণ ও উন্নতি সাধন করে চলেছে। বাস্তব কারণেই ব্যয়বহুল এ মাধ্যম অর্থনৈতিকভাবেও অনেক উৎকর্ষ সাধনে সহায়ক। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থা ও অবস্থানগত গুরুত্ব বিবেচনা করে সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকায়ন এখন সময়ের দাবি। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অযাচিত হস্তক্ষেপ মোকাবিলায় বিমান বাহিনীর আধুনিকায়ন অপরিহার্য। দেশের সমুদ্রসীমা ও আকাশ নিরাপত্তা জোরদারে বিমান বাহিনীর সক্ষমতা অর্জনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের এখনই উপযুক্ত সময়। ‘বাংলার আকাশ রাখিব মুক্ত’- এই মন্ত্রে বিমান বাহিনীর প্রতিটি সদস্যও তাই প্রস্তুত সর্বোত্তমভাবে।

### মানব সম্পদ উন্নয়ন

মানব সম্পদ উন্নয়ন বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দেশ বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্য বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরী বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকে। চাকুরী পরবর্তী জীবনেও বিমান বাহিনীর দক্ষ বৈমানিক, প্রকৌশলী ও অন্যান্য পেশার সদস্যবৃন্দ দেশ বিদেশে অত্যন্ত সুনামের সাথে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রেখে আসছে। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রতিটি সদস্য দেশ মাতৃকার সেবায় দীক্ষিত হয়ে জল-স্থল-অন্তরীক্ষে বিচরণ করছে যখন-যেখানে যেভাবে প্রয়োজন।

### উপসংহার

আঞ্চলিক এবং ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র। অপার সম্ভাবনার এই দেশ নানাবিধ প্রাকৃতিক সম্পদের আঁধার। স্থলভাগের খনিজ সম্পদের পাশাপাশি সমুদ্রসীমার মধ্যেও রয়েছে অফুরন্ত সম্পদ। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা, অর্থনৈতিক ও দুর্গম সমুদ্রসীমার নিরাপত্তায় বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রয়োজনীয় লোকবল, সরঞ্জামের অন্তর্ভুক্তি ও ব্যবহার এবং বর্তমান সক্ষমতা আরো বৃদ্ধির মাধ্যমে নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে দেশ মাতৃকার ঋণ শোধই বিমান বাহিনীর প্রতিটি সদস্যের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।





### তথ্যসূত্র

- ১। সশস্ত্র বাহিনী দিবস জার্নাল- সংখ্যা ২০০৬, ২০০৮।
- ২। বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকের সাম্প্রতিক নিবন্ধসমূহ।



স্কোয়াড্রন লীডার সালাহউদ্দিন আহমেদ, জিডি(পি) ১৯৯৮ সালের ০৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে কমিশন লাভ করেন। তিনি পিটি-৬, টি-৩৭, এল-৩৯, এ-৫/এফটি-৬, এ-৫ সি এবং মিগ-২৯ বিমান উড্ডয়ন করেছেন। তিনি দেশ-বিদেশে বিভিন্ন পেশাগত কোর্স সম্পন্ন করেছেন। তিনি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনেও কর্তব্যরত ছিলেন। তিনি ১১নং ও ১৫নং স্কোয়াড্রনে ফ্লাইং ইন্সট্রাক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে তিনি ৮নং স্কোয়াড্রনে ইন্সট্রাক্টর পাইলট হিসেবে কর্মরত আছেন।



## আকাশ-প্রতিরক্ষা পদ্ধতি এবং জাতীয় নিরাপত্তায় এর গুরুত্ব

উইং কমান্ডার খন্দকার মনোয়ারুল হক, এডিডব্লিউসি, পিএসসি

### ভূমিকা

বর্তমান সময়ে আকাশ-শক্তির প্রযুক্তিগত উত্তরোত্তর আধুনিকায়নের ফলে স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর সকল সামরিক স্থাপনা, সেনা, নৌ ও বিমান ঘাঁটি, কমান্ড স্থাপনা ও বেসামরিক অতিগুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহ আকাশ-শক্তির প্রথম ও প্রধান লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। আকাশ-শক্তির বিভিন্ন উপাদান যেমন- অত্যাধুনিক বোমারু বিমান ও যুদ্ধ বিমান শত্রুপক্ষের সামরিক স্থাপনার জন্য অত্যন্ত হুমকিস্বরূপ। যে কোনো যুদ্ধে লিপ্ত হলে মূলত প্রথমে আকাশ-শক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে একটি দেশ অন্য দেশের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। যখন আকাশসীমার উপর সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হয় তখন শত্রুপক্ষের পদাতিক এবং নৌবাহিনীকে উপর থেকে উপর্যুপরি আক্রমণ করে পরাজিত করা সহজ হয়। এজন্য বিশিষ্ট মার্কিন যুদ্ধপ্রবক্তা জন ওয়ার্ডেন বলেছেন, “১৯৩৯ সালে পোলান্ডে জার্মানির আক্রমণের পর থেকে কোনো দেশ কোনো যুদ্ধে জয়লাভ করেনি শত্রু দেশ কর্তৃক আকাশে আধিপত্য অর্জনের পর, অপরপক্ষে কোনো দেশ যুদ্ধে হারেনি নিজেদের আকাশে আধিপত্য বজায় রেখে”। কারণ, বর্তমান যুগের অত্যাধুনিক বোমারু বিমানসমূহ পদাতিক ও গোলন্দাজ বাহিনীর ফায়ার পাওয়ারের রেঞ্জের বাইরে থেকে নিপুণভাবে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে পারে। বাংলাদেশ আকাশ-সীমার গভীরতা তুলনামূলকভাবে কম হওয়ায় এই হুমকি আরও বেশীমাত্রায় বহন করে। এ কারণে যে কোনো দেশের সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য একটি দক্ষ ও সমন্বয়পূর্ণ আকাশ-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা অপরিহার্য। এখন আলোচনা করা যাক, আকাশ-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মূলত কী এবং কিভাবে কার্যকর হয়?

### আকাশ-প্রতিরক্ষা

সার্বিকভাবে আকাশ-প্রতিরক্ষা হচ্ছে মাতৃভূমি, বিভিন্ন সামরিক ঘাঁটি এবং বেসামরিক প্রধান স্থাপনাসমূহকে আকাশপথে শত্রুবিমান ও মিসাইল আক্রমণ থেকে প্রতিহত করা এবং অন্য সব প্রত্যক্ষ ও

পরোক্ষ পরিচালন কার্যক্রম যা একে আকাশ-প্রতিরক্ষায় সাহায্য করে। এটা এভাবেও বলা যেতে পারে যে, সেসব ব্যবস্থা যা শত্রুর বিমান আক্রমণকে প্রতিহত করে অথবা শত্রুবিমান আক্রমণের কার্যকারিতা কমায়ে। এজন্য বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

- ক। স্থায়ী প্রতিরোধ ও আক্রমণাত্মক পরিচালন কাজের সামরিক সক্ষমতাকে ধরে রাখা।
- খ। শত্রুবিমান ও মিসাইলকে প্রতিরোধ করা যাতে সেগুলো জাতীয় পর্যায়ে ভয়াবহ ক্ষতিসাধন না করতে পারে।
- গ। জাতীয় সক্ষমতাকে বজায় রাখা যেন শত্রুপক্ষকে প্রতিরোধ করতে পারে।

### আকাশ-প্রতিরক্ষার প্রকারভেদ

মূলত দুই ধরনের আকাশ-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আছে যেমন :

- ক। প্রত্যক্ষ আকাশ-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।
- খ। পরোক্ষ আকাশ-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।

এগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো :

ক। প্রত্যক্ষ আকাশ-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা : একটি প্রত্যক্ষ আকাশ-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হচ্ছে শত্রুবিমানের আক্রমণকে প্রতিহত করা। এটি শত্রুবিমানের জন্য পাল্টা হুমকি বা Deterrence সৃষ্টি করে যা নিম্নরূপ :

- (১) একটি নির্ণয়করণ ব্যবস্থা যা শত্রু বিমানকে অনুসরণ করে এবং একে ধ্বংসের জন্য অস্ত্রসমূহকে নির্দেশনা দেয়।
- (২) একটি কমান্ড, নিয়ন্ত্রণ, যোগাযোগ ও গোয়েন্দা ব্যবস্থা যা অস্ত্র ও নির্ণয়করণ ব্যবস্থাকে সংযুক্ত করে।
- (৩) একটি সমরাস্ত্রের ব্যবস্থা যা শত্রুবিমানকে ধ্বংস করতে পারে।





খ। পরোক্ষ আকাশ-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা : একটি উন্নত প্রত্যক্ষ আকাশ-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থাকলেও কিছু শত্রুবিমান লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছতে পারবে। পরোক্ষ আকাশ-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এমন একটি পদ্ধতি যা শত্রুবিমানের আক্রমণের ক্ষয়ক্ষতিকে কমাতে পারে। সাধারণত পরোক্ষ আকাশ-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিমান আক্রমণের আগে থেকেই গড়ে তোলা হয়। এর প্রধান উপাদানগুলো হল :

- (১) বিমান ও বিমানঘাঁটিসমূহ ক্যামোফ্লাজ করণ।
- (২) বিমানসমূহকে অন্যত্র সরিয়ে রাখা।
- (৩) ব্ল্যাক আউট ও সতর্কীকরণ।
- (৪) ফায়ার ফাইটিং, মেডিক্যাল ও বেসামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।

### আকাশ-প্রতিরক্ষা নীতি

আকাশ-প্রতিরক্ষা নীতি অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত এবং কার্যকর। যে কোনো আকাশ-প্রতিরক্ষা পদ্ধতি এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। একটি কার্যকর আকাশ-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় আগত শত্রুবিমানকে নির্ণয় করতে এবং সেটাকে ধ্বংস করতে হবে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছানোর পূর্বে। সুতরাং, আকাশ-প্রতিরক্ষা পদ্ধতি নিম্নোক্ত নীতির উপর কাজ করে :

- ক। নির্ণয়করণ।
- খ। চিহ্নিতকরণ।
- গ। হুমকির বিশ্লেষণ।
- ঘ। অস্ত্রের নিযুক্তিকরণ।
- ঙ। নিযুক্তির মূল্যায়ন।

### শত্রুবিমান নির্ণয়করণ

শত্রুবিমান প্রকৃতপক্ষে নির্ণয়করণের সাথে সাথে শত্রুবিমানকে ধ্বংসের উদ্যোগ নেওয়া হয়। যদি কিনা যথেষ্ট আগে শত্রুবিমান নির্ণয় করা না হয়, আকাশ-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শত্রুবিমানকে সমরাস্ত্র নিক্ষেপের লাইনের আগে ধ্বংস করতে ব্যর্থ হতে পারে। সুতরাং এটা নিশ্চিত যে, নির্ণয়করণ যত আগে হবে পরিকল্পনা

প্রণয়ন এবং বলবৎ করার জন্য তত সময় বেশী পাওয়া যাবে। এটা শত্রুবিমানকে তার লক্ষ্যস্থল হতে অনেক দূরে ধ্বংস করবে। সামরিক বিমানের আধুনিক প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে বর্তমানকালের শত্রুবিমান খুব কম উচ্চতায় উড্ডয়ন করে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম এবং যে কোনো ধরনের র‍্যাডারকে ফাঁকি দিতে পারে। এজন্য খুব উঁচুতে ও খুব নিচুতে উড্ডয়নরত শত্রুবিমানের আক্রমণ থেকে লক্ষ্যবস্তুকে বাঁচানোর জন্য উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন এবং লো-লুকিং দুই ধরনের র‍্যাডারই প্রয়োজন। পর্যবেক্ষণ বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনমত মোবাইল অবজারভার ইউনিটও রাখা যেতে পারে। যেহেতু আকাশ-প্রতিরক্ষা র‍্যাডারসমূহ বাংলাদেশের আকাশসীমার সর্বত্র কড়া নজরদারি রাখে, যে কোনো উড়ন্ত বস্তু এই আকাশ-প্রতিরক্ষা র‍্যাডারের সীমার মধ্যে আসলে সেগুলো ধরা পড়ে এবং পরিচালন কক্ষের বোর্ডে দেখানো হয়। অজানা উড়ন্ত বস্তুর উচ্চতা, দিক ও গতিবিধি স্থির করে চিহ্নিত করণের জন্য অপেক্ষা করা হয়।

### চিহ্নিতকরণ

একটি উড়ন্ত বস্তু নির্ণয় করার পর তার পরিচয় নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ে এজন্য যে বাকি সব কার্যক্রম এরই উপর নির্ভর করে। আকাশ-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিভিন্ন পদ্ধতিতে অনেক মাধ্যমে উড়ন্ত বস্তুকে চিহ্নিত করে। এই পদ্ধতিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ইলেক্ট্রনিক ইন্টারোগেশন, ফ্লাইট প্ল্যানের তথ্য, বিমানের গতিবিধি ইত্যাদি। যদি কোনো বিমানের বাংলাদেশের আকাশসীমার ভিতর উড্ডয়নের অনুমতি থাকে তখন সেটাকে ‘বন্ধুভাবাপন্ন’ ঘোষণা করা হয়। আর যদি কোন বিমান পূর্ব অনুমতি ছাড়াই বাংলাদেশের আকাশসীমার ভেতর ঢুকে পড়ে তখন এটাকে ‘শত্রুভাবাপন্ন’ ঘোষণা করা হয়। এই শত্রুভাবাপন্ন বিমানের উপর তখন ‘হুমকির মূল্যায়ন’ নিশ্চিত করা হয়। যখন একটি বিমানকে ‘শত্রুভাবাপন্ন’ ধরা হয়, আকাশ-প্রতিরক্ষা কেন্দ্রে প্রাপ্ত সব তথ্য যাচাই করে দেখা হয় এটা দেশের জন্য কোন ধরনের হুমকি তৈরি করছে।



## হুমকির বিশ্লেষণ

যখন কোনো বিমানকে শত্রুভাবাপন্ন ঘোষণা করা হয় তখন নিম্নের তথ্যগুলো যাচাই করে দেশের প্রতি এর হুমকির ধরণ নির্ধারণ করা হয় :

- ক। উড়ন্ত বস্তু কি কোন শত্রুভূমি থেকে উড্ডয়ন করেছে?
- খ। বিমানটি কি কোন অননুমোদিত ইলেক্ট্রনিক কাউন্টার ব্যবস্থা ব্যবহার করেছে?
- গ। বিমানটি কি কোন নিষিদ্ধ এলাকায় প্রবেশ করেছে?
- ঘ। বিমানটি কি কোন উন্মুক্ত এলাকায় উড্ডয়ন করেছে?
- ঙ। এটা কি একটা মিত্র বিমান নয় যেটা Identification of Friend and Foe (IFF) পদ্ধতি অকার্যকর অবস্থায় শত্রুভূমি থেকে ফিরছে?
- চ। বিমানটি কি কোন সম্ভাব্য আক্রমণের স্থানের (ভালনারেবল পয়েন্টের) দিকে যাচ্ছে?
- ছ। বিমানটির সম্ভাব্য উচ্চতা এবং এর গতি কোন ধরনের?

## অস্ত্র নিযুক্তি

উপর্যুক্ত বিষয়গুলোর উপর ভিত্তি করে হুমকির মূল্যায়ন করা হয়। যখন হুমকির স্বরূপ নিশ্চিত হয় তখন আকাশ-প্রতিরক্ষা দ্বারা ধ্বংস করা হয়। প্রতিচ্ছেদন (Interception) যত দূর থেকে সম্ভব তত দূরে করতে হবে যেন যত বেশী সময় দেয়া সম্ভব হয়। হুমকির ধরণ ও প্রকৃতি অনুযায়ী আকাশ-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিভিন্ন ধরনের সমরাস্ত্র ব্যবহার করে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

- ক। যুদ্ধবিমান যা ইন্টারসেপ্টর নামে পরিচিত।
- খ। ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপণযোগ্য বিভিন্ন পাল্লার মিসাইল।
- গ। বিমান বিধ্বংসী গোলা।

## নিযুক্তির মূল্যায়ন

বিমান প্রতিরক্ষার শেষ অধ্যায় হচ্ছে নিযুক্তির মূল্যায়ন। যখন আকাশে কোনো বিমানকে শত্রুভাবাপন্ন

ঘোষণা করা হয়, যখন হুমকি বিশ্লেষণপূর্ণ হয়, তখন শত্রুবিমানকে ঘায়েল করার জন্য তার বিরুদ্ধে অস্ত্র নিযুক্ত করা হয়। আকাশ-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সর্বদা পর্যবেক্ষণ করবে যে শত্রুবিমান মোকাবিলায় এটি কতটা সফল হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে নিযুক্তির মূল্যায়ন হচ্ছে সর্বদা আকাশ-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় প্রাপ্ত তথ্যসমূহের সার্বক্ষণিক বিশ্লেষণ এবং তদানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ।

নিযুক্তির মূল্যায়ন বিশ্লেষণকে মোট ৪টি ভাগে ভাগ করা যায় :

- ক। উৎক্ষেপণ : যুদ্ধবিমানের ক্ষেত্রে উৎক্ষেপণ মানে উড্ডয়ন আর মিসাইল বা আর্টিলারি গানের ক্ষেত্রে ফায়ারিং।
- খ। নিয়ন্ত্রণ ও গতি : একটি যুদ্ধবিমান দ্বারা শত্রুবিমানকে ইন্টারসেপ্ট করার জন্য আকাশ-প্রতিরক্ষা র‍্যাডার সহায়তা করে। মিসাইলের ক্ষেত্রে তা নিক্ষেপের পর আকাশে সর্বক্ষণ নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। আবার তা স্বনিয়ন্ত্রিত হয়।
- গ। প্রতিচ্ছেদন : একটি সময়োপযোগী উৎক্ষেপণ সাফল্যপূর্ণ প্রতিচ্ছেদনে সহায়তা করে। শান্তিকালে শত্রুবিমানকে ধ্বংস করার পূর্বে দৃশ্যমান চিহ্নিতকরণ প্রয়োজন। আকাশ থেকে ভূমিতে নিক্ষেপণযোগ্য মিসাইলের ক্ষেত্রে তড়িৎ সমন্বয় করা হয়।
- ঘ। ধ্বংস : শত্রুবিমানের ধ্বংসের মাত্রা নির্ভর করবে আকাশ-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দক্ষতা, শত্রুর কৌশল, অস্ত্র এবং সর্বোপরি আবহাওয়ার উপর।

## আকাশ-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ

সঠিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ যে কোনো সংস্থার কার্যকারিতার জন্য একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সঠিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের মাধ্যমে যে কোনো সংস্থা তার কর্মপরিকল্পনা স্থির করে। সামরিক বাহিনী সম্প্রতি তার লক্ষ্যমাত্রা - ২০৩০ নির্ধারণ করেছে যা ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত জরুরি এবং পথ প্রদর্শক হিসেবে থাকবে। এই লক্ষ্যমাত্রা - ২০৩০ এ আকাশ-প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া





হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, বাংলাদেশের আকাশ-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে জাতিকে আরও বেশী সুরক্ষা ও নিরাপত্তা দেয়ার জন্য একটি যথাযথভাবে পরিকল্পনা প্রণয়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই লক্ষ্যমাত্রা - ২০৩০ এর আওতায় সেনা, নৌ এবং বিমান বাহিনী তার নিজস্ব আকাশ-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। লক্ষ্যমাত্রা - ২০৩০ বিভিন্ন পর্যায়ে বাস্তবায়িত হবে এবং পর্যায়ক্রমে নিম্নের সক্ষমতা অর্জনে সাহায্য করবে :

ক। সামরিক বাহিনীর চিহ্নিতকরণ সক্ষমতাকে সংযুক্তকরণ ও বৃদ্ধিকরণ এর মাধ্যমে পূর্ব সতর্কতা সক্ষমতা বাড়ানো।

খ। আকাশ-প্রতিরক্ষা র‍্যাডারে প্রাপ্ত তথ্যের সাহায্যে একটি সমন্বিত আকাশ চিত্র তৈরি করা এবং কমান্ড লিংক স্থাপন করা।

গ। যথাযথ সমন্বয়ের মাধ্যমে একটি বহুস্তর বিশিষ্ট আকাশ-প্রতিরক্ষা সমরাস্ত্র গড়ে তোলা।

ঘ। বাংলাদেশ সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীতে প্রয়োজনমূলক আকাশ-প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম গড়ে তোলা।

ঙ। বাংলাদেশ সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং তথ্য আদান প্রদানে গতিশীলতা আনয়ন করা।

চ। বাংলাদেশ সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মধ্যম পাল্লার ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপণযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র সংযোজন করে নিজস্ব আকাশ-প্রতিরক্ষা গড়ে তোলা।

ছ। কাছাকাছি অবস্থিত সামরিক স্থাপনার জন্য একটি সংযুক্ত আকাশ-প্রতিরক্ষা প্রণয়ন এবং দূরবর্তী পৃথক স্থাপনার জন্য পৃথক আকাশ-প্রতিরক্ষা প্রণয়ন এবং সর্বোপরি সমগ্র বাংলাদেশের জন্য একটি কার্যকর আকাশ-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন।

জ। সম্প্রতি বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা বিজয়ের ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠে যে বিশাল আকাশসীমা অর্জিত হয়েছে তার জন্য

যথোপযুক্ত আকাশ-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাপনা প্রণয়ন, এছাড়াও সমুদ্রসীমার আকাশের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনাকে আকাশ-প্রতিরক্ষা পরিচালন কেন্দ্রের সাথে সংযুক্তকরণ।

## আকাশ-প্রতিরক্ষার গুরুত্ব : আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রেক্ষিত

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের বিজয় অর্জনের পূর্বে মিত্রবাহিনী ও পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর মধ্যে পশ্চিম ও পূর্ব সেক্টরে পূর্ণমাত্রায় আকাশ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর আকাশ যুদ্ধে লিপ্ত হয় বাংলাদেশের অকুতোভয় বৈমানিকরা। এদিন তৎকালীন স্কোয়াড্রন লীডার সুলতান মাহমুদের নেতৃত্বে কিলো ফ্লাইট দ্বারা চট্টগ্রামে ইস্টার্ন রিফাইনারি ও নারায়ণগঞ্জের গোদনাইল তেলের ডিপোতে সফল আক্রমণ করা হয়। ভারতীয় বিমান বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে যেমন- তেঁজগাঁও রানওয়ে, কুর্মিটোলা রানওয়ে, যশোর, কুমিল্লা, লালমনিরহাট ও চট্টগ্রামে বিমান আক্রমণ চালায় পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের আকাশ-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য। তেঁজগাঁও রানওয়েতে মিত্রবাহিনীর বিমান আক্রমণের ফলে সেখানে রানওয়ের মধ্যে বড় বড় গর্ত সৃষ্টির ফলে বিমান উড্ডয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। খুব অল্প সময়ে মিত্র বাহিনী পাকিস্তান বিমান বাহিনী নিয়ন্ত্রিত আকাশ-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করে এবং আকাশে আধিপত্য (এয়ার সুপিরিয়ারিটি) অর্জন করে। এর ফলে মিত্র বাহিনী সিলেট ও ভৈরবে পরিবহন বিমানের সাহায্যে ছত্রীসেনা অবতরণ করায়। ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে গোয়েন্দা তথ্য থেকে জানা যায় যে, গভর্নর হাউসে ১১টার সময় সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের মিটিং হবে। গৌহাটি ঘাঁটিতে অবস্থিত ৩টি মিগ-২১ বেলা ১১.১৫ ঘটিকায় গভর্নর হাউসে আক্রমণ করে প্রধান কনফারেন্স হলের ছাদ ভেঙ্গে ফেলে। যুদ্ধ বিমানের রুদ্র আওয়াজে গভর্নর আব্দুল মালিক ও অন্যান্য মন্ত্রীরা কোনো রকমে ভূগর্ভস্থ বাস্কারে আশ্রয় নেন এবং তৎক্ষণাৎ পদত্যাগ পত্র স্বাক্ষর করেন। গভর্নর আব্দুল মালিক পরে রেড ক্রিসেন্ট কর্তৃক স্থাপিত



নিরাপত্তা এলাকা হোটেল ঢাকা ইন্টার কন্টিনেন্টালে (পরে শেরাটন) আশ্রয় নেন। এটাই ছিল পশ্চিম পাকিস্তান দোসর সরকারের শেষ কর্মদিবস। এখানে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, মিত্রবাহিনী অতি দ্রুত হানাদার বাহিনীর আকাশ-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তছনছ করে। ফলে তারা এমনকি পাক নেতৃত্বের মূলে নিখুঁতভাবে আঘাত করে পদত্যাগে বাধ্য করে যা বাংলাদেশের বিজয়কে ত্বরান্বিত করে।



বোমা বিধ্বস্ত গভর্ণর হাউজ

### আকাশ-প্রতিরক্ষার কাক্ষিত গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা

আকাশ-প্রতিরক্ষার সবচেয়ে কার্যকর এবং কাক্ষিত ব্যবস্থা হচ্ছে বহুস্তর বিশিষ্ট আকাশ-প্রতিরক্ষা ব্যুহ (Layered Air Defence) স্থাপন করা। এই পদ্ধতিতে অনেকগুলো উপাদান যেমন- র‍্যাডার, যুদ্ধ বিমান ও মিসাইল একটার পর একটা বসানো হয় যেন শত্রুবিমান যতই কোনো লক্ষ্যবস্তুর দিকে এগোবে ততই বাধার সম্মুখীন হয়। এই পর্যায়ক্রম প্রতিবন্ধকতাকে আদর্শ আকাশ-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বলা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বৃটিশ বিমান বাহিনী জার্মান বিমান বাহিনীর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্যে এই বহুস্তর আকাশ-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলে যা পরবর্তীকালে বৃটিশদের যুদ্ধে টিকে থাকতে ও জয়লাভ করতে সাহায্য করে।

বহুস্তর বিশিষ্ট আকাশ-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার স্তরগুলো নিম্নরূপ:

ক। পূর্ব সতর্কীকরণ - দীর্ঘ দূরত্বে র‍্যাডারের সাহায্যে বা অ্যাওয়ার্স এর মাধ্যমে মিত্র বিমান চিহ্নিত করা।

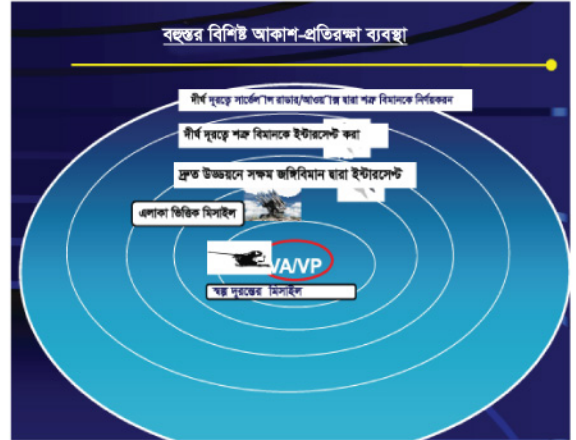
খ। দীর্ঘ দূরত্বে Combat Patrol যুদ্ধ বিমান দ্বারা শত্রুবিমানকে ইন্টারসেপ্ট করা।

গ। দ্রুত উড্ডয়নে প্রস্তুত থাকা যুদ্ধ বিমান দ্বারা শত্রুবিমানকে ইন্টারসেপ্ট করা।

ঘ। এলাকাভিত্তিক ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপণযোগ্য মিসাইলের ব্যবহার।

ঙ। স্বল্প-পাল্লার মিসাইল স্থাপন অথবা আকাশ-প্রতিরক্ষা আর্টিলারি ব্যবহার।

বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর সব উপাদানকে নিয়ে আমাদের বহুস্তর বিশিষ্ট আকাশ-প্রতিরক্ষা গড়ে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে অন্যান্য সব উপাদানের পরিচালন সক্ষমতা এবং ব্যবহার আকাশ-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কার্যক্ষমতার উপর নির্ভর করে। আমাদের সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সার্বিক যুদ্ধক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আকাশ-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দিকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান একান্ত জরুরি।



### উপসংহার

একটি কার্যকর আকাশ-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা যে কোনো সার্বভৌম জাতির জন্য অত্যন্ত জরুরি বিষয়। কার্যকর আকাশ-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া যে কোনো ধরনের সামরিক ও বেসামরিক স্থাপনা খুব দ্রুতই শত্রুর দ্বারা ধ্বংস হয়। বাংলাদেশ সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীকে আরও কার্যক্ষম করতে এবং সামরিক বেসামরিক স্থাপনায় প্রতিরক্ষা সুদৃঢ় করতে একটি সমন্বিত আকাশ-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। এক্ষেত্রে প্রত্যেক বাহিনীকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী আকাশ-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ার সুযোগ করে দিতে হবে। সে লক্ষ্যে সামরিক বাহিনী লক্ষ্যমাত্রা -





২০৩০ একটি সম্ভাবনাময় প্রেক্ষাপট তৈরি করেছে। এই নতুন প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে আমাদের আকাশ-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে অত্যন্ত সুদৃঢ় ও কার্যকরভাবে গড়তে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমরা যেন কোনোভাবেই আকাশের নিয়ন্ত্রণ শত্রুর কাছে না হারাই। তাহলে আমাদেরকে শত্রুর দয়ার উপর বাঁচতে হবে। এক্ষেত্রে বিখ্যাত আমেরিকান সমরবিদ ফিল্ড মার্শাল মন্টগোমারির উক্তি মনে রাখতে হবে। তিনি বলেছিলেন, “আমরা যদি আকাশ যুদ্ধে হারি, আমরা যুদ্ধে হারব এবং অতি তাড়াতাড়ি হারব”। এজন্য সামরিক বাহিনীর নীতি নির্ধারকগণকে অবশ্যই আকাশ-প্রতিরক্ষার বিষয়গুলো অত্যন্ত সুন্দর ও সাবলীলভাবে বোঝার চেষ্টা করতে হবে। এটা আমাদের আকাশ যুদ্ধের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে ও অগ্রাধিকার নির্ণয়ে সাহায্য করবে। একজন সামরিক

বাহিনীর সদস্য হিসেবে অবশ্যই আমাদের আকাশ-প্রতিরক্ষার গুরুত্ব ও সার্বিক দিক সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা রাখতে হবে। আমরা যদি আকাশ-প্রতিরক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেই এবং সে অনুযায়ী সরঞ্জামাদি যেমন- আকাশ-প্রতিরক্ষা র‍্যাডার, মিসাইল, গান ও আধুনিক যুদ্ধবিমান সংগ্রহ করি তাহলেই আমাদের যুদ্ধ করার ক্ষমতা বিদ্যমান থাকবে। আর এসব ব্যবস্থা শত্রুবাহিনীর জন্য ভুমকি হয়ে থাকবে। ফলে অগ্রাসীবাহিনী কোনো আক্রমণ করার আগে তাদের সমূহ ক্ষতির কথা চিন্তা করবে। আর এই উল্লেখযোগ্য নিরোধ (Deterrence) বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর সক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখবে। এই নিরবচ্ছিন্ন নিরোধ বাংলাদেশকে সম্ভাব্য যুদ্ধ হতে বাঁচিয়ে রাখবে এবং সার্বিক শান্তি ও দেশের সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করবে।

### তথ্যসূত্র

- ১। এপি - ৩০০০
- ২। এ এফ এম - ৩৫৫-২
- ৩। সামরিক বাহিনী লক্ষ্যমাত্রা - ২০৩০
- ৪। একান্তরের যুদ্ধে বিমান বাহিনী, শ জামান



উইং কমান্ডার খন্দকার মনোয়ারুল হক, এডিডব্লিউসি, পিএসসি ১৯৯২ সালে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে এডিডব্লিউসি শাখায় কমিশন লাভ করেন। তিনি একজন ক্যাটাগরি ‘বি’ ফাইটার কন্ট্রোলার। তিনি দেশে-বিদেশে পেশাগত প্রশিক্ষণ কৃতিত্বের সাথে সম্পন্ন করেছেন। তিনি সামরিক বাহিনী কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজ, মিরপুরের একজন গ্র্যাজুয়েট। তিনি ২০০৮ সালে ডিআর কন্ট্রোল জাতিসংঘ মিশনে কর্মরত থাকাকালে অনাথ শিশুদের পরিবেশগত ও বিপজ্জনক পানি সরবরাহের সুবিধা প্রদানের প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিমান বাহিনী প্রধানের প্রশংসাপত্র অর্জন করেন। পেশাগত জীবনে তিনি বিমান বাহিনীর বিভিন্ন ঘাঁটি ও সদর দপ্তরে স্টাফ দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি অধিনায়ক ৭৭নং স্কোয়াড্রন হিসেবে মৌলভীবাজার র‍্যাডার ইউনিটে কর্মরত আছেন।



# **ROLE OF ARMED FORCES IN THE EMERGENCE OF INDEPENDENT BANGLADESH**

*Major Dilip Kumar Roy, AEC*

## **Introduction**

The epoch-making war of 1971 popularly known as the War of Liberation is the most glorious chapter in the history of Bangladesh. Our country did not emerge as an independent state overnight in the world map. "This time the struggle is for freedom, the struggle is for our independence" - this historic clarion call of the greatest and most legendary Bangalee leader of all ages, the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman triggered the inner cravings of the general mass and inspired the people from all walks of life to fight gallantly for the independence of Bangladesh. The patriotic Bangalee members of erstwhile Pakistan Army, Navy and Air Force were also equally stimulated with this unequivocal call and spontaneously joined the War of Liberation. They fought valiantly for long nine months against the Pakistan Armed Forces joining shoulder to shoulder with our mass people. As its consequence, independent and sovereign Bangladesh with her Red-Green National Flag came into being in the world map on 16 December 1971. In this paper an effort has been taken to highlight the role of armed forces in winning the final victory through the great War of Liberation.

## **Background History**

In August 1947, the partition of British India gave birth to two new states

named India and Pakistan. Pakistan comprised two geographically and culturally separate areas to the East and the West of India. The Western zone was termed West Pakistan and the Eastern zone was initially termed East Bengal and later, East Pakistan (Now Bangladesh) without caring for the inherent sentiment of the people of this territory. In fact, the people of this territory nourished the sentiment that the partition of British India would ensure equality, dignity and above all socio-economic emancipation. Unfortunately, all hopes and aspirations of the people of the then East Pakistan began to evaporate very rapidly due to numerous cultural complexities, hegemonic attitudes, horrendous disparity and unbearable oppression. The rulers tried to make us forget our inherent culture, heritage, spiritual and social traditions. Though the East Pakistan had the larger number of population, political power was concentrated in West Pakistan and it was truly perceived that East Pakistan was being exploited economically leading to many grievances. Administration of two isolated territories was also seen as a challenge.

Besides, the language controversy eventually reached a point where East Pakistan revolted in 1952. Several students and some common people who came out of their houses sweeping aside the emergency, died in a police





crackdown on 21 February in the same year. The killings also led to the emergence of a new literary and cultural tradition of protests and secularism among the Bangalees. Ultimately, Bengali was accepted as a state language in the constitution of Pakistan in 1956. Since 1952, the day has been revered in Bangladesh and in West Bengal as the Language Martyrs' Day.

The provincial election of East Bengal in March 1954 was a big shock for the Pakistani ruling elite. The landslide victory of the United Front revealed how estranged the Bangalee masses were because of the failure of the Muslim League to keep the promises made during the campaign for Pakistan. The Muslim League, the party of the elite that came to power in Pakistan, promised that once the state of Pakistan came into being, Bangalees would be liberated from foreign exploitation and that national policy would be geared towards their benefit. The United Front's campaign had succeeded because it raised the slogan of the Bangalees' grievances against the central government's discrimination. On September 11, 1956 Huseyn Shaheed Suhrawardy formed a coalition government that included the Awami League. On becoming the Prime Minister of Pakistan, Suhrawardy declared that East Bengal would be granted 98 per cent autonomy. However, nothing substantial was done to alter the actual condition of East Bengal. The lack of initiative of policy makers to change the socio-economic conditions of the then East Bengal was regarded as a betrayal to the Bangalees.

Meanwhile, the politics of intrigue at the central government continued; Suhrawardy was forced to resign. A general election was scheduled for 1959. This election was never to be held. With the proclamation of Martial Law on October 7, 1958, President Mirza abrogated the constitution, dismissed the central and the provincial governments, and banned all political parties. Bangalee nationalism grew because the Pakistani ruling elite refused to recognize the demands of the Bangalees for political participation in the state and for the economic self-rule of East Bengal. Besides, the Six-Point Movement of 1966, the Mass Upsurge of 1969, Election of 1970 and the Non-cooperation Movement of 1971 augmented the final struggle for independence.

The crisis climaxed following the 1970 elections, when the Awami League won a triumphant electoral victory because the party reflected the nationalistic aspiration of the Bangalees. The failure of the Pakistani coterie to meet the demands of the Awami League led to a political deadlock. The military junta refused to accept the 6-point programme because it would reduce the military budget and dismantle the West Pakistani business interests in East Bengal. In view of preventing the Bangalee political leadership from acquiring power, the heinous military of West Pakistan conspired with their elites and bureaucrats to demolish Bangalee nationalism. The military's genocide of the Bangalees opened the ways to the liberation of East Bengal.



While the military prepared to strike the Bangalees, Yahya Khan flew to Dhaka on March 15, 1971 and gave the impression of renewing the negotiations with the Awami League. Bhutto also participated in the negotiations. The National Assembly Session was postponed again till March 25. During the talks Awami League refused to compromise because its electoral victory was based on the support for the autonomy of East Bengal. The Awami League leaders still thought that negotiations with the military junta could be fruitful. But the military dictator and the central government officials left Dhaka without prior notice.

### **Causes of Disillusionment of Bangalees**

From the inception of Pakistan, the central authority heavily dominated by West Pakistani people followed discriminatory policies towards East Pakistan. The state itself was unfairly inclined to West Pakistan which widened the gap between two wings. This discrimination in fact instigated the growth of Bangalee Nationalism, the potential cause for a new state. Ultimately, the acrimony and long grievances of the Bangalees led them to fight a bloody war for establishing their existence as an independent nation in a sovereign country.

### **The Percentage of Bangalees in Pakistan Armed Forces**

Bangalees were under represented in the Pakistan Military. Officers of

Bangalee origin in the different wings of the armed forces made up just around 5% of overall force by 1965; of these, only a few were in command positions with the majority in technical or administrative posts. West Pakistanis believed that Bangalees were not "martially inclined" unlike Pashtuns and Punjabis. This notion was dismissed as ridiculous and humiliating by Bangalees.

### **Political Differences between East Pakistan and West Pakistan**

Though the East Pakistan had been an integral part of Pakistan, the political power had been mainly exercised by the West Pakistan. After the assassination of Liaquat Ali Khan, Pakistan's first Prime Minister, in 1951, political power began to devolve to the President of Pakistan, and eventually, the military. The East Pakistanis observed that the West Pakistani establishment would swiftly depose any East Pakistanis elected Prime Minister of Pakistan, such as Khawaja Nazimuddin, Muhammad Ali Bogra, or Huseyn Shaheed Suhrawardy. Their suspicions were further influenced by the military dictatorships of Ayub Khan and Yahya Khan. The situation reached a climax in 1970, when the Awami League, the largest East Pakistani political party, led by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, won a landslide victory in the national elections. The party won 167 of the 169 seats allotted to East Pakistan, and thus a majority in the National Assembly. This gave the Awami League





the constitutional right to form a government. However, Zulfikar Ali Bhutto, the leader of the Pakistan People's Party, refused to allow Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman to become the Prime Minister of Pakistan.

On 7 March 1971, the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman delivered his historic speech at the Race Course Ground (now Suhrawardy Uddyan). In that speech he mentioned a four-point condition to consider at the National Assembly Meeting on 25 March :

- a. The immediate lifting of martial law.
- b. Immediate withdrawal of all military personnel to their barracks.
- c. An inquiry into the loss of life.
- d. Immediate transfer of power to the elected representative of the people before the assembly meeting on 25 March.

He urged his people to turn every house into a fort of resistance. This speech is considered the main force that terribly inspired the whole nation to fight for its independence.

### **Economic Exploitation**

As in the political administrative sphere, so in the economic, the central authority took steps to perpetuate deprivation and exploitation of East Pakistan which widened the economic disparity between two wings. The economic gap which existed between the two wings in 1947 - 48 increased

substantially by 1958. Such exploitation created a sense of distrust among the Bangalees towards central government. But what irked the Bangalees most and gave special impetus to their demands for autonomy was the transfer of resources from East to West Pakistan.

### **Operation Searchlight**

The war broke out when army units directed by the State of Pakistan launched a military operation called Operation Searchlight on 25 March 1971 in East Pakistan against Bangalee civilians, students, intelligentsia and armed personnel. In Dhaka and elsewhere in East Pakistan, the Pakistan Army began indiscriminate killings, rape, violence, and looting in the name of Operation Searchlight. They arrested Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the leader of the Awami League. The military launched a systematic attack on the Bangalee people. They shelled the Dhaka University, killing the university teachers and students. The Pakistani soldiers also broke into women's dormitories and abused them. They buried the dead in mass graves that were bulldozed over by the tanks. The assailants used artillery and heavy machine gun (HMG) fire to crush the Bangalee civilians, the local police, and the Bangalee troops. The military set up strongholds in Dhaka and in other parts of East Bengal. The Pakistani soldiers set ablaze markets, houses of political workers, newspaper offices and they shot civilians indiscriminately. The international media published the news of atrocities and termed it as acts of genocide.



## How the Liberation War Began

At the historic clarion call of the greatest Bangalee leader of all times, the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the Bangalee members of the Pakistan Armed Forces took up arms against the occupation forces of Pakistan. In fact, Bangalee people had to take up arms in defence of truth, justice, national respect and above all freedom from the Pakistani oppressions. Bangalee military, paramilitary, and civilians spontaneously mobilized them (Mukti Bahini) as a response to the massive killings and destruction carried out on 25 March in the name of Operation Searchlight. They robustly put up a viable resistance over the country. At the end of the initial resistance the Provincial Government of Bangladesh was formed which took prompt decision for developing Bangladesh forces appointing Colonel (Retd) M A G Osmany as Commander in Chief. Bangladesh force comprised of regular troops and guerrilla elements used guerrilla warfare tactics to fight against the West Pakistan Army. The Bangalees resisted the military action spontaneously with primitive arms, by building barricades, and by creating obstacles. India provided economic, military and diplomatic support to the freedom fighters. The Bangalees also received substantial support from the Indian authorities in the form of guerrilla training, arms and ammunition to fight against the occupation forces. Bangalee troops also rebelled against the Pakistani Army in various East Bengal Units. Widely supported by the populace, the Bangalee troops resisted and fought

vigorously against the Pakistan Army that initiated the great War of Liberation.

## Beginning of War

People from all walks of life irrespective of caste and creed, age and education took part in many ways in the Liberation War of Bangladesh. But the armed struggle was led by the armed forces. At the very beginning, resistance was spontaneous but disorganised, and was not expected to be prolonged. However, when the Pakistani Army started indiscriminate killing, tremendous resistance grew overnight. The gallant freedom fighters became increasingly active in all spheres. The personality of General Osmany was also a great source of inspiration to them. The Pakistani military sought to keep them calm, but increasing numbers of Bangalee soldiers defected to the underground in the name of "Bangladesh Forces ". These Bangalee units slowly merged into the Mukti Bahini and strengthened their weaponry with supplies from the neighbouring country. Pakistan responded by airlifting in two infantry divisions and reorganising their forces. They also raised paramilitary forces of Razakars, Al-Badr and Al-Shams as well as other Bangalees who opposed independence, and Bihari Muslims who had settled during the time of partition in 1947.

On 10 April 1971, a provisional government was formed in Meherpur district in Western Bangladesh bordering India with Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, who was in prison in Pakistan, as President, Syed Nazrul Islam as Acting President, Tajuddin Ahmed as Prime





Minister, and General Muhammad Ataul Ghani Osmany as Commander-in-Chief (C-in-C), Bangladesh Forces. Bangladesh Forces command was set up on 11 July, with General M A G Osmany as C-in-C with the status of Cabinet Minister, Lt. Col. Abdur Rabb as Chief of Staff (COS), Group Captain A K Khandker as Deputy Chief of Staff (DCOS) and Major A R Chowdhury as Assistant Chief of Staff (ACOS). As fighting grew between the occupation army and the Mukti Bahini, an estimated 10 million Bangalees, sought refuge majority of whom settled in West Bengal. A smaller number went to Asam, Tripura and other states of India. The checkered General M A G Osmany popularly known as Bangabir M A G Osmany, the visionary leader, unlike the great generals having all components required to win a war, e.g. Mac Arther of Korean War, Field Marshal Montgomery of Battle of El Alamein, Field Marshal Rommel of World War II, General Slim of Burma Campaign, led a war against heavy odds and fought with nothing in hand against a trained, numerically superior army. It was really a Herculean task. General Osmany could accomplish the phenomenal task because of his sheer patriotism, precision of understanding of events, utmost devotion, unfaltering dedication and majestic leadership. Against many odds in terms of weapon, equipment and manpower General Osmany adapted himself to work prudently, and ultimately with his military genius combined with experience, sagacity and maturity, he managed to achieve, what most would fail in such a stressed situation.

General Osmany had differences of opinion with the Indian leadership regarding the role of the Mukti Bahini in Liberation War of Bangladesh. Indian leadership initially envisioned Bengali forces to be trained into a small elite guerrilla force of 8,000 members, led by the surviving East Bengal Regiment soldiers operating in small cells around Bangladesh to facilitate the eventual Indian intervention, but the Bangladesh Government in exile and General Osmany favoured the following strategy :

a. Bengali conventional force would occupy lodgment areas inside Bangladesh and then Bangladesh government would request international diplomatic recognition and intervention. Initially, Mymensingh was picked for this operation, but General Osmany later settled in Sylhet.

b. Sending the maximum number of guerrillas inside Bangladesh as soon as possible with the following objectives :

(1) Increase Pakistani casualties through raids and ambush.

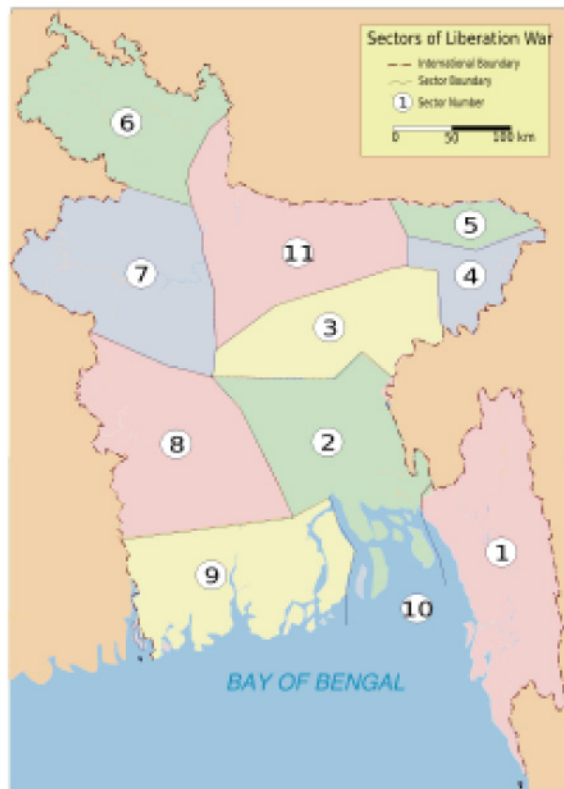
(2) Cripple economic activity by hitting power stations, railway lines, storage depots and communication networks.

(3) Destroy Pakistan Army mobility by blowing up bridges/culverts, fuel depots, trains and river crafts.

(4) The strategic objective was to make the Pakistanis spread their forces inside the province, so attacks could be made on isolated Pakistani detachments.



Keeping the above strategies in mind Bangladesh was divided into eleven sectors in July, each with a commander chosen from defected officers of the Pakistani Army who joined the Mukti Bahini to conduct guerrilla operations and train the freedom fighters. General Osmany had been quite lucky in the sense that he got a good number of highly talented military officers under his command who ultimately led the sectors and sub-sectors. Most of their training camps were situated near the border area and were operated with assistance from India. The 10th sector was directly placed under the Commander-in-Chief General M A G Osmany and included the Naval Commandos and C-in-C's special force. The sectors are shown in the map below :



11 Sectors of Bangladesh

## Organisations Formed in the War

Along with the civilian population and the newly recruited freedom fighters, the gallant Bangalee soldiers fought valiantly in the form of guerrilla warfare for the liberation of Bangladesh. As such new organisational concept started gaining its ground. When all were contemplating to start organising a brigade size formation, orders came in early July of 1971 to organise 'Z' Force and train under the command of Major Zia. Z Force was raised on 7 July 1971 with 1st, 3rd and 8th East Bengal Regiments. Battle of Kamalpur, battle of Nakshi and battle of Bahadurabad Ghat are some of the great achievements for Z Force.

In the month of September, 1971 Major Khaled Mosharraf got the orders to raise 'K' Force which consisted 4th, 9th and 10th East Bengal Regiments. Actually, in no time he could form his brigade at Melaghar in the Indian state of Tripura as he was very proactive in this regard. Just after being raised, these battalions began to operate as a cohesive force. Important battle of 'K' Force was the battle of Kasba and battle of Belonia Bulge where our conventional brigade achieved a great success.

Major K.M. Safiullah also got orders from Bangladesh Forces Headquarters in the month of September, 1971 to raise a regular force in line of an Infantry Brigade. 'S' Force came into being very shortly on 01 October 1971 at Fatikchhari in the Indian state of Tripura as he was awaiting this order since long. The brigade consisted of 2nd and 11th East





Bengal Regiments. Important battle of 'S' Force was the battle of Mukandapur BOP located under Kasba Police Station in the district of Comilla.

The above mentioned brigades were raised for conventional warfare and a large guerrilla force was trained. Sector Commanders directed the guerrilla warfare. For better efficiency in military operations each of the sectors was divided into a number of sub-sectors. Initially, in combating the Pakistani Forces, the freedom fighters used to follow the conventional mode of operations and discovered it to be less effective. Realizing the unconventional war i.e. the pin-pointed guerrilla attacks in a short notice to be more effective, the freedom fighters sub-divided themselves in numerous groups and cut off the enemies' road communication and routes of reinforcements. Bangalee regular forces also attacked BOPs in Mymensingh, Comilla and Sylhet, but the results were mixed. Bangladesh conventional forces attacked border outposts. Kamalpur, Belonia and the Battle of Boyra are a few examples. 90 out of 370 BOPs were occupied by Bangalee forces. Guerrilla attacks intensified, as did Pakistani and Razakar reprisals on common people. In the mean time, Pakistani forces were reinforced by 13 battalions from West Pakistan.

From the very beginning of the resistance against the occupation forces, many officers, warrant officers and sailors left the Pakistan Naval Force and

joined Bangladesh Forces in land operations. Eight highly trained Bangalee sub-mariners serving in Pakistan Naval Ships escaping their watchful eyes joined not only our freedom fighters but also helped undergoing quality naval commando training. They mainly formed the 'Suicide Squads'. The major success story was 'Operation Jackpot', in which naval commandos mined and blew up berthed ships in Chittagong, Mongla, Narayanganj and Chandpur on 15 August 1971. In the later part of September 1971, Naval Force was formed comprising the trained members of the Navy from different sectors. Initially, Bangladesh Navy started their operations with two Gun Boats namely 'Padma' and 'Palash' comprising 44 sailors having 40mm Bofors and Machineguns.

In combating the occupation forces in the air space, Bangladesh Air Force started its journey on 28 September 1971 with 58 air crew. Those air crew had their training at Dimapur, Nagaland of India with only one DC-3, one Alouette and one Otter launched the combined assault with Bangladesh Army and Navy against the Pakistani Forces on and from 21 November 1971. The Bangladeshi freedom fighters even managed to temporarily capture airstrips at Lalmonirhat and Shalutikar. Both of these were used for flying in supplies and arms from India. The people of East Pakistan for their self existence and emancipation waged the war of independence and fought heroically till they achieved their mission.



## Training

Within the concept of people's war a huge number of enthusiastic youths were trained in guerrilla warfare for about 3 to 4 weeks in the training camps established in India and Bangladesh both. After completion of training they infiltrated into Bangladesh and carried out numerous small operations against their foes following hit and run tactics. They fought the war as Gono Bahini under the command and control of sector commanders. The dauntless guerrillas fought valiantly that augmented the efforts of Bangladesh forces to a great extent.

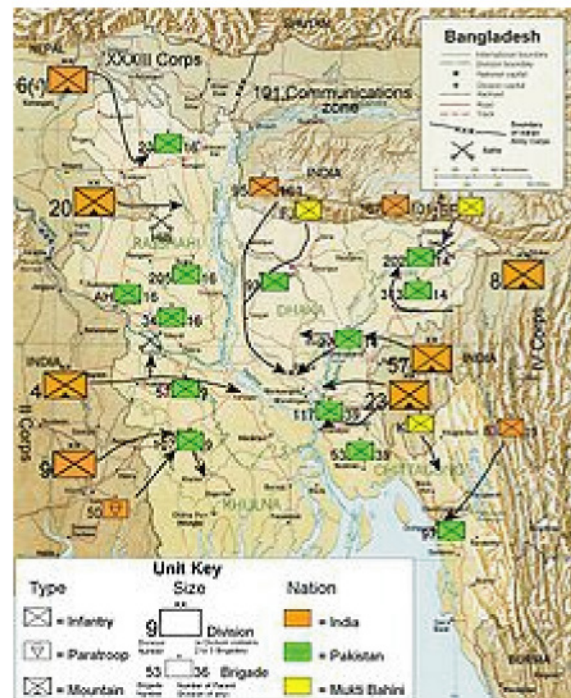


Guerrillas undergoing small arms training in the training camp

## The Final Allied Offensive

India got involved into the war with her all out efforts when the Pakistan Air Force (PAF) launched a pre-emptive strike on Indian Air Force bases on 3 December 1971. The attack was modeled on the Israeli Air Force's Operation Focus during the Six-Day War, and intended to neutralize the Indian Air

Force planes on the ground. The strike was seen by India as an open act of barbarian aggression. This marked the official start of the Indo-Pak War of 1971.



Indian Military Units and Troops Movements During the War

As a response to the attack, both India and Pakistan formally acknowledged the "existence of a state of war between the two countries." Three Indian corps were involved in liberating the then East Pakistan from the occupation forces. They were supported by nearly three brigades of Mukti Bahini fighting alongside them, and many more fighting irregularly. The allied force was far superior to the Pakistani Army of three divisions. The Indians quickly overran the country, selectively engaging or bypassing heavily defended strongholds. Pakistani Forces were unable to effectively counter the Indian





attack, as they had been deployed in small units around the border to counter guerrilla attacks by the Mukti Bahini. The Pakistani Forces became severely unstable fighting the allied forces. Ultimately, being unable to defend Dhaka, the Pakistani forces were bound to surrender.

### **The Air and Naval War**

The Indian Air Force (IAF) carried out several sorties against Pakistan and within a week, IAF aircraft dominated the skies of East Pakistan. It achieved substantial air supremacy by the end of the first week as the entire Pakistani air contingent in the East, PAF No 14 Squadron was grounded because of Indian and Bangladesh airstrikes at Tejgaon, Kurmitola, Lalmonirhat and Shamshernagar. Sea Hawks from INS Vikrant also struck Chittagong, Barisal and Cox's Bazar, destroying the eastern wing of the Pakistan Navy and effectively blockading the East Pakistan ports thereby, cutting off any escape routes for the stranded Pakistani soldiers. The nascent Bangladesh Navy (comprising officers and sailors who defected from the Pakistani Navy) aided the Indians in the maritime warfare, carrying out attacks, most notably 'Operation Jackpot'.

### **Reasons for the Final Victory**

Huge research work has been done by many renowned people on our Liberation War. Researchers have found out a good number of reasons for the ultimate victory in the Liberation War of Bangladesh, 1971. Bangladesh forces won firstly

because of their honest mission. Secondly, they had absolute support of the common people with them. Thirdly, under the prudent leadership of Bangabir General M A G Osmany, proper strategy and tactics were applied by the gallant Mukti Bahini in the Liberation War. Fourthly, the freedom fighters had enormous willpower and high morale. Finally, Bangladesh forces got the material, diplomatic and moral support of India and former Soviet Union.

### **Conclusion**

The armed forces personnel fought shoulder to shoulder along with the freedom loving people of all walks of life against the occupation forces and earned the long cherished victory for our nation. The Pakistan Army surrendered to the joint command of Bangladesh and Indian Forces on 16 December 1971. Lt. Gen A. A. K. Niazi, Commander, Eastern Command of Pakistan Army forces located in East Pakistan signed the Instrument of Surrender in front of the Chief of India and Bangladesh Forces in the Eastern Theatre, Lt. General Jagjit Singh Aurora. On this day, we achieved our treasured independence through a period of long nine months War of Liberation. The historic declaration of independence proclaimed by the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman on March 26 in 1971 came true through attaining ultimate victory. Bangladesh emerged as an independent and sovereign state in the world map. A revolutionary mass being led by the visionary leadership of



Bangabandhu could stampede all obstacles hurled on them by enemy and finally, the triumphant nation could reach the pinnacle of success and saw the rise of a beaming sun in the green on 16 December 1971. With the unconditional

surrender of the Pakistan Army, the dream of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman came true and Bangladesh came out of the labyrinth of the ferocious claws of Pakistani forces and won the coveted victory.

### BIBLIOGRAPHY

1. Bhattacharyya, S. K., 1988. Genocide in East Pakistan/Bangladesh: A Horror Story, A. Ghosh Publishers.
2. Govt. of Bangladesh, Documents of the War of Independence, Vol 01-16, Ministry of Information.
3. Hakeem Arshad, Major General, 2002. The 1971 Indo-Pak War, A Soldiers Narrative, Oxford University Press.
4. Raja, Dewan Mohammad Tasawwar, 2010. O General My General (Life and Works of General M.A. G. Osmany). Dhaka, The Osmany Memorial Trust.
5. K. M. Safiullah, Major General, 1989. Bangladesh at War, Dhaka, Academic Publishers.
6. Muhit A M A, 1992, Bangladesh, Emergence of a Nation, University Publishers Ltd.
7. Jahan Rounaq, 1994. Pakistan, Failure in Nation Integration, University Publishers Ltd.
8. Professor Islam Shirajula (edited), 2003, Bangladesh, Dhaka, Asiatic Society,
9. [http://en.wikipedia.org/wiki/M.\\_A.\\_G.\\_Osmany](http://en.wikipedia.org/wiki/M._A._G._Osmany)
10. [http://en.wikipedia.org/wiki/List\\_of\\_sectors\\_in\\_Bangladesh\\_Liberation\\_War](http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sectors_in_Bangladesh_Liberation_War)
11. [http://en.wikipedia.org/wiki/Bangladesh\\_Liberation\\_War](http://en.wikipedia.org/wiki/Bangladesh_Liberation_War)
12. [http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Bangladesh\\_War\\_of\\_Independence](http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Bangladesh_War_of_Independence)
13. [http://www.picturebd.com/liberation\\_war\\_of\\_Bangladesh](http://www.picturebd.com/liberation_war_of_Bangladesh)



**Major Dilip Kumar Roy** was commissioned in the Army Education Corps in December 1998. He obtained his B A (Hons) and MA in English Literature from the University of Dhaka. He served as Instructor Class 'C' and 'B' in Bangladesh Military Academy (BMA), General Staff Officer-3 (Education) in an Infantry Brigade and Instructor Class 'B' in Military Institute of Science and Technology (MIST). He attended the United Nations Peacekeeping Mission in Sudan as a Civil Military Coordination (CIMIC) Officer. It is to mention that he has a good number of publications to his credit in different journals and newspapers. Presently, he is serving as General Staff Officer, Grade-2 in Education Directorate, Army Headquarters, Dhaka.





# INTEROPERABILITY AMONG THE OPERATING AGENCIES IN COMBINED POST DISASTER MANAGEMENT OPERATIONS

*Wing Commander M M Ekramuzzaman, afwc, psc*

## Introduction

Interoperability is the ability of agencies to work together towards a common goal or objective. Communication interoperability ensures that all sharable data and information should be made available through the communication network and that can easily be accessed, linked and well understood by all humanitarian organizations. In any natural post disaster scenario, when all the communication systems get disrupted, coordination among the operating agencies becomes a great challenge in combined disaster management operations. During the emergency response phase of any disaster, all government, non-government, national and international agencies including the Armed Forces of Bangladesh take immediate measures, as per the Standing Operating Procedure (SOP) to meet the essential services to the victims, such as food, water, power, medical, logistics, transportation etc. In subsequent disaster management cycle like recovery (rehabilitation and reconstruction) phases, communication between different agencies becomes essential for efficient disaster management operations.

During the post disaster and search and rescue (S&R) operations, vertical and

horizontal co-ordination between the participating agencies remains the key factors for efficient management of any disaster. In post disaster period, the operating agencies at the field level feel absence of communication means for coordination with other relevant agencies. At the same time, immediately after the disaster, when the people need immediate help of recovery, that time, if the rescue party takes longer time to reach the affected people and takes time to coordinate due to the absence of communication equipment, the life of the affected people might be at stake. Moreover, due to the absence of communication means, most of the agencies carry out their jobs in a very unplanned and uncoordinated way which also affects the efficient disaster management operations. In this paper an attempt has been taken to find out whether the present communication system used by different organizations/agencies during post disaster management operations is interoperable or not.

## Background

Bangladesh is a disaster prone country and faces the challenges of managing the natural disaster every year. These disasters caused severe damage to the property, loss of human lives and



enormous sufferings to the poor people of the country. With the proactive pre and post disaster management preparation by the government of Bangladesh and with the coordinated effort by the different agencies, it is possible to overcome the difficulties and restore the situation with the help of armed forces, government and non-government organizations (NGOs), national and international organizations (IO)/agencies, UN agencies etc.

In post disaster period, the armed forces establish their own radio relay system, HF/VHF communication system for their own communications with their respective headquarters and Armed Forces Division (AFD) activates an operation cell with required communication facilities with all relevant agencies including Disaster Management Bureau (DMB). The local government also establishes traditional communication system like telecommunication and mobile communication network for coordination with different agencies working in the disaster affected area. The local government also uses police communication network and fire brigade communication network as convenient. The NGOs and other local and international agencies also use their own communication means like HF or VHF wireless communication or sometimes uses satellite phones for post disaster activities. But there is no such common protocol or procedure available for collaborative information, information-sharing in disaster

situations and complex disaster management environment.

### **Pre and Post Disaster Management Coordination System**

**Coordination among the Different Operating Agencies.** All the government agencies concerned do maintain, as usual, telecommunication network during pre-disaster period. It is usually assumed that the telecommunication infrastructure in the disaster affected area gets damaged during the cyclone, tornado etc. Because of breakdown of telecommunication links with the affected areas, the government fails to get accurate and timely information on the extent and nature of damage. Normally, the armed forces establish Radio Relay (RR) network in the disaster affected area to establish communication with the armed forces headquarters. As per Standard Order of Disaster (SOD), Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (BTRC) ensures establishment or restoration of mobile network by the mobile phone companies in the disaster affected area for speedy dissemination of early warning information to the community. BTRC also ensures establishment of telecommunication network in the disaster affected area as soon as possible. The Inter-Ministerial Disaster Management Coordination Committee is established at the national level to facilitate policy making, planning, programming and implementing measures relating to disaster risk reduction and emergency response management in Bangladesh.





**Coordination within the Armed Forces.** During any natural disaster, the armed forces on deployment, first establish communication with their respective headquarters and other related agencies. Bangladesh Army establishes communication network by using Army Radio Relay (RR) System. They also use HF communication for long distance communications where the RR communications are not possible. Bangladesh Air Force and Bangladesh Navy also establish their own communication network for communication with their respective headquarters. The individual service also use their own wireless set (VHF) for short distance communications.

**Coordination among the NGOs.** During pre-disaster period, the NGOs use BTCL telecommunication and mobile communication network for their day to day communication and coordination. However, during the post disaster scenario, when the telecommunication and mobile communication networks get disrupted, the NGOs and IOs also face difficulties to communicate and coordinate with each other. The Cyclone

Preparedness Programme (CPP) of Bangladesh Red Crescent Society (BDRCS) maintains a communication network to disseminate cyclone warning signals issued by the Bangladesh Meteorological Department to the coastal people. CPP's radio communication network links to its communication centres at its head office in Dhaka. The purpose of this network is exclusively for the disaster management task.

**Coordination with IOs.** During any severe natural disaster many international organizations like Red Crescent, UNDP, USPACOM etc and many countries send relief goods for the disaster affected people. The agencies coordinate with Foreign Ministry of Bangladesh through their respective embassies. Generally, government of Bangladesh tasks Armed Forces Division to coordinate with the incoming agencies and accompany them to the disaster affected area.

### **Need for Coordination among the Operating Agencies**

The need of coordination and sharing information is of critical importance in both the planning and execution of the recovery phases of any disaster events. When any devastation takes place, the critical requirement of coordination between the operating agencies become very essential. The critical areas are security, establishment of the rule of law, providing essential services, such as food, water, power, sanitation, medical, and shelter and logistic support such as communications, transportation and



information. The need for communication with each other becomes essential throughout these areas, and the way in which this need is met in the early stages of a disaster or complex emergency will be a key enabler in any nation's ongoing capacity building. The following issues often complicate coordination between operating agencies :

- a. Lack of required information of the affected area.
- b. Confusion/doubt regarding the information sharing and intelligence gathering.
- c. Priority of information needs between military and civilian agencies.
- d. Different types of command and control chain in military operations versus civilian activities.

Information sharing between the organizations would be difficult as there is no single source available neither at government level nor at non-government level for sharing common information for disaster management. But the availability of common information would certainly help all the relevant agencies share information which would help reduce duplication of effort and would also enhance and provide common knowledge of critical information.

### **Information Required for Disaster Management Operations**

During the disaster, the participating agencies need certain basic information for their work. They first need to know the latest situation of the affected area. Though

the required information may vary from organization to organization, however, for the strategic-level policy makers need "overall picture" analysis to understand the issues, make decisions on providing assistance and identify problems and obstacles. Field personnel and project desk officers, on the other hand, need more detailed operational and programme related information to plan and implement humanitarian assistance and reconstruction programmes. Information needed can be divided into the following basic categories :

a. **Background Information.** The agencies and organizations involved in disaster management activities need some information about the geography, demography, economic structure etc. Beyond these general information or data, they also need more specific data reflecting the conditions prevailing in various relevant sectors, such as, medical, transportation, communications, and food supply etc :

- (1) Pre-crisis population of the disaster affected area and its demographic composition (ethnicity, religion, urban/rural etc).
- (2) Pre-disaster geographic information (especially related to cyclones, floods, tornadoes, earthquakes, riverbank erosion, draught etc).
- (3) Recovery record from past disaster events.





**b. Situational Awareness.** Once the crisis has been developed, organizations need to know the latest information about the situation on the ground and information about the conditions, needs and locations of affected population. Some examples of situational awareness information are :

- (1) Latest or most current humanitarian and reconstruction situation in the affected area.
- (2) The most recent severity indicators in terms of death tolls, mortality rates, malnutrition rates and infrastructure damage.
- (3) The affected populations like the old, children and other vulnerable groups and resident populations with their locations.
- (4) Assessment of damage to infrastructure in transportation, buildings, housing and communications.
- (5) Latest security situation in the affected areas.

**c. Operational information.** Organizations need informations to plan and implement humanitarian assistance and reconstruction programmes. Issues that programme planners must raise include :

- (1) The conditions of the access routes for delivering humanitarian and reconstruction assistance.
- (2) Names of the organizations that are working in the area, their programme and capacities and working place.
- (3) Government response and its

capacity to provide more assistance.

- (4) The financial needs of the responding organizations.
- (5) Amount of fund provided to the responding organizations and name of the donors.

### **Interoperable Communication Network for Disaster Management Operations**

**Wireless Networks by using HF/VHF/UHF Radio.** A wireless radio (HF/VHF/UHF) communication network would be established at all operations centres related to disaster management operations. This network will be the most robust interoperable network. All agencies will be able to use the network on the availability of the communication sets. The frequency would be allotted by BTRC for HF, VHF and UHF and it will be available in the website of BTRC or DMB. The agencies concerned would tune the frequency and will establish communication for necessary coordination during post disaster management activities. A common communication protocol needs to be established in co-ordination with BTRC and DMB and with other relevant agencies.

**Mobile Phone Communication Network.** In Bangladesh the mobile phone communication network has been expanded up to the village and coastal areas. If the mobile communication network of Base Transceiver Station (BTS) gets damaged and/or disrupted, this communication network can be restored within 24 hrs. The power supply for BTS may be taken from the solar panel or portable generators.



Through this mobile phone network, the operating agencies will be able to communicate with other operator and also connect to the website or internet if necessary.

**Satellite Communication.** During post disaster periods, perhaps the satellite communication provides the field workers best possible communication connectivity. Commercial satellites today can provide cost-effective connectivity to virtually any place on earth. As a result, they have become a key enabler for extending ICT services to remote, devastated or disadvantaged areas in support of Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) and S&R operations.

**Internet, Email, Websites, Metadata Repository Connections.** An official website in respect of disaster management operations needs to be launched for all stakeholders (both military and non-military) and provision to be kept open to highlight the activities in a crisis area of operations. Organizations participated in disaster management operations would 'log in' in the site and insert related data in the appropriate location designated so that the Disaster Management Bureau (DMB) on behalf of Government of Bangladesh can centrally monitor the activities of all participating organizations contributing in disaster operations. The organizations should do this for at least two reasons. First, a website provides a virtual location to exchange information and post data so that it is accessible to parties both in the crisis area and at the organization's headquarters. Second, the website may provide highly sought public exposure to the organization's humanitarian aid work

and fund raising ability. The website would serve the following common purposes in respect of disaster management operations:

- a. To serve the needs of the target audience, including government, non-government departments, national, international and local organizations and NGOs.
- b. To remain always focused and linked to existing systems of disaster management operations to avoid duplication of effort.
- c. To indicate the source of the information and include disclaimers to guard against inaccuracies in data collected by other parties.
- d. To facilitate humanitarian coordination, improve operations and inform decision making in disaster management operations.
- e. A "resource centre" that includes a document library, GIS map centre, imagery library, pictures, white papers, field reports and database.

### **Role of Different Government Agencies in Establishing an Interoperable Communication Network**

**Role of DMB.** The DMB being a coordinating body of the government can play an active role in establishing an interoperable communication network among the agencies working for disaster management operations. In case of any natural disaster, the disaster operations centre is activated in the affected districts, upazillas and up to the union level. The DMB in coordination with





BTRC would allot a universal frequency for HF, VHF and UHF communications for disaster management operations. Any organization participating in disaster management activities would use those wireless radio sets and communicate with each other. The call sign may be used as per the registration name of the organizations. So, at any time, from the division, district, upazilla levels, the coordination would be easy and effective. If there is any interoperable communication network, other agencies can also share each other's information and carry out efficient disaster management operations. The existing website of DMB, [www.dmb.gov.bd](http://www.dmb.gov.bd) which provides disaster related information can be utilized for sharing data for all participating agencies in disaster management operations.

**Role of BTRC.** BTRC has an important role in establishing an interoperable communication network for disaster management operations. The BTRC may allot spot frequency for HF, VHF and UHF operations and circulate in the different linked website so that any organizations (local, national or international) can tune the frequency and can communicate with each other.

**Role of AFD.** Bangladesh Army, Navy and Air Force may also use the common frequency for voice communication in disaster management operations. The armed forces activities may also be published in the website for the awareness of the general people. Relevant video and pictures may be published in government website by which the citizens of the country and the international community can observe the

activities of the armed forces in disaster management activities.

**Role of MoFDM & DMB.** In the SOD, it is mentioned that the coordination at district, upazilla and union levels will be done by the respective District, Upazilla and Union Disaster Management Committees. But there are no clear instructions given for the different committees as to how the committees would coordinate the job with different operating agencies for field level operations. It is not also clear that how the different committee will communicate with each other and what type of communication equipment will be used. An SOP needs to be formulated by Ministry of Food and Disaster Management (MoFDM) & DMB for inclusion in the SOD by mentioning all relevant information for all concerned agencies operating at field levels during post disaster management period. An SOP for coordination at the field level is required to be prepared in this regard.

## Conclusion

Natural disaster has become a regular phenomenon and government of Bangladesh has given due importance for management of natural disaster. During any national disaster, all Government and Non-Government Organizations (NGOs), IOs, civilian communities and all organizations concerned participate in management of natural disaster. Coordination between the participating agencies remains the key factors for efficient management of any disaster in any post disaster and search and rescue (S&R) operations. During post disaster period, not merely the communication within the organizations help to manage



disaster but the interoperability in communication among the agencies can offer better results in disaster management.

During post disaster period, a wireless radio (HF/VHF/UHF) communication network would be most suitable means for quick and easy communication and coordination related to disaster management operations. This network will be the most robust, reliable and interoperable means of communication. All agencies will be able to use the network on the availability of the communication sets. The satellite communication also provides the field workers the best possible communication connectivity. Commercial satellites today can provide cost-effective connectivity to virtually any place on earth. As a result, they have become very familiar for extending communication services to remote, devastated or disadvantaged areas in support of HADR and S&R operations. Portable, mobile and fixed terminals communicate with land earth stations that interface with the public network for access to voice and internet services, including e-mail, web surfing and the use of web portals. A website in respect of disaster management operations may be launched by the government of Bangladesh where all the participating agencies would be allowed to access in the website and authorized agencies would be allowed to insert data and information. The website would serve the needs of the target audience including government and non-government departments, national, international and local organizations etc. The website may act as a "resource

centre" that includes a document library, GIS map centre, imagery library, pictures, white papers, field reports and database.

### **Recommendations**

Communication and coordination play an important role for any disaster management operations. For more efficient disaster management operations in Bangladesh, following recommendations are made :

a. An interoperable communication network may be established at different layers of disaster management, especially at disaster affected area, consisting of the following minimum communication equipment :

(1) Wireless voice communication network by using HF/VHF /UHF radio sets. A common frequency would be used for this purpose.

(2) Wireless data communication using satellite communication technology.

(3) Internet communication and a common 'Website' with access/log in option for proving up-to-date data in the web for common users.

b. BTRC may allot common frequencies for HF/VHF/UHF interoperable radio communication network.

c. DMB may update the existing website providing access to all participating agencies for inserting their data and information related to disaster management operations.





d. An SOP may be included in the SOD for smooth coordination at the field level during post disaster management operations.

e. An interoperable communication network may be designed and established in the districts concerned

for field level coordination during post disaster management operations. The organization concerned like MoFDM, DMB, AFD and BTRC should take immediate steps to establish an interoperable communication network.

### BIBLIOGRAPHY

1. Diwan Parag Dr, A Manual On Disaster Management, Pentagon EARTH 2010.
2. Hawkins Dan, Law Enforcement Technical Guide for Communications Interoperability U.S. Department of Justice Office of Community Oriented Policing Services 2006.
3. SOD by Ministry of Disaster Management and Relief, Government of Bangladesh, 2011.
4. Wentz Lerry, An ICT Primer : Information and Communication Technology for Civil-Military Coordination in Disaster Relief and Stabilization and Reconstruction, Centre for Technology and National Security Policy, National Defence University.
5. Ahsan Abu Hossain Muhammad, A case study on Flood 2000 in the South-Western Districts : Problems of Coordination between Government of Bangladesh and NGOs in Disaster Relief Operation in Bangladesh.
6. Alam Didarul Brig K. M. Disaster Management in Bangladesh : System, Drawbacks and Strategy for the Future, A research Paper written at NDC 1999.
7. Amin Nazmul Ahsan Brigadier General, Armed Forces Experience in Disaster Management published in Armed Forces Journal 1997.
8. Rahman Md Anisur, Lieutenant Colonel, IT in Disaster Management Operations : The Role of Armed Forces, Bangladesh Defence Journal.
9. Akhter Fahmida, A Thesis Paper on Disaster Management in Bangladesh : The Role of NGOs by Deptment of Geography and Environment, University of Dhaka.
10. Communications and Information Management : FEMA Federal Emergency Management Agency.htm.
11. Multinational Communications Interoperability Program (MCIP) : An Emergency Communication and Disaster Management Workshop by USPACOM, at Hawaii, USA in 2009.



**Wing Commander M M Ekramuzzaman, afwc, psc** was commissioned in the Engineering Branch of Bangladesh Air Force in 1988. In his long service career, he has served in the capacity of different instructional, staff and command appointments both at Air Headquarters and different operational bases of BAF. He has attended a number of professional courses at home and abroad. He has done Armed Forces War Course (AFWC) from National Defence College (NDC), Mirpur in 2011 and obtained M Phil degree (Part I) in Security Studies from Bangladesh University of Professionals (BUP). He has done Air Staff Course from Defense Services Command and Staff College (DSCSC), Mirpur and obtained Masters in Defence Studies (MDS) from National University in 2004. He has also completed MBA (HRM) from AIUB, Bangladesh and obtained Gold Medal in 2010. He has served as UN Observer in Congo in 2004-2005 and as a member of BAF Contingent in Ivory Coast in 2012-2013. At present, he is serving as Officer Commanding of Training Wing at BAF Base Zahurul Haque, Chittagong.



# MARITIME TRADE SECURITY OF BANGLADESH : SUCCESS IN COMBATING CRIMES

*Commander Atiqur Rahman, (G), psc, BN*

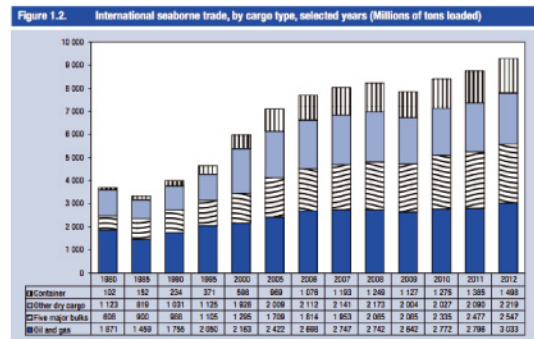
## Introduction

Bangladesh is a maritime nation linked to world community through the Bay of Bengal. Major sea lines of communication towards Singapore and Colombo provide unique trade facilities all over the world. Chittagong and Mongla ports handle 92 per cent maritime import-export cargo. Major share of annual revenue of government comes from export-import tax. Maritime dependency factor of Bangladesh economy is increasing every year. About 100 per cent export and 80 per cent import materials of garments are transported through seaports. Agriculture, manufacturing, construction, food items etc are greatly dependent on maritime sectors. Hundred per cent POL, maximum Export Processing Zone (EPZ)s and industries are established centering seaports. Dhaka-Chittagong and Dhaka-Mongla corridor generates 30 per cent of the GDP. The GDP growth rate of Bangladesh is about 6.1 per cent (approx); whereas, maritime trade growth rate is 15 per cent for last five years. Thus security to maritime trade is regarded as security of economic life line of Bangladesh.

## Global Maritime Trade

Maritime transport is the backbone of international trade and main mechanism of driving globalization. Around 80 per cent of global trade is carried out through

the sea. The growth of maritime transport is strongly correlated with the growth of international trade. In 2010, about three quarters of the growth of imports of developing economies took place in East and South Asia. Since 1970, global seaborne trade has expanded on an average by 3 per cent every year. At this pace, if there is no upheaval in the world economy, global seaborne trade is expected to increase by 36 per cent in 2020 and to double by 2033. Economy of Bangladesh is heavily influenced by global maritime trade.



## Trade Volume of Bangladesh

Economy of Bangladesh is import based. During 2010 - 2011, the two seaports handled about 92 per cent of the country's international trade where Chittagong port alone handled 95 per cent of the maritime trade. Due to heavy dependency on maritime trade, seaports are considered as prime mover of Bangladesh economy and





'Golden Gate of Development'. As a matter of fact, when GDP growth increases by 1 per cent, cargo handling growth at Chittagong port becomes double. About 40 percent of the revenue income of government comes from export-import duty taxes. The turn over of the seaports is Tk. 14531.50 million during 2011-2012. Geostrategic advantages facilitate our ports to be the regional hub like Singapore or Colombo. Deep Sea Port (DSP) in Bangladesh is a strategic issue in regional perspectives.

### Geostrategic Importance of Bangladesh

Bangladesh is located on vast alluvial plain of Himalayan range toward north, Bay of Bengal links with maritime world in southern part. Other three sides have land border mostly with India and a small part with Myanmar in south east. The funnel shape of Bay of Bengal provides dividend to carry commercial goods far in deep seaports of Chittagong and Mongla. These ports can serve Bangladesh as well as eastern part of India (Seven Sisters), Nepal and Bhutan as the region has only access to sea through the Bay of Bengal. The other sides are hilly due to Himalayan range. Efficient seaport and communication can play key role for economic development of the region. China, United Kingdom and UAE have already proposed to build deep seaport in Bangladeshi coast. Moreover, rising of China, her deep seaport in Pakistan and Colombo, naval base in Myanmar

have also increased strategic importance of the Bay of Bengal to India and strategic ally USA.



Geostrategic Importance of Maritime Trade of Bangladesh

### Nature of Maritime Trade

Maritime trade is regulated by mostly international law. Security issues are significant for both national interests as well as international obligations. UNCLOS III serves as the basis of nation's rights and jurisdictions of the sea. Under the auspices of United Nations, International Maritime Bureau (IMB), the Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP), International Chamber of Commerce - Commercial Crime Services (ICC-CCS) etc work as main platforms to protect maritime trade worldwide.

### Threats to Maritime Trade Security

Maritime trade suffers from various conventional and unconventional threats like enemy attack, terrorist or pirate



attack and robbery. Amongst all, piracy remains as the most ancient, devastating and the costliest issue where global shipping security claims over US \$16 billion per year. Over 50,000 commercial ships become target of piracy every year. In 2011 more than 240 pirate attacks, 63 hijackings, over 1410 seafarers were taken hostage, and 11 seafarers were killed by pirates worldwide. Currently, more than 26 ships and 336 seafarers are being held hostage by pirates for ransom in Somalia coast. To control this menace various organizations like IMB, ReCAAP, CCS etc monitor piracy worldwide and provide support to ships under attack. Based on piracy incidents, IMB grades status of the coast/port as High Risk, Low Risk etc and issues warning to ships. Somalia, Malacca Strait, Indonesia and African coasts are graded as the 'High Risk' area. Bangladeshi Flag ship M V JAHAN MONI was also taken by Somalian pirates in 2012. Robbery and theft are major threats to Bangladesh ports as well.

### **Impact of Piracy in Maritime Trade**

Piracy causes extra burden of cost to vessels. Any breach of security, the captain immediately reports to ship owners and international watch bodies like IMB, RECAAP etc which appear to the notice of international community. The consequences of such activities can be as follows :

a. Insurance premium rises if port is graded as high risk.

b. Ships arriving in such an insecure port will take additional precautions causing extra expenses to ship owner/charterer, and freight will rise. Extra cost will be added while marketing the products and consumers have to pay high price.

c. Ship owners will always prefer the more secured port between two adjacent ports.

### **International Law on Maritime Crime**

Piracy protection measures are described in UNCLOS III. But it is found not effective due to boarding restrictions to law enforcing agencies. Armed robbery against ship is not regarded as piracy, as such, jurisdictional rule is not also applicable in case of robbery. But robbery is a common crime ships suffer in many ports and Captains of the ships report all security incidents as piracy. The 1983 IMO resolution defines piracy and armed robbery against ships. The resolution also subsequently provides jurisdiction of governments to prevent acts of piracy and armed robbery by taking measures while ships in or adjacent to their waters :

a. **SUA Convention 1988.** After the Achille Lauro incident, SUA Convention 1988 (convention for the suppression of unlawful acts of violence against the safety of maritime navigation) established jurisdiction over offences taking place in states territory and other places where they have criminal jurisdiction





(e.g., on a ship or aircraft registered in their state), or when alleged offender is present in their territory. Criminal offenses as defined in the convention are punishable by domestic law with serious penalties.

**b. SUA Protocol 2005.** In the aftermath of 9/11 attack, on 20 November 2001, IMO called for a review of the existing measures and procedures to prevent terrorism threatening security of passengers and crew which finally came as SUA Protocol 2005. In certain cases, the protocol permits boarding and search of suspected ship by law enforcement officials of others when such ships are in international waters.

### Statistics of World Wide Piracy

As per IMB report 2011, statistics of piracy in the major piracy prone port/areas of the world are as follows :

Locations	2007	2008	2009	2010	2011
Indonesia	43	28	15	40	46
Malacca Straits	7	2	2	2	1
Malaysia	9	10	16	18	16
Singapore Straits	3	6	9	3	11
<b>Bangladesh</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>10</b>
South China Sea	3	-	13	31	13
India	11	10	12	5	6
Benin	-	-	1	-	20
Gulf of Aden *	13	92	117	53	37
Red Sea**	-	-	15	25	39
Nigeria	42	40	29	19	10
Somalia	31	19	80	139	160
<b>Total at year end world wide</b>	<b>263</b>	<b>293</b>	<b>410</b>	<b>445</b>	<b>439</b>

Extracted from IMB Annual Piracy  
Report 2012

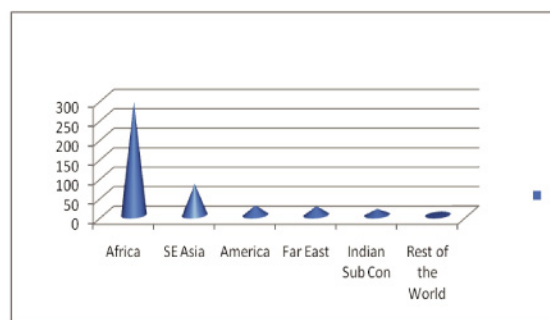
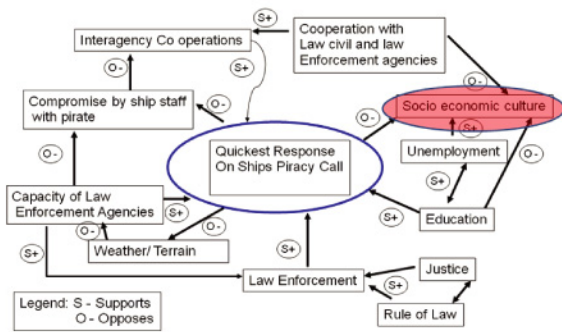


Chart prepared from 2012 - IMB Piracy Report

### Crimes in Bangladesh Port Area

People in coastal areas board on ships forcefully by attacking crew or by hiding and rob or steal stores. Most incidents take place while ships at anchor or in berth. Pirates go to ships using small boats and climbs on deck using ropes and cables. Sometimes miscreants also proceed to ships to make small business like supplying fresh provisions. Piracy, stealing and illegal trading are long traditional activities carried out by coastal people in Chittagong anchorage area and have turned into a socio-economic culture. Sometimes, ship staff also regularise sold items declaring as lost by piracy. Criminals in Bangladesh coast are mostly illiterate and not at all aware about the impact of their activities on maritime trade of Bangladesh. For minor gain people create national image catastrophe. Due to long history of robbery and theft, Chittagong port was graded as the 'High Risk' port of the world since our independence which could be removed after many years in 2011. The following loop shows the critical analysis of piracy in Bangladesh.



**Piracy (Causal Loop)**

### Loops on Piracy in Chittagong Outer Anchorage

The causal loop above shows aspects of piracy in Chittagong port. Inter-related factors that influence and oppose piracy are marked as 'S' and 'O' respectively. The socio-economic culture is considered as the 'Root Cause' of piracy. People do it as their ancestors did and other people in the society are doing. Miscreants are not heavily armed compared to Coast Guard and Navy. 'Quick Response on ships call' is proved to be very useful to apprehend pirates and identified as key factor to bring success. Constant communication with ships and port control, deployment of capable high speed boats, helicopters and ships are obligatory to ensure quick response.

### Statistics of Piracy in Chittagong Port

In case of any breach of security both by robbery or stealing, affected ships report to IMB as piracy. That is how Chittagong port was regarded as piracy prone port of the world though actual

piracy as per UNCLOSS III does not take place. For example, map below used in a research in the University of Alabama, USA depicts statistics of piracy in Chittagong port in 2003 (2nd highest in the world). Bangladesh authorities have brought this anomaly to the notice of IMB and ReCAAP in various occasions. A check back system is also established with IMB through Directorate General of Bangladesh Shipping, Navy, Coast Guard and Chittagong Port Authority to identify the nature of incident and action taken by Navy and Coast Guard. This has reduced false piracy allegations significantly.



Statistics of piracy in Chittagong port in 2003 (as shown by the University of Alabama, USA).

### Gradual Success in Combating Piracy

Various organizations issue warning notices to mariners regarding safety which is published routinely in marine publications. The warnings published about Chittagong port and Bangladesh coast are as follows :





Organization/ Publications	Year/ Edition	Name of Port	Warning/Comments
Bay of Bengal Pilot	1978	Chittagong	Thieving, specially of mooring ropes, reported to be very prevalent both at outer anchorages and alongside. A close 24 hours watch is necessary.
Pole star Sailing Directions 2005 India and Bay of Bengal Enroute	2005	Chittagong	Piracy remains concern in Chittagong. The port was reported to have the second highest number of piracy incident in 2001. Arms attack from small boat can occur in Chittagong port or in the harbour.
Bay of Bengal Pilot	2010	Chittagong	Bangladesh Coast Guard vessels patrol the outer anchorage. Mariners are strongly advised to place watchman on the upper deck, forward and aft.
ICC-IMB Report	2012	Chittagong	Attacks in Bangladesh have fallen significantly over the past few years because of the efforts by the Bangladesh authorities.
ReCAAP Report	2012	Chittagong	In South Asia, the improvement was most evident in the Arabian Sea and Bangladesh. The lowest number of incidents were reported in Bangladesh in 2012, compared to the last four years (2008-2011). This was a result of timely reporting by the master to the port authorities and quick response of Bangladesh Coast Guard.
ICC Commercial Crime Services	15 Jan 2013	Chittagong	Attacks in Bangladesh have fallen significantly over the past few years because of the efforts by the Bangladesh authorities.



## Acknowledgement of Security Improvement in Bangladesh Coast

Success in combating piracy is well recognised by international piracy monitoring and forecasting agencies. Extract of ReCAAP remarks from official website is shown below :

**ReCAAP: Piracy and Armed Robbery Against Ships in Asia - Annual Report 2012**  
Source: ReCAAP

There has been a marked improvement in the situation of piracy and armed robbery against ships in Asia in 2012.



A total of 132 incidents (123 actual and nine attempted incidents) were reported in 2012 compared to 157 incidents (135 actual and 22 attempted) reported in 2011, and 167 incidents (134 actual and 33 attempted) in 2010. Compared to 2011, this is a 16% decrease in the total number of incidents reported in 2012, the largest year-on-year decrease during the five year reporting period of 2008-2012.

The decrease was more apparent at the ports and anchorages in Bangladesh and Vietnam, in the South China Sea and the Straits of Malacca and Singapore. While statistics shows a consecutive downward trend commencing from 2010, the total number of incidents reported in 2012 was still higher than 2008 and 2009, hence there is no room for complacency.

## Anti-Piracy Operations of Bangladesh Law Enforcing Agencies

Anti-piracy operations became primary responsibility of Bangladesh Coast Guard after its inception in 1995. Since then, Coast Guard carries out operations individually as well as with the assistance of Bangladesh Navy and Chittagong Port Authority. Initially, both Navy and Coast Guard had limited capabilities to respond fast to ships piracy call. Since 2009, both Navy and Coast Guard are supported with good number of world famous United States Defender Class and Tornado Class western boats which have been found to be very useful to operate against pirates in the coastal area. The modern boats and ships,

dynamic leadership, dedication, commitment and hard work of Coast Guard and Naval personnel brought enormous success in controlling crimes. Finally, in 2011, Bangladesh could remove label of being 'High Risk' port in maritime trade which is a historical achievement for Bangladesh Navy and Coast Guard.

## Conclusion

No doubt, maritime trade is the life line of Bangladesh economy. Any threat to uninterrupted safe trade directly affects development of all sectors. Geographical location facilitates Bangladesh ports to be regional hub for maritime trade. More so, security lapses in maritime trade have international connotation. The success that has been achieved in combating maritime crimes may be credited as improvement from previous state. This has to be sustained and further enhancement is vital. The grounds for engaging people in crimes (ignorance, illiteracy, unemployment, culture, justice, social bad practices) are still remaining almost unchanged. As such, combating crimes will remain as a major challenge for Bangladesh Navy and Coast Guard. To ensure desired level of security capacity building of maritime law enforcement agencies is a worth investment and it has enormous reimbursement.





## BIBLIOGRAPHY

1. 1982 International Law of the Sea (UNCLOS III).
2. ADB Report 2005.
3. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) Review of Maritime Transport 12.
4. Official Website of Chittagong Port Authority.
5. <http://www.icc-ccs.org/piracy-reporting-centre/piracynewsfigures> - IMB Piracy and Armed Robbery facts and Figure.
6. IMO Resolutions.
7. <http://cns.miis.edu/inventory/pdfs/aptmartime.pdf> - SUA Convention 2005.
8. IMB Annual Piracy Report 2012.
9. <http://www.icc-ccs.org/icc/imb> ICC Commercial Crime Services.




---

**Commander Atiqur Rahman (G), psc BN** was commissioned in the Executive Branch of Bangladesh Navy in 1989. He attended various courses at home and abroad. He is a Gunnery Specialist Officer and completed Missile Command and Tactics Course from Dalian Naval Academy, China. He is a graduate of Defence Services Command & Staff College, Mirpur, Dhaka and the US Naval War College, Rhode Island, USA. He has obtained Masters in Defence Studies. Commander Atiq has attended Port Management Course conducted by CPA and Comprehensive Crisis Management Course at APCSS, Hawaii, USA. He served as Staff Officer (Operations) and Flotilla Operations Officer to Commodore Commanding BN Flotilla. He served as Operations Officer of Coast Guard and Deputy Director Operations at Coast Guard Headquarters. He also served United Nations as Military Observer in Liberia. Presently, he is serving as Training Commander of Bangladesh Navy School of Maritime Warfare and Tactics in Chittagong.

---



# CONFLICT RESOLUTION – AN EXPERIENCE GAINED IN UNITED NATIONS MISSION IN IVORY COAST

*Brigadier General Md Sarwar Hossain, hdmc, psc*

## Introduction

Conflict is an inevitable feature of all social relations. People often feel reluctant to get involved in a conflict situation. Truly again, who doesn't feel uncomfortable at the thought of an unpleasant and possibly emotional confrontation be it in job sector or at personal level? It is also not guaranteed that two people will always agree on every matter. Unfortunately, conflicts are rarely self-healing conditions. Therefore, learning how to deal with conflict rather than escaping from it is very important. When conflict is mismanaged, it injures the relationship, but if handled reverentially, it can offer opportunities for growth strengthening ties. The mechanics of conflict resolution from individual relationship to home, groups and large organizations to nation states are not very different. In the military, peacekeeping/peace-enforcement situations are the best areas where we may find their applications. I did my first peacekeeping mission as a young captain back in 1991-1994 under United Nations Iraq-Kuwait Observer Mission (UNIKOM). Until then, I didn't have any exposure to this subject neither as a matter of professional study nor as personal interest. However, with brief knowledge gained in staff college, I had done second mission in the African states of Ivory Coast in 2005-2006.

Second time, I was the Operations Officer and eventually my little knowledge helped me in averting a severe confrontation between two forces. Though I had done effectively, this was not to mean that I knew exactly how such situations were handled. This is rather a narrative most of which I visualized during post-event analysis. This may be interesting for all those who are working in similar kind of situations in peacekeeping/peace-enforcement roles. In this paper, an effort has been made to highlight the application of conflict resolution techniques.

## Definition and the Perspective

Apart from conflicts in inter-personal relationship, it has wider connotation. The word 'conflict' is normally used to refer to a physical confrontation such as a fight, battle or struggle or used more broadly to mean a disagreement or opposition of interests or ideas. 'Conflict' says Burton "describes a relationship in which each party perceives the other's goal, values, interests or behaviour as antithetical to its own". If we look at the evolutionary process behind most nation states, it is clearly evident that conflicts are generated from the scarcity of either resources or power and attempt by states or parties to win control over those.





It is conceived as a situation in which parties perceive that they have incompatible goals. The Ivorian crisis was no difference. Besides, inter-ethnic or religious strife, the crisis in Ivory Coast was the product of a complex combination of internal and external factors such as the nepotism and corruption of those in power, erosion of state institutions, competition between various factions within the government for control of wealth, and external interests are noteworthy. Situation seems to have improved a little, after the long awaited election that took place in 2010 and Alassane Ouattara was sworn in as president removing Laurent Gbagbo backed by huge international support. Anyway, in 2006, more than six thousand peacekeepers from different countries were deployed there in various capacities represented largely by contingents from Bangladesh, France, Pakistan and other African states. All the forces had been working for the common cause, yet their historical linkage with host country along with their approach to peacekeeping, training and discipline played a vital role in building cohesive relations with the parties involved. From that perspective, Bangladesh contingents enjoyed receptive treatment from different forces of Ivory Coast. But it was little different in the case of the political violence that took place in the western city of Guiglo in the month of January 2006. It brought some criticism for the Bangladesh Battalion (BANBAT) in peacekeeping circle for its inept role. Yet, our overall reputation amongst the warring factions remained steady. The article is an

incident where BANBAT deployed in Zuenoula under Sector West had successfully averted a grave confrontation between Ivorian Government forces and the French forces. Eventually, all the parties enjoyed a win-win situation. How and what have made this possible are essentially the conflict resolution skills applied in different stages which the readers might recognize as the story unfolds.

### **Development of the Incident including its Management**

The incident took place in 2005 and the place of occurrence was quite close to BANBAT Headquarters located on the outskirts of a tiny town of Zuenoula. Zuenoula is situated almost in the centre of Ivory Coast and adjacent to the Zone of Confidence (ZOC) around which focus of all our operational activities had revolved. On 30 July 2005 at about mid day Licorne (code name of French contingent) patrol accompanied by our French Liaison Officer (LO) Captain Dempsey Frank was denied passage to Zeunoula town by Ivorian government forces known as Force Armee National Cote d'Ivoire (FANCI) manning the nearest check point from our battalion headquarters. On being stopped the LO contacted the Prefect (Administrator) and the Sues-prefect (Deputy Administrator) of Zeunouela. Nothing worked and the Licorne patrol remained stranded in the check point for more than an hour. This was not in compliance with the privileges accorded to the United Nations (UN)



mandate which authorizes them complete freedom of movement in their areas of deployment. Under this situation, I being the Operations Officer of the BANBAT had rushed to the check point to settle the matter. Since the local government force commander Lieutenant Offe by then left for his office at Zuenoula, I followed him there and so did other French officers. In a while, we reached their highly armed den, little tentative in mind though recollecting the audacity and temperament of those black Africans. Anyway, I had begun the proceeding with due regards and compliments. I conscientiously had listened to the position of both sides about the incident relating to the passage of Licorne convoy through the check point. I did feel tempted to respond at times on hearing their parochial and regional outlook but held my nerve calm. It was revealed from the statement of Lieutenant Offe that whenever there is Licorne movement inside the town, people specially the ladies and the kids get panicked and they often report to them questioning their presence and purpose. So, they wouldn't allow Licorne and UN movement of large convoys and night patrolling in Zeunoula town. I then politely reminded the FANCI officer about the authority and privileges of impartial forces including Licorne in regards to their freedom of movement. I added, any embargo locally imposed on their movement might seriously undermine the wisdom of Ivorian government since it has ratified the functioning of impartial forces on its

soil. I also requested that no impartial force member should abuse this authority at the expense of human rights and public safety. FANCI officer was also requested to convey all good works and activities to the people of impartial forces so that misgivings, if there are any, can be removed. Yet, small little issues are not unlikely to arise while working together on the ground but they have to be addressed without wasting any time. For any such confusion, all were advised to seek clarification from appropriate authority instead of getting into a conflicting situation. It was also told that, should FANCI have any reservation about the conduct and dealing of any particular member either from the Licorne or BANBAT, it must be brought into the knowledge of respective force commander. They didn't have any specific allegation or complaint. I also emphasized on the requirement of close coordination and cooperation amongst forces working for the common cause. My efforts didn't produce expected result. When the hour long discussion failed, the matter was referred to the Sector FANCI LO Lieutenant Colonel Kore. He assured of some decision after investigating the matter and talking to concerned FANCI commanders working in Zuenoula. Afterwards, both Licorne and BANBAT patrol left the spot. While returning, I was little frustrated but determined to follow up that matter for a peaceful solution. Interestingly, FANCI didn't have any reservation on the movement of BANBAT elements.





Before receipt of any decision on the issue, Licorne tried to pass through the same check point on the same day in the evening and as usual got stuck by FANCI troops while approaching towards Zuenoula. It was about 1900 hours. Licorne LO instantly rushed to the operations room and informed me about the matter terming it extremely tensed. After talking a while, he quickly left for the check point. While leaving, he added that "you might hear gun shots, sir". For a moment I was short of words for a reply. Before I could even utter anything, he left the operations room. However, I immediately informed the matter to the contingent commander. I called Licorne LO and Lieutenant Offe over mobile telephoned and advised them to exercise restraint. Lieutenant Offe was also present at the check point and was maintaining contact with the company commander Captain Alla who is the commander of all FANCI troops deployed in Zuenoula. Lieutenant Offe categorically said that Licorne will not be allowed to patrol inside Zuenoula during night. Under this situation, I also contacted Sector West FANCI LO Lieutenant Colonel Kore and requested him to look into the matter. Every moment LO had been conveying me with the development around the check point. Both FANCI and Licorne went into battle position pointing their guns at each other. The road was blocked by putting a lorry across. Licorne APCs and other combat vehicles were poised to counter any threats emanating from FANCI side.

Lieutenant Colonel Kore was again contacted but he said that Captain Alla could not be contacted and that's how no update was available.

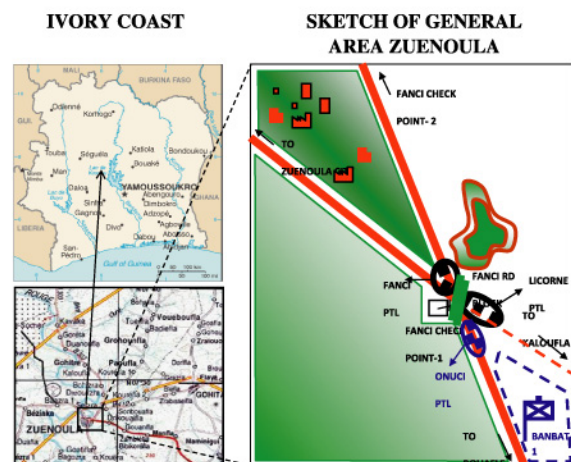
Meanwhile, Licorne LO contacted me explaining the position of his headquarters located in Man, another city, situated on the north-western part of the country along the Liberian border. Their headquarters urged upon the patrol and LO to push through the check point at any cost. Instead of adding, they rather stifled my efforts whatever I took so far to reconcile the issue. Who would make them understand that such a rigid posture was contrary to the spirit of peacekeeping role? For instance, in May 2005, an Ivorian detainee named Firmin Mahe who was suffocated to death by French peacekeepers brought about huge criticism. General Henri Poncet who led French peace keepers in Ivory Coast at the time was put under investigation - a step short of formal charges "for complicity in the murder". Two of the soldiers, who were riding in the armoured vehicle where Mahe was suffocated, faced murder charges. The other two including the driver and Colonel Eric Burgaud were suspected of complicity. I thought these relatively young French officers shouldn't face the similar consequences here. It was right that unless acclimatized appropriately with the requirement on ground, soldiers would find it difficult to distinguish between classical military roles and other non-military assignments.



As Licorne LO intimated, the matter was also informed to their Headquarters in Abidjan, the capital of Ivory Coast. At this stage LO wanted to know the position and plans of BANBAT to arrest the situation. I instantly contacted Sector West Headquarters for appraisal of the situation including any instruction if they had on the latest development. Sector West Headquarters advised to resolve the issue peacefully. Anticipating the requirement of reinforcement, few patrols were put in a state of readiness. LO was contacted to provide him with assistance in the form of reinforcement and arbitration if necessary. He ruled out the requirement of reinforcement but asked for someone who could reconcile the issue. Incidentally, senior officers had been on leave and a few were in the capital on official tour. There was none other than me who could have responded readily. Again I contacted Lieutenant Colonel Kore and gave him the latest picture around the check post. I asked him to intervene immediately as the situation was worsening every moment. He assured me that he would be contacting the Operational Headquarters (COM THEATRE) seeking assistance to break the dead-lock which was not forthcoming.

At this point of time, I reached the check point with a patrol and met both Licorne and FANCI officers. The sight around check point had been subtly different from what I actually thought. Both the forces were facing each-other with hands on their triggers. As darkness

descended, tension had been mounting in the minds of everyone present there. I had been trying to mediate the issue with Lieutenant Offe. It was a very challenging task. For a mediator, the prime concern was to know the nature of the relationship between the conflicting parties and how to change the actual condition of that relationship. Keeping all factors in mind, I was busy in devising a strategy that would be acceptable to both the parties. It was completely an unfamiliar endeavour but I had trust in dogged optimism for a peaceful resolution of the impending crisis.



Meanwhile, Lieutenant Colonel Kore contacted Commander Tangre at the COM THEATRE and gave a call to Licorne LO conveying their inability to allow any passage to Licorne convoy through FANCI check point. Colonel Tangre replaced Brigadier General Mangu who had a different view and he was in favour of allowing access to Licorne patrol anywhere at will. Yet, the situation continued to turn worse without





any signs of hope for a meaningful negotiation. Time had been running out fast increasing apprehensions everywhere. Yet, efforts were on and they were being reminded time and again about the consequences of such rigid stand including its impact on the overall peace process. Nothing was good enough to make a breakthrough. At this stage, I thought of applying a different technique to deal with the situation. FANCI's relative preference of BANBAT over Licorne was a great advantage and I thought of capitalizing on this in a prudent way. As they did not have any reservation on the movement of BANBAT, I therefore thought of leading a BANBAT patrol and planned to propose Lieutenant Offe accordingly. Licorne patrol would only follow BANBAT patrol. Under this circumstances, the proposal should satisfy them as they wouldn't concede anything to Licorne independently in regards to their passage through the check point. This should also convince Licorne as they would finally see the shackle broken and their freedom of movement restored. Without wasting any more time as that might let the opportunity to slip away from our grip, right away I proposed. Good sense prevailed upon the FANCI and they agreed at the concept of my joint patrol with Licorne led by BANBAT. In fact, an atmosphere was created where both FANCI and Licorne found their demands respectfully met. Here, the idea of win-lose, with one party winning and the other party losing, had been replaced by

the idea of win-win, and solution was found to meet both parties' need. As I was organizing the patrol for the city tour, the French LO became too concerned about my safety and wanted a French Armoured Personnel Carrier to spearhead my patrol.



**Contingent Commander's Meeting with various stakeholders during the Post-event Analysis**

But I knew it well that my soft skinned jeep could offer better protection than his armoured carriers just because we enjoyed complete Ivorian trust. In many missions, we did enjoy similar respect to mention about Somalia, Kuwait and others. As I returned from the patrol, I noticed a great sign of relief and joy in the face of all. All ranks greeted me including the commanding officer for a job well done. Later, the contingent commander held a meeting with all the stakeholders for an after action review.

### **After Thought**

Conflict resolution is not just about averting danger, or fixing things up; it is about finding and capitalizing on the



opportunity that is inherent in the event. BANBAT-1 in Zuenaula had successfully explored this opportunity and built a better relation amongst the forces. During post event analysis, it was further revealed that, from FANCI's point of view, the problem had been more of egocentric in kind than their real ignorance about the freedom of movement of impartial forces. There was a Status of Forces Agreement (SOFA) signed between the United Nations and Ivory Coast defining the privilege and authorities of impartial forces which both sides should have adhered to. FANCI although represented by a handful military personnel without any reckonable armaments, they certainly were the symbol of Ivorian sovereignty and solidarity. As such, they expected some sort of respects from the French forces which was missing throughout. Besides, there had been very little coordination and cooperation from other forces with the Ivorian forces except Bangladesh Contingent about which we had been appropriately regardful. Apart from these professional matters, there had been some historical reasons too. Having ruled this country over three decades, the French soldiers developed a psyche with which it wasn't easy to have a relation based on mutual respect and honour. For the same reason the FANCI also used to treat the French soldiers with suspicion.

These are the factors that seemed to have governed the matrix of inter-force relationship and reactions to different situations which the own forces appreciated and handled successfully on ground creating a win-win situation for all.

## Conclusion

From our personal to professional life, everywhere we apply conflict resolution skills to the best of our ability. Other than fighting wars, the soldiers go through many experiences that are sometimes more memorable and, at times, more rewarding than war itself. In peacekeeping and peace enforcement operations we have much opportunity to apply our skills to test and excel. In doing so, learning to build and mend relationships pay much dividend. One needs to be aware of the sensitivities and he should never give feelings that someone will have to win and someone to lose. When you can recognize the legitimacy of conflicting needs and become willing to examine them in an environment of compassionate understanding, it opens pathways to conflict resolution. It is to be remembered, when only one person's needs are satisfied in a conflict, it is not resolved at all rather it may continue for long and bring enormous disaster.



**Brigadier General Md Sarwar Hossain, hdmc, psc** was commissioned on 24 December 1986 in East Bengal Regiment. He has attended a number of courses at home and abroad. He is a graduate of Defence Services Command and Staff College, Mirpur and has also attended Higher Defence Management Course in India. He held various Command, Staff and Instructional appointments. He attended the United Nations Mission in Kuwait and Ivory Coast. Besides, serving in a number of Infantry Battalions and Headquarters, he commanded 4 East Bengal Regiment. Presently, he is serving as a Brigade Commander in Chittagong Hill Tracts.





## SONADIA DEEP SEA PORT – WHITHER THE BENIFITS

*Commander M Joynal Abedin, (ND), afwc, psc, BN*

### Introduction

Being the prime seaport of the country, Chittagong is used as a feeder port as vessel longer than 186 metres or draft with over 9.20 metres cannot enter the port due to restriction of the channel depth and length of berth. With vessel access as the primary concern, even when berth space is available, vessels have to wait for a favourable tide before it is able to berth. The same is true for a departing vessel that has to wait for favourable tide before it can leave the port. In case of Mongla Port, the situation is far worse than Chittagong. To recover their cost of waiting, shipping companies charge higher rates and the cost to the economy of higher shipping rates is quite substantial. So, need for a port with deeper channel to accommodate deep draft vessel and reduce the cost of transportation was felt long before. Besides, dependency on one port would be disastrous in case of any crisis. Moreover, considering the strategic location, Bangladesh has been dreaming for a hub port of the region having deep draft berths in a suitable location. Bangladesh's present export volume through seaports is about 45.6 million tons and it is growing at a rate of 10 per cent every year'. In one hand, trade volume would soon cross the capacity of Chittagong port and, on the other, with the construction of a Deep Sea Port

(DSP) the export volume would increase several times more. Besides, neighbouring countries and, specially, land lock countries of the region like Nepal, Bhutan and Seven Sisters would also be interested to use the DSP for their export and import trading. All these opportunities and needs prompted Bangladesh to go for a DSP at Sonadia, Cox's Bazaar. Accordingly, government of Bangladesh has decided to build a DSP at Sonadia of Cox's Bazar, but due to various reasons the mega project could not make much headway.

### Location of the DSP

Location of proposed DSP is situated on the south east coast of Bangladesh in between Sonadia Island and Maheshkhali Island. It is approximately 90 km (48 Nautical Miles) south of Chittagong, 300 km from Dhaka and about 15 km north west of Cox's Bazar in position of Latitude 21° 33'00" N and Longitude 91° 51'00" E.

**Figure 1 : Location of Proposed DSP**



Source : Primary and DSP Cell, 145 New Baily Road Dhaka



### Port Features

The maximum permissible draft of the DSP will be 14 metres. It is quite encouraging compared to 9.2 metres at Chittagong port and 6 - 8 metres (for Anchorages) at Mongla port. A maximum length of 250 metres for general cargo (bulk) vessel and 300 metres for container vessel will be permitted to enter the port, whereas the maximum length of ship is permitted at Chittagong port is 186 metres only.

### Estimated Project Cost

The total project cost is estimated to be US\$ 2.229 billion for short term plan. Another US\$ 559 million will be required for road and rail link to the project. With present exchange rate (1 US \$ = 82 Taka) the cost would be BD Taka 18,277 crores. Final phase by 2055 would cost a total of US\$ 5 billion (40,100 crores taka).

**Figure 2 : Bird's Eye View of Sonadia DSP (Target Year 2055)**



Source : DSP Cell and PCI Japan Report, January 2007, p.12-8

### Progress of DSP Project

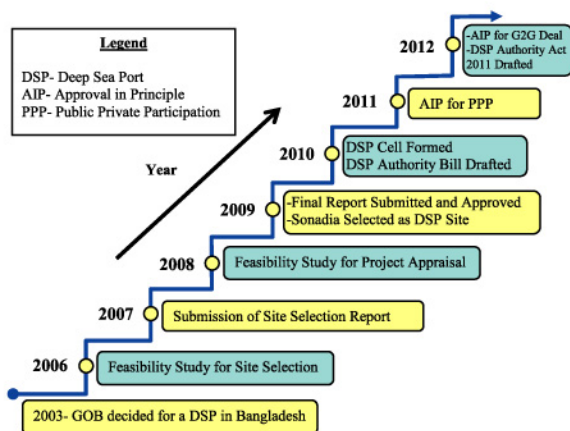
After the submission of site selection report in 2007, PCI has carried out further

study on project appraisal and submitted their final report in July 2009. The recommendation of the report was approved by a meeting of the cabinet committee on economic affairs. According to the recommendations, the government has selected the Sonadia Island for the deep seaport. The cabinet committee also recommended for Preliminary Development Project Proposal (PDPP) for finding suitable donor for the project. In the meantime Government of Bangladesh (GOB) has formed a DSP cell in August 2010 for quick execution of port-related decisions. Failing to make any headway, the project was again sent to the meeting of the cabinet committee for Approval in Principle (AIP) to implement the project under PPP on 11 September 2011. According to the instruction of the committee, the opinion of PPP office was sought in this regard. The PPP office opined that total cost of the project is 2.229 billion dollar of which only 766 million dollar can be financed by PPP. Rest 1.463 billion would have to be financed from non-PPP source like Chittagong port and government own funds. In addition, rail, road and other infrastructure construction will require another 559 million dollar from non-PPP sources. As such, a total of 2.022 billion (1.463 billion +0.559 billion) dollar would be required from public sources. Having troubled with Padma Bridge funding, the cabinet committee on economic affairs has abandoned the idea of any PPP. Finally, on 01 September 2012 the committee has given AIP for Government to Government initiatives to implement the project. Meanwhile, the cabinet committee has





given AIP on draft Sonadia DSP Authority Act 2011 on 2 January 2012. The chronological development for DSP project so far is given in the following timeline :

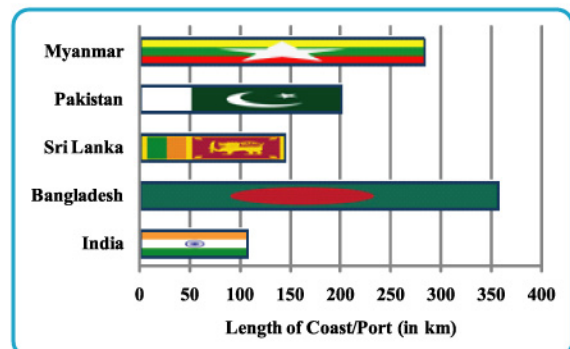


#### STRENGTHS AND BENIFITS

### More Ports More Economic Potential

Economy of Bangladesh is growing at about 6% whereas number of seaports to support this growth did not increase. Since independence no new port could be constructed; rather one of the two ports, Mongla, is in the verge of decline. In India, number of major ports doubled within the same period. Presently, India has 14 major ports including DSPs and 38 medium and minor ports along their coast line. Similarly, Sri Lanka, Pakistan and Myanmar have been dynamically developing their seaports for sustained economic boost. Following figure shows our weaknesses in port infrastructure compared to the length of coast despite having a vast population. It is, therefore, imperative to implement DSP project immediately to keep pace with the neighbours.

**Figure 3 : Length of Coast per Port (in km) in Neighbouring Countries**



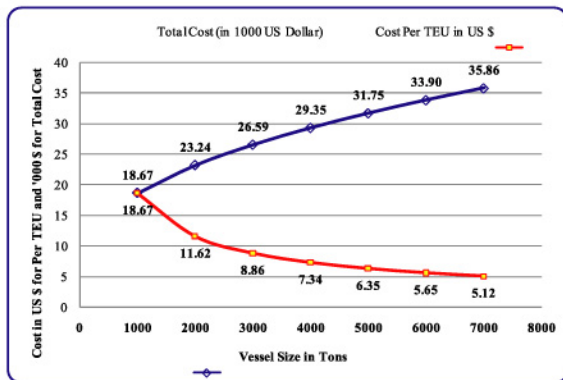
Source : From the above table

### Lower Operating Cost from Higher Vessel Size

With the construction of new facilities in existing ports the trade handling capacities would not increase much. Because both existing ports are handicapped in their water depth at quay side and approach channel. On the other hand, container ship sizes deployed on the main routes and some feeder service routes are becoming increasingly larger to accommodate the traffic growth of international seaborne containers, therewith profiting from "economies of scale". The following figure shows how vessel's operating costs come down with higher capacity of ships. It is estimated that with larger ships the freight charge of one container would come down by US\$ 52.5. This freight reduction would be enjoyed by DSP, not by Chittagong and Mongla port. Hence, for economic reason, DSP with 14 metres depth is the solution to shallow depths (7-9 metres) of existing ports.



**Figure 4 : Vessel Size vs Vessel Operation Costs (Container Ship)**

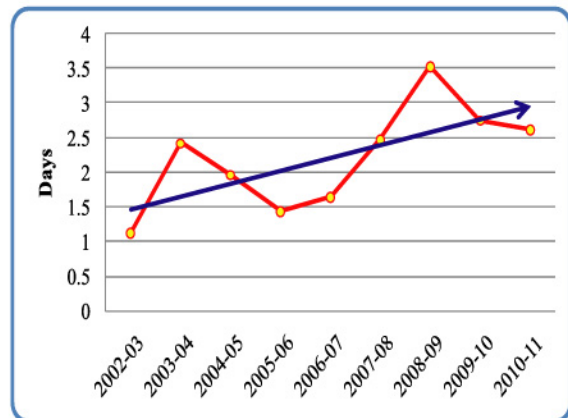


Source : PCI Japan, Market and Business Assessment Report Part IV, December 2008, p-2-20

### Saving in Vessel Waiting Time

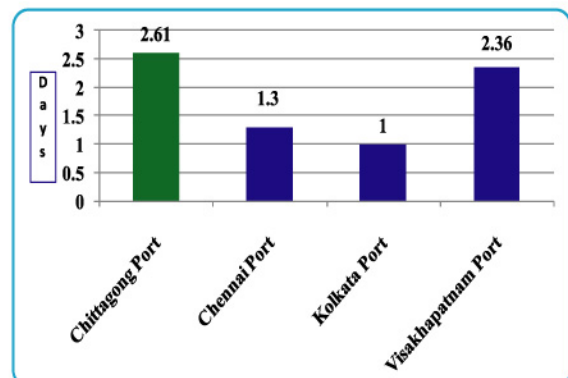
As the berthing as well as handling facilities have not increased proportionately, congestion of vessels at Chittagong port is natural. Moreover, in the past Chittagong port has earned bad names for being the most expensive and inefficient port. The main reason is abnormally long turn-around time of ships which costs the owners \$ 10,000-15,000 per day per ship. Vessel waiting time was not a result of non-availability of berthing space; rather the draft limits ship's to/from the port. Moderately, large vessels coming for Chittagong port remain at anchor near Moheskhal/ Sonadia Island and smaller lighter vessels unload cargos taking long time. Therefore, increasing port capacity would not be feasible due to draft constraint. Following figure shows increasing trend of vessel waiting time at Chittagong port which means an increase in the cost of shipping.

**Figure 5 : Vessels Waiting Time of Chittagong Port and its Trend**



Source : <http://cpa.gov.bd/portal/home>

**Figure 6 : Comparison of Vessel Waiting Time in the Region**



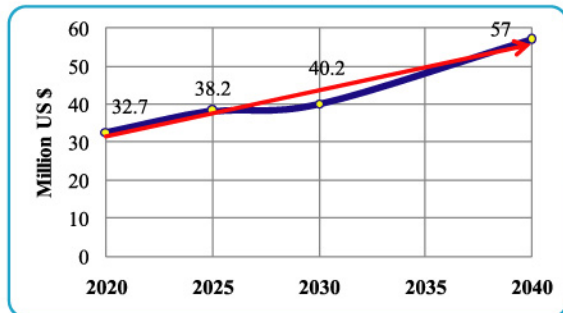
Source : Respective websites of ports accessed on 17 May 2012

Above figure shows that waiting time is the highest in our region. Therefore, the ship owners may divert their ships to other ports or impose surcharge per TEU to maximize their return. That is why ship owners imposed surcharge US\$130 per container in 2006. With the operation of DSP vessel waiting time will be reduced which would lead to cost savings as shown in following figure :





**Figure 7 : Cost Saving from Reduction of Vessels' Waiting Time (Million US \$)**

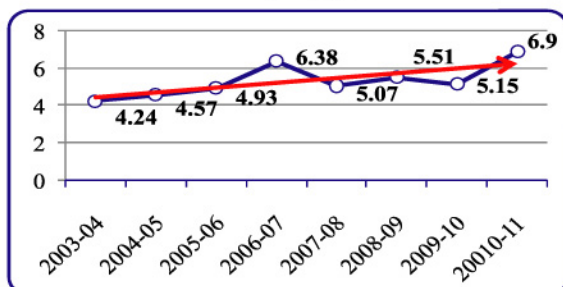


Source : PCI Japan Report Part IV, 2008 p. 2-18

### Savings from Vessel Service Time

The vessel turnaround time of Chittagong port is 6.9 days, which may be brought down to 1 day to attain international standard. By doing so, the operating cost of ship owners would further come down. Each day operating cost of 1000 TEU size container ship and 15000 tonnage cargo ships is over 10,000 US dollar (approximately). The total cost of clearing a container out of Chittagong port has been estimated to be US\$ 600 compared with US\$ 150-200 in neighbouring countries. Since 2003-04 service time or turnaround time of Chittagong port is rising (shown in following figure), the pressure on the ship owners is further intensifying.

**Figure 8 : Turnaround Time of Chittagong port**



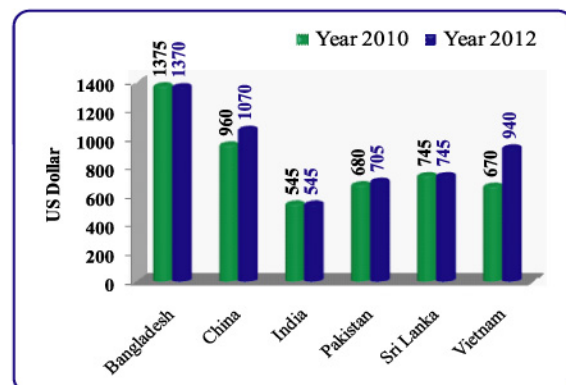
Source : <http://cpa.gov.bd> accessed on 19 October 2012.

This may shy away ship owners to divert their ships or impose further surcharge. Therefore, saving service time would be competitive edge for DSP to encourage ship owners to select DSP as their profitable destination in the region. PCI Japan has estimated that the service time savings of DSP would be equivalent to 19.1 million US dollar by 2030.

### Reducing Cost of Doing Business

Having number of natural and manmade limitation and constrains as mentioned above, shipping companies charge higher rates and the cost to the economy of higher shipping rates is quite substantial. Naturally, the cost of doing business goes high which has spill over effect throughout the businesses and economic activities. Following figure shows how regional countries take leverage from lower cost of importing a container, which would be overcome largely by DSP.

**Figure 9 : Cost of Importing a Container by Regional Countries**

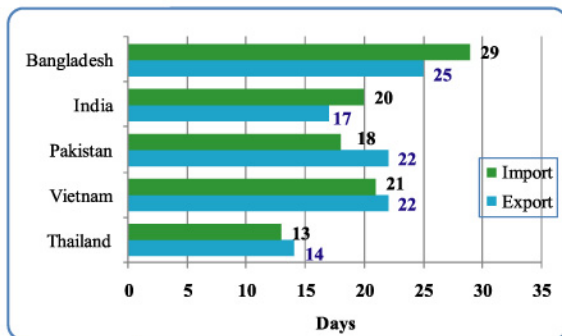


Source : <http://www.doingbusiness.org/~media>



Doing business estimates that the logistics leadtime for Bangladesh to import and export is higher than regional countries as shown below. According to USAID, a 5-day reduction in export processing time could increase Bangladesh's GDP anywhere from \$2.4 billion to \$3.8 billion annually.

**Figure 10 : Time required to import and export a container in regional countries**

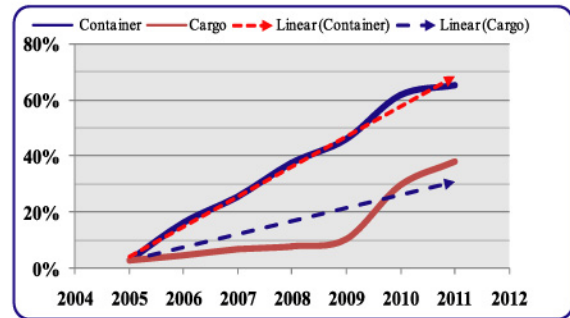


Source : Bangladesh Economic Growth Assessment by USAID, June 2010, p. 15

### Overcoming Saturation of Chittagong Ports

Presently, Chittagong port is utilising its 60% to 90% capacity with an annual growth of approximately 12%. Following figure shows that the required cargo traffic through Chittagong port will be double by next few years, whereas the capacity cannot be increased at that rate.

**Figure 11 : Cumulative growth and trend of container and cargo handling by Chittagong port**



Source : Calculated from the statistics given in CPA official website

### An Alternative Port

The closure of Chittagong port due to any unforeseen reason, either natural or war, will bring the country at the brink of economic collapse. Thus, undisturbed flow of shipping in and out of our ports is vital to the survival of the country. Since handling a negligible amount of cargo and having no rail connectivity, Mongla port would not act as viable alternative in case Chittagong port closes, whereas with more than 50% share DSP would be able to take cargo load of the country.

### Supporting Growing Economy of Bangladesh

Being in the advantageous place of cross road of Asian giants, Bangladesh has been making great successes in maintaining an impressive growth rate over the past decade. Bangladesh economy has been recording moderately accelerated growth of 5.5% to 6.5% since 1996. Bangladesh export earnings were US\$ 348 million in 1972-73 and US\$ 22.93 billion in fiscal year 2010-11 recording a growth of 6589% over the last 40 years. During next





40 years similar growth would be attained. Already, GOB targets a minimum 7% GDP growth rate in the coming years to achieve accelerated poverty reduction. Export and import level has to be achieved by our ports which will be commensurate with the required GDP growth. Therefore, it is obvious to have DSP to share additional load before it becomes impossible by hurdle prone existing ports under the threat of surpassing capacity.

### **Huge Employment Opportunity and Poverty Reduction**

Taking the burden of 150 million people with 5.1% unemployment rate, 40% under employment and 31.5% per cent below poverty line, population is considered to be the main problem of Bangladesh. As per statistics the population of our country is doubled within last 43 years and it may reach 168.3 million by 2020 requiring a huge investment to create new jobs. Employment opportunity of proposed Sonadia DSP compared to other port is encouraging. Besides, the port will also create thousands of indirect jobs in port related business like EPZs, SEZs, shipbuilding and repair facilities etc. For instance, the Hambantota DSP of Sri Lanka will create 10,000 direct and over 60,000 indirect new job opportunities.

### **Economic Boost through Cascade Effect of DSP**

Most of the manufacturing and processing industries establish their

installations at or near waterway sites to take advantage of low-cost inbound supplies and outbound delivery of finished products. With the increasing draft, size and 24 hours operation, it would surely attract investors to invest in EPZs or Free zones near the proposed DSP. Moheshkhali being isolated from the mainland has the potential to develop EPZs and IZs in large areas. Sri Lanka has built Hambantota DSP to boost economic activities and create employment opportunities in the southern part of Sri Lanka. Upcoming industries at or near Hambantota and Krishnapatnam DSP are shown below :

**Table 1 : Upcoming associated Industries around regional DSPs**

Hambantota Port (Sri Lanka)	Krishnapatnam Port (India)	Dharma Port (India)
Cement Grinding Plant	South India Edible Oils	Manufacturing Hub
Cement Storage and Bagging Plant	Emami Foods	Shipbuilding Yard
Fertilizer Storage/Processing Bagging	Adani Wilmar	Petro-chemical Industries
LP Gas Distribution Facility	Saraiwaala Agri Refineries	Gas-based Industries
Ware Housing Complex	Gemini Oils	Steel Plant
Vehicle Assembling Plant	Foods, Fats & Fertilizers	
Flour Mill		
Food Processing & Packaging		
Other Business Related to Import and Export Sector		

Source : [http://www.slpa.lk/port\\_hambantota.asp](http://www.slpa.lk/port_hambantota.asp)



## Weaknesses

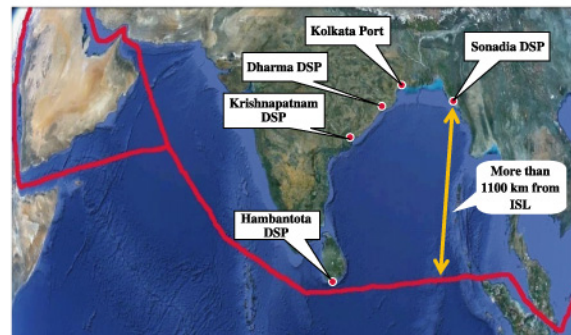
### Lack of Road Rail Connectivity to Hinterland

Lack of integrated transport network for hinterland linkage and door to door delivery of containers acts as a bottleneck in attaining expected level of efficiency of Chittagong port. The situation would be much worse for DSP as the Sonadia site is not connected to hinterland by rail and road. As per DSP plan, about 62% cargo would be carried by rail and road construction of which would be time consuming. Use of inland waterways would ease the problem initially. Deep seaports at Hambantota in Sri Lanka, Kyaukphyu in Myanmar and Krishnapatnam in India had to build rail, road and airport to connect hinterland.

### Away from International Shipping Lanes (ISL)

Considering the geographical location of Bangladesh, it is unlikely that mother vessels on Asia-Europe service routes with very tight schedules will call the new DSP. However, with increasing volume it is expected that large container carriers would call Sonadia DSP. Having similar positional disadvantage of Sonadia, the new DSP of Krishnapatnam of Andhra Pradesh at Bay of Bengal started the operation successfully since 2008 without possibilities of transit cargos. But the major part of their trade volume would be borne by local industries and businesses.

**Figure 12 : Distance of Proposed DSP from International Shipping Lanes (ISL)**



Source: Primary

### Piracy Prone Image of Chittagong Port

As per the International Maritime Bureau, reporting Chittagong is categorized as one of the piracy prone destination of the world. Many of the port users opined that although this port cannot be called as an unsafe port but the available safety margins do not generate much confidence among the users. Specially, some petty matters like pilotage factors, stealing of mooring ropes, not repairing the buoy lights, not maintaining the jetties and the mooring buoys etc always keep the users apprehensive.

## Conclusion

Chittagong being the prime seaport of the country, it suffers from a number of disadvantages like capacity of lesser length and draft of vessel, higher vessels waiting time and long turn-around time. Soon the export and import volume of the country would surpass the capacity of Chittagong port. Besides, land locked neighbouring states like Nepal, Bhutan





and Seven Sisters would also be interested to use the port. Therefore, considering the strategic location, Bangladesh has been dreaming for a hub port of the region having deep draft berths in a suitable location. Due to various reasons the well deserved port is yet to see much headway, but in the mean time neighbouring countries are building port infrastructure in Myanmar. Myanmar port, if used by India and China

profitably, then prospect of DSP as regional hub will soon be eroded. However, the importance of DSP for Bangladesh remains as vital. Conflicting interest of powerful countries should not make such a vital project hostage and sick of missing train syndrome. Therefore, we should be bold and decisive in decision making. Implementation of a road map will definitely change our long waited dream of a DSP into reality.

### BIBLIOGRAPHY

1. Osmany, Prof. Dr. Shireen Hassan, 2007, British Policy and The Port of Chittagong 1892-1912, Dhaka : University Grants Commission of Bangladesh.
2. Talley, Wayne K, Port Economics, Routledge, New York, 2009.
3. Pablo Coto-Millán, Miguel Angel Pesquera, Juan Castanedo, Springer Heidelberg (ed) Essays on Port Economics, New York, 2010.
4. Cohen P. Stephen, Emerging Power India, Oxford University Press, new Delhi, India, third Impression, 2002.
5. Year Book of Information, Chittagong Port Authority 2008.
6. Pacific Consultants International (PCI) Japan in association with AEC, Thailand, and DACON, JPZ and DEVCON, Bangladesh, Market and Business Assessment report "Techno-Economic Feasibility Study of a DSP in Bangladesh", November 2006.
7. Pacific Consultants International (PCI) Japan in association with AEC, Thailand, and DACON, JPZ and DEVCON, Bangladesh, Market and Business Assessment report "Techno-Economic Feasibility Study of a DSP in Bangladesh", Part I, IV, December 2008.
8. Pacific Consultants International (PCI) Japan in association with AEC, Thailand, and DACON, JPZ and DEVCON, Bangladesh, Market and Business Assessment report "Techno-Economic Feasibility Study of a DSP in Bangladesh", February 2009.
9. Captain Musa, Mohammad 2011, "Counter Piracy Orchestrating Response" NDC Journal Vol 10, Number 2, pp 123-138.
10. Sharif M Hossain and Ishtiaque Shelim 2006 , "Sino-Bangladesh Economic Relations : Prospects and Challenges" Biis Journal, Vol 27, Number 6, pp 338-356.
11. Manjur Alam, Mayor, Chittagong City Corporation, "Future Development Potentials of Chittagong Port in Bangladesh". The Daily Star, Dhaka, 01 July 2012.
12. Abdullah Al Mahmud, "Sonadia Deep Port, Debate over Feasibility Report Tomorrow", The Daily Star, Dhaka, 11 April 2009, online edition.
13. Bimonthly Journal, "International Affairs", volume 88 number 4 July 2012.



14. Brief on Mongla Port by Commodore M A K Azad, ndc, psc, BN, Chairman, Mongla Port Authority, 09 June 2012.
15. Lecture by Former Ambassador Humayun Kabir for AFWC on 'Contemporary USA : Changing Global Role in 21st Century- Implications for Bangladesh' on 08 August 2012.
16. Lecture by Former Ambassador Humayun Kabir for AFWC on 'Strategic Partnership and Collective Security' on 08 August 2012.
17. Interview with Mr Syed Monjurul Islam, Secretary-in-Charge, Ministry of Shipping, 15 October 2012.
18. Interview with Commodore M A K Azad, ndc, psc, BN, the Chairman, Mongla Port Authority, 09 June 2012 and 6 October 2012.
19. Interview with Commodore Jobair Ahmad, ndc, Director General, Department of Shipping, 4 October 2012.
20. Interview with Md Alamgir Khan, Director, Department of shipping, Dhaka 16 July 2012.
21. Mohammad Farid Uddin, Harbour Master, CPA.
22. Interview with Operation Officer, Colombo Port, Sri Lanka, 3 July 2012.
23. Lieutenant Commander W W M Perrera, Trincomalee Port Sri Lanka, 3 July 2012.
24. Commander Kanchana Bangoda, Sri Lankan Navy (Regarding Hambantota Port) 4 July 2012.
25. Commodore Anwar Hossain Ex Chairman Chittagong Port Authority 12 June 2012.
26. Officer-in-Charge, BN hydrographic & Oceanographic Centre, Chittagong 10 September 2012.
27. Lt Cdr Habib, BN, Senior Hydrography Officer, CPA, Chittagong 12 June 2012.
28. Mr Habib Uddin, DSP Cell At 145 New Baily Road, Dhaka (Number of times).



**Commander M Joynal Abedin, (ND), afwc, psc, BN** was commissioned in Executive Branch of Bangladesh Navy on 01 January 1993. After commission he has served in a number of BN ships and establishment including Bangladesh Coast Guard in various capacities. He has done a number of courses at home and abroad. A few of the mentionable courses are Advance Turkish Language Course in Turkey, Navigation & Direction Specialization in India, Missile Command & Tactics in BNS ISSA KHAN, Container Handling Course at CPA and MBA in Military Institute of Science and Technology (MIST). He is an alumnus of Mirpur Staff College and Armed Forces War Course of NDC. He has commanded a number of small ships including BNS DARSHAK in UN Mission in the River Nile, Sudan. Presently, he is commanding BNS GOMATI at Mongla.





# EFFECTS OF EARTHQUAKE AND MANAGEMENT IN BANGLADESH

*Lieutenant Md Halimul Harun, Engrs*

## Introduction

The occurrence of earthquake is a part of natural process in the geophysical system of the earth. During the twentieth century, more than 1000 fatal earthquakes were recorded with a cumulative loss of life estimated at 1.5-2.0 million people. In 2005 alone earthquake has tolled as many as 82,321 lives. Out of these, the most severe earthquake occurred in Northern Pakistan on October 08, 2005, where more than 79,000 people were dead, 65,208 injured and many buildings damaged. In 2009, a devastating earthquake in Haiti played havoc which caused millions of people to be homeless. Bangladesh is located near the Alpine- Himalayan earthquake belt and lies along the border of Eurasian and India-Australian plates.

Earthquake may play havoc in our country at any time. Thus we need to be up-to-date with the latest technology, views, ideas to formulate awareness training and institutional training to reduce effects of earthquake. To handle the future catastrophe like earthquake a coordinated effort by the government, Armed Forces, NGOs and international agencies are required for improving pre-disaster preparedness while simultaneously evolving a more responsive post disaster relief and rehabilitation. This paper aims at discussing the effects of earthquake and suggesting the measures to be taken in the context of our country.

## Causes of Earthquake

An earthquake (also known as a quake, tremor, temblor or seismic activity) is the result of a sudden release of energy in the earth's crust that creates seismic wave. Most earthquakes are minor tremors, while larger earthquake usually begins with slight tremors, rapidly take the form of one or more violent shocks and at the end in vibrations of gradually diminishing force called aftershock. Earthquake originates due to various reasons and it falls into two major categories i.e non-tectonic and tectonic. The natural and artificial causes of earthquake are described below :

### a. **Natural Causes of Earthquake.**

The natural causes of earthquakes may be divided into three groups. These causes along with some natural causes are discussed below :

(1) **Surface Causes.** Landslides, slips on steep coasts, dashing of sea waves are included in surface cause.

(a) **Fault.** There are three main types of faults that may cause an earthquake : normal, reverse (thrust) and strike-slip. Strike-slip faults are steep structures where the two sides of the fault slip horizontally past each other.

(b) **Landslide.** Landslides also cause a quake, but most



of those are of only local extent.

(2) **Volcanic Causes.** Volcanic eruptions produce earthquakes. Earthquakes may precede, accompany and frequently follow volcanic eruptions. They are caused by sudden violent displacement of lava within or beneath the conduit of the volcano.

(3) **Tectonic causes.** Structural disturbance resulting in the relative displacement of the parts of lithosphere is the main cause of the type of earthquake. Most of the disastrous earthquakes belong to this category and occur in areas of great faults and fractures. Earthquakes often occur on the ocean floor. This produces large sea waves known as tsunami that produces devastating effect on the coastal areas. Tectonic earthquakes are classified according to depth of origin into three types. These are as follows :

(a) Normal. Depth of origin is less than 50 kms.

(b) Intermediate. Depth of origin is in between 50 to 400 kms.

(c) Deep seated. Depth is more than 400 kms.

(4) **Earthquake Clusters.** Most of the earthquakes form part of a sequence related to each other in terms of location and time. Most earthquakes clusters consist of small tremors which cause little or no damage, but there is a

theory that earthquake can reoccur in a regular pattern.

(a) **Aftershocks.** An aftershock is an earthquake that occurs after a previous earthquake, the main shock.

(b) **Earthquake Swarms.** These are the events where a local area experiences sequence of many earthquakes striking in a relatively short period of time.

(c) **Earthquake Storms.** An earthquake storm is a recently proposed theory about earthquakes, where one triggers a series of other large earthquakes along the same plate boundary as the stress transfers along the fault system.

b. **Manmade Causes.** Earthquakes of different magnitudes may also be triggered by human activities. Human causes include the following :

(1) Excavation of mines.

(2) Detonation of explosives or nuclear weapons.

(3) Endangering the ecological balance through hill razing, unplanned urbanization and industrialization.

(4) Removal of rocks.

### Effects of Earthquake

There occur around 500000 earthquakes each year. 100000 of these can actually be felt. Minor earthquakes





occur constantly around the world in places like California and Alaska in the US as well as in Chile, Peru, Indonesia, Iran, Pakistan, Portugal, Turkey, New Zealand, Greece, Italy & Japan. If the seismic waves produced by earthquakes are more, then they cause damage. Earthquakes are measured on the Richter scale.

a. **Shaking.** Ground shaking is the vibration of the ground during an earthquake. Ground shaking is caused by body waves and surface waves. Surface waves cause the ground and subsequently a building to vibrate in a complex manner. Shaking causes more or less damage to buildings and other rigid structures. The severity of the local effects depends on the distance from the epicenter and a local geological and geomorphologic condition. Ground rupture is a visible breaking and displace. Mending of the earth's surface along the trace of fault may be of the order of several metre in the case of major earthquakes.

b. **Fires.** Earthquakes can cause fires by damaging electrical power or gas lines. In the event of rupturing and a loss of pressure, it may also become difficult to stop the spread of a fire once it has started. For example, more deaths were caused by fire than by the San Francisco Earthquake occurred in 1906.

c. **Loss of Life.** The main damage is caused to the human beings and animals. The Lisbon earthquake killed around 60000 people.

d. **Landslides.** Severe storms, earthquakes, volcanic activity, coastal wave attack and wildfires can all produce slope instability. Landslides may happen even though emergency personnel are attempting to rescue. The landslides exist in many areas and often act without seismic influence.

e. **Tsunami.** Tsunamis are long-wavelength, long-period sea waves produced by the sudden or abrupt movement of large volumes of water. Tsunamis can travel thousands of kilometres across open ocean and wreak enormous destruction on far shores hours after the earthquake that generated them. Ordinarily, subduction earthquakes under magnitude 7.5 on the Richter scale do not cause tsunamis, although some instances of this have been recorded. Most destructive tsunamis are caused by earthquakes of magnitude 7.5 or more.

f. **Soil.** Soil Liquefaction is a phenomenon whereby a saturated or partially saturated soil substantially loses strength and stiffness in response to an applied stress. Usually earthquake shaking or other sudden change in stress condition causes it to behave like a liquid. For example, in the 1964 Alaska earthquake, soil liquefaction caused many buildings to sink into the ground, eventually collapsing upon them.

g. **Floods.** A flood is an overflow of any amount of water that reaches land. Floods occur usually when the volume



of water within the waterbody, such as a river or lake, exceeds the total capacity of the formation, and as a result, some of the water flows or remains outside the normal perimeter of the body. Earthquakes may cause landslips to river dams which then collapse and cause floods.

**h. Volcanic Activity.** Earthquakes can occur either before or after volcanic activity, as earthquake swarms can show magma flowing through volcanoes.

**j. Nuclear Effect.** Due to earthquake the nuclear reactors producing energy may have serious damage. Thus it may emit radiations which will have a long term effect causing death and inability of persons etc.

**k. Other effects.** Earthquakes may lead to rockfall, forming of earthcracks, sandblows, deforming ground surface or faults. It causes damage to manmade structures, towns and cities.

### Measuring Earthquake

The vibrations produced by earthquakes are detected, recorded and measured by instruments called seismographs. The zigzag line made by a seismograph reflects the changing intensity of the vibrations by responding to the motion of the ground surface beneath the instrument. From the data expressed in seismograph, scientists can determine the time, the epicentre, the focal depth and the type of faulting of an earthquake and can estimate how much energy was released.

A quake of magnitude 2 is the smallest quake normally felt by people. Earthquakes at the richter scale of 6 or more are commonly considered major; great earthquakes have magnitude of 8 or more on the richter scale.

### Earthquakes in Bangladesh

**History.** History says that more than 100 earthquakes occurred in Bangladesh since 1990. Fifteen new epicentres have been identified in Bangladesh since January 2001. This clearly indicates an increased frequency of earthquakes.

**Vulnerability of Bangladesh.** Geographically, Bangladesh is located close to the boundary of two active plates - the Indian plate in the West and the Eurasian plate in the East and North. As a result, the country is always under a potential threat of earthquake of any magnitude at any time, which might cause catastrophic devastation.

**Causes of Earthquakes in Bangladesh.** Following may be the main causes for earthquakes in Bangladesh :

- a. Endangering the ecological balance through hill razing.
- b. Massive unplanned urbanization.
- c. Massive unplanned industrialization.
- d. Massive mining.
- e. Indiscriminate exploration of mineral resources.

**Extent of Expected Damage in Bangladesh.** The extent of damage due to earthquakes may be as follows :

- a. Fire.





- b. Collapse of buildings and structures.
- c. Disruption in telecommunication system.
- d. Changes in direction of river flow.
- e. Damage to the bridges and railways.
- f. Leakage at the gas supply line.
- g. Other effects :
  - (1) Leakage of chemical component.
  - (2) Narrowness of the roads.
  - (3) Drying up of river.
  - (4) Destruction of forests and trees.
  - (5) Death.
  - (6) Multiple injuries.

### **Present State of Preparation to Manage Earthquake Disaster**

**Present Objectives.** At present, government is working on preparing standing instructions to manage the earthquake disaster. However, in general, there is a common set of standing orders on disaster, where the objectives are given to encounter natural disasters.

**Present Management System.** There is no centralized policy or programme of the government regarding earthquake disaster management. But the government acts as the biggest insurer to help the population in distress through relief and rehabilitation programmes, loans and subsidies. However, a number of government departments and institutions are also geared up to undertake a number of actions for a successful management programme. At present, the government controls all the disaster activities through various ministries and Armed Forces Division (AFD). Disaster Management Bureau

(DMB) because of its inner quest to prepare people against earthquake threats initiated some awareness programmes in the form of workshop/seminar and publication of booklets. As such, DMB has so far carried out the following significant activities particularly relating to earthquake hazards :

- a. Organized national level workshops on earthquake participated by the experts in the field and representatives of different ministries, departments/ agencies and NGOs.
- b. Arranged meeting of the representatives and sought the list of volunteers from vulnerable areas to train their leaders.
- c. Prepared a voluminous inventory of equipment and machinery available in different organizations/ agencies, which could be used for rescue operations in the event of an earthquake emergency.
- d. Prepared a comprehensive training module on earthquake.
- e. Prepared and published a 'Handbook on Earthquake' for public awareness with UNICEF assistance.
- f. Published and distributed Bengali Calendar and leaflets depicting points for public awareness about earthquake risk.

Bangladesh Army conducted a Earthquake Disaster Management Course with the help of Fire Service and Civil Defence. The officers were trained on Medical First Responder and Collapsed



Structure Search & Rescue in the course. This course was introduced by the USA. The aim of the course was to carry out rescue operation in a collapsed structure and life saving treatment to the victims. Officers were taught practically to carry out the rescue operation and uses of various equipment. This course will enhance the efficiency of army personnel during any rescue operation.

There are some equipment which can act quickly if an earthquake occurs. These are Mobile Light Unit, Pneumatic Spade Shovel, Concrete Breaker, Ear Lifting Bag, Vibrator Marching, Personnel Locating System (LPS), Hydraulic Jack, Drilling Hammer, Long Boom Excavator, Long Boom Crane (300 tons).

**Major Resources Available in the Country.** In order to fight back the earthquake catastrophe, the available resources are Bangladesh Army, Bangladesh Navy, Bangladesh Air Force, Border Guard Bangladesh, Bangladesh Coast Guard, Bangladesh Police, Bangladesh Ansar and Village Defence Party (VDP), Fire Services and Civil Defence, Public Health Department, Roads and Highways Department, Water Development Board, Power Development Board, Gas Supply and Distribution Authority, Water and Sewerage Authority and LGED Departments etc.

### **Comprehensive Plan to Face the Catastrophe**

#### **Earthquake Management.**

Earthquake management is an organized, four-phased process by which we have to :

- a. Prepare for hazards that cannot be prevented or mitigated.
- b. Respond to emergencies that occur.
- c. Recover from emergencies to restore the community to its pre-emergency condition.
- d. Mitigate risks by reducing or eliminating damage and disruption from future disasters.

**Monitoring and Forecasting.** Due to the meager monitoring and forecasting facilities, we are yet to generate a credible prediction system. Existing equipment should be replaced by the modern survey and satellite technologies. Using satellite Remote Sensing Technology (RST) and Side Aperture Radar (SAR) for earthquake disaster early warning can be provided to the emergency management authorities with more reliable information on the casualties distribution, which is a key point in the success of disaster mitigation actions. In addition to these, we have to develop mitigation techniques and equipment.

**Post Earthquake Response.** Following are the steps to be undertaken as part of post earthquake response :

- a. Development of automatic safety shutdown system for electricity, gas, telephone and water supply system whenever the ground shaking exceeds a certain limit.
- b. Development of facilities for post earthquake search and rescue operation.





- c. Employment of local people and organizations as they are able to carry out rescue operations more quickly and effectively than outside agencies.
- d. Training of community based voluntary group who can actively participate in rescue operation just after an earthquake disaster.
- e. Preparation of contingency plans.
- f. Coordination among different interest groups who will be involved in the post earthquake rescue effort.
- g. Arrangement of emergency medical treatment facilities for injured people.

### Measures to be Taken

The inherent risk in an earthquake disaster must be ascertained. Risk assessment which comprised identification, estimation and evaluation of risk consequence may be the first step to find out the kind of problems in case of an earthquake disaster. Following measures are to be taken on disaster related to earthquakes in Bangladesh :

- a. **Establishment of Improved Prediction and Warning System.** The government should develop and install computerized seismograph network stations for rapid collection and analysis of earthquake data. A computer based earthquake prediction modeling system needs to be developed to obtain a more accurate forecast of the earthquake.
- b. **Earthquake Resistant Structures.** The BNBC-1993 is to be enacted as law and implemented as a legal

document for design and construction of all buildings. The engineers and architects should be educated and trained on earthquake engineering principles and use of building codes.

c. **Formulation of Efficient Medical Plan.** A comprehensive medical plan should be evolved to take care of the physical and psychological aspects of the victims. Quick access and evacuation of the casualties should get priority in the plan. Separate mobile medical teams need to be earmarked in each district.

d. **Awareness and Capacity Building Programmes.** General awareness programmes should be undertaken to prepare the community groups. These programmes should include simple instructions of do's and don'ts to face earthquake disaster.

e. **Earthquake Preparedness Programme.** An Earthquake Preparedness Programme may be formulated with the task of organizing emergency services and planning to mitigate earthquake damages. Emergency action plans during and after earthquake are to be prepared and may be incorporated in the overall Disaster Management Plan of DMB.

### Conclusion

Bangladesh Government has established the DMB in 1993 and also DRR which directly work under MDMR to handle any disaster. Though it involves all government agencies/departments including Army, Navy, Air Force and



NGOs but there is hardly any coordination among the organizations. The sector wise division of the earthquake prone areas among the government agencies may be a viable option to carry out the relief and rehabilitation programme where close coordination among the various organizations will always act as force multiplier. The damage resulting from an earthquake is due to the propagation of seismic wave. An earthquake of European Macro-seismic Scale (EMS) at intensity 8 in cities may lead to 65% of the existing structures to collapse.

There is serious lacking in realizing the consequence of constructing non-

engineered building and choosing inappropriate construction material and technology in the absence of a National Building Code. This has alarmingly increased non-engineered constructions in the cities and towns without paying any heed to seismic strengthening. The lifelines within the cities are also poorly planned. Strict adherence to BNBC, earthquake resistant structures and close cooperation and coordination among city administrative bodies in implementing town plans can minimize the hazards to a considerable extent. Public awareness is the key to emergency management. A continuous effort must be undertaken to build up awareness among the people through education and training.

### BIBLIOGRAPHY

1. Bangladesh National Building Code (BNBC) 1993, Prepared for Housing and Building Research Institute, Dhaka, Bangladesh.
2. Disaster Prevention and Mitigation, Volume 11, 1984. Preparedness Aspects, United Nations, New York.
3. Disaster Management in Bangladesh, Country Report 2003 - Bangladesh.
4. Frederick C. Cuny, Ed. Susan Abrahams, 1983. Disasters and Development, Oxford University Press, New York.
5. Keith Smith, Environmental Hazards-2001. Assessing Risk and Reducing Disaster-3rd Edition, Routledge Taylor & Francis Group, London and New York.
6. <http://www.earthquake.usgs.gov/eqinthenews/2005/usdyae.htm>
7. <http://www.earthquakes.bgs.ac.UK/hazard/fac1.htm>



**Lieutenant Md Halimul Harun** was commissioned on 23 June 2010 in the Corps of Engineers with 62 BMA Long Course. He served in different capacities in 7 Riverine Engineer Battalion. He performed his duty as camp commander in Chittagong Hill Tracts under Operation Uttaran. He attended Officers Weapon Courses-79 and Basic Commando Course-48 in the School of Infantry and Tactics. He also attended 37th Officers Basic Course in ECSME. It is to mention that the author was awarded with M A G OSMANY gold medal and KUDRAT-E-KHUDA gold medal from Bangladesh Military Academy. Presently, he is serving as acting Instructor Class "C" in the School of Military Engineering.





# **CHRONICLES OF SUBMARINE OPERATIONS AND SOME THOUGHTS ON ITS DEPLOYMENT STRATEGY**

Commander Jahangir Adil Samdany, (TAS), psc, BN

## **Introduction**

Submarines are fundamentally different from other warships since they operate in the underwater medium. They are able to conduct a score of missions but not all of them available in the book of naval warfare. In common understanding, submarines are classical platforms of choice for sea denial by a weaker navy where one party denies other; it is infact the ability to control a maritime area without either wishing or being able to control that himself. Throughout the history submarines have been deployed for multifarious roles and missions many of which were proved to be counterproductive to own force. This was mainly because of the conceptual and doctrinal misconception especially during the induction phase of the submarines. The submarines were never considered a principal platform of choice until they achieved the capabilities like a proper warship in 1959. However, practically they gave an edge to the commanders well before which is evidently understood from the two world wars.

This is important for us to understand as to how the submarines can best be utilized for our advantage. This paper made an endeavour to analyze the classical roles and capabilities of the submarine to initiate some thoughts on principle based on which submarines should be deployed.

## **Characteristics of Submarines**

The basic characteristics of submarines can be termed under three generalized categories. Firstly, their effectiveness in war and deterrence is highly dependent on stealth, surprise and high probability of destroying the target at first salvo. Secondly, tactical reconnaissance and target acquisition is always a problem for submarines due to their sensor limitation and requirement to achieve surprise. Finally, the most effective use of submarine force differs from classical Anglo-American concept of naval warfare i.e. sea control and destruction of enemy's naval force which is discussed in subsequent paragraphs.

## **Generic Capabilities of Submarines**

In the initial stages of their development submarines were basically used against unarmed merchant ships and for coastal defence. By the end of the 21st century submarines have acquired 6 generic capabilities of significance. These are coastal defence, naval attrition, commerce warfare, power projection ashore, fleet engagement and nuclear deterrence/assured destruction. These are also known as the six basic roles of submarines today.

## **Coastal Defence**

Submarines were given their first role of coastal defence by a few major navies



before they were ready to accomplish it. Submarines built before 1901 were mostly for experiments and training. France, Britain, USA and Russia put submarines in regular service in 1901, 1902, 1903 and 1904 respectively. Sweden acquired a small number of submarines for this role. Many others followed in 1904. These submarines had operational radii of only a few hundred miles and having no means of navigation underwater and were unsuitable for the role assigned. The first effective war fighting capable submarine came in service in 1910 which was technically a submersible torpedo boat by the Germans (U-9). It had operational radius of 1000 nm and could stay 5 days on station in assigned area. Today more than 30 navies have 3-15 modern submarines (Subs) for coastal defence.

### Naval Attrition

This is a strategy used in the early ages to wear down the enemy naval forces through gradual attrition of secondary, obsolescent and independent steaming warships. However, the submarines were not ready for the role of attacking first line warship except through chance encounters and by 'hit and hide' tactics. After a few decades, in 1930s when diesel engines were refined and fuel capabilities increased, submarines acquired seagoing capability and they became ready for the role of naval attrition. Typical submarines had range of 3200 nm on the surface at 8 kts.

Early seagoing submarines adopted two forms of naval attrition. British submarines were intended to cruise in the approaches of enemy naval bases and sink warships; famously these boats were named as 'overseas boats'. Germans also used this offensive kind of tactics as seen in World War II (WW II) as a U boat sneaked in Scapa Flow and created havoc to the stationed British Flotilla. The second form was more defensive envisioned by the French and the US Navies. In this form submarines would cruise several hundred miles and destroy as many enemy warships as possible known as 'extended coastal defence'. ASW was introduced as third form of naval attrition during 1917 when the Royal Navy decided that the primary task of submarines will be to hunt German U boats.

In this context, the surface fleet enjoyed an advantage by denying the submarines a good firing position due to speed difference. Even at a modest cruising speed the fleet was 2-3 times faster than the submerged submarines. In addition to that, the first line warships i.e. the dreadnoughts were stout in construction, had torpedo bulkheads inside and was really difficult to sink. The six dreadnoughts attacked during World War I (WW I) were operating alone at slow speed but were repaired and put into service in a matter of several weeks. Thereby, for these two reasons attrition strategy was not very successful. However, it was useful against the second line warships due to their poor construction and slow speed.





During WW II with advanced technology, the strategy was successful to some extent. In the Atlantic and the Mediterranean German U boats sank 54 first line warships including 3 carriers and 2 battleships. In the Pacific US submarines sank 62 fleet units including 5 Japanese carriers and a battleship. The Japanese sank one carrier and 9 first line ships of the US Navy. Both the US and German submarines had major contribution in attrition of the enemy but it was still the fleet engagements which was the key to sea control as seen off Midway, Guadal Canal, the Eastern Solomons and Phillipines Sea actions.

The first two types of naval attrition are still important in these days. In the Falklands war Argentina deployed its submarines at extended coastal defence role. On the other hand, the British submarines (subs) deployed in anti-fleet offensive could sink General Belgrano. In other words, these roles are still significant for superpowers to take note of while operating in the littorals. In WW I Grand fleet commanders were weary of U boats; now US fleet near Persian Gulf has to worry about Iranian small but modern submarines.

Although evolved in the WW I, the third type or hunt and kill has only evolved recently as viable option. Both German and British subs scored kill of 10% of total submarine loss of other side (18 U boats and 5 British) while the US had 15% success against Japanese submarines. The main problem for them was target detection and locating. In WW I subs had to look for each other

above water and attack since they had no underwater sensors. In WW II they used sonars but with limited range of several thousand yards under better conditions.

Today the submarines have highly sensitive and long range acoustic sensors supported by external sources especially from space and air. Therefore, it became comparatively easy to detect and localize in a common medium. Near adversary's base and under the polar ice the submarine is the best option available to destroy a ballistic missile carrying submarine. However, even with an aggressive attrition campaign, submarines will not be much effective if the detection sensors are not improved further or the submarine is externally supported.

### **Commerce Warfare**

In submarine warfare, the other type of warfare which predominantly emerges in our mind is commerce warfare. This is directed to the state itself rather than its armed forces. In both the WW, this strategy was used by the Germans, and by the US in the WW II. However, in the WW I Germany with her 176 U boats could not achieve much success due to the need for sinking huge amount of tonnage per month. Secondly, due to the fact that the old type of submarines were more vulnerable to mines, guns and ramming in addition to depth charges. Finally, the success of convoying and rerouting made the task of submarines more difficult.

During WW II, the German campaign popularly known as 'Tonnage Warfare' was conducted in 6 different phases each



using different tactics redesigned based on allied countermeasures. U boats were able to sink 14 million tons which was 17% of the shipping available to the allied; vis-à-vis out of 1771 subs built between 1935 to 1945, 784 were lost, 593 to allied ASW effort, as claimed. However, during the campaign the Germans brought the British almost to their knees by limiting their essential supplies.

In the Pacific the US submarines achieved considerable success by destroying about 50% of the total tonnage available to Japan in 1942 (OP STARVATION). The Japanese admirals believed in decisive battle and, therefore, not much effort was given to build escort ships. Until 1942 the navy had no ships assigned for escort duties. Resultantly, the US lost only 31 submarines to Japanese ASW.

The Japanese submarines in contrast did not have mentionable success against the US or allied shipping. Here, noteworthy to mention that Japanese doctrine before WW II was to engage submarines against major warships. A series of exercise was conducted which demonstrated the weaknesses of the doctrine, especially the great difficulty in acquiring and holding targets, yet the lesson was ignored. It only indicates that the doctrine should be tested and practised with alternative thinking and continuously be modified if needed.

The fundamental objective of both Atlantic and Pacific Campaign of submarines was to sink merchant ships and, if possible, avoid engaging the

adversary's naval force. The submarines were dispersed strategically to cover wide area and crossed by major shipping routes. The 'wolf pack' tactics which was used by both Germans and the US was only a tactical concentration. Therefore, strategic dispersal was the key to success for them. The following table shows a comparison of submarine operations as part of commerce warfare in both the WW :

	Germany vs Britain 1914-1918	Germany vs Britain 1939-1945	US vs Japan 1941-1945
<b>Submarines</b>			
In Commission	374	1171	311
Lost	178	784	48
Lost to ASW	134	593	31
<b>Merchant Shipping</b>			
<b>Tonnage available (Millions)</b>			
Before War	43.1	41.4	6.0
Built during War	10.8	42.5	3.3
<b>Tonnage Sunk (millions)</b>			
By Submarines	11.2	14.7	4.9
By others	1.7	5.9	2.9
<b>Loss %</b>			
Submarine Force	47.6	67.0	15.4
Merchant Fleet to sub	19.9	17.4	48.5

**Table 1 : Commerce Warfare Statistics from WW I and WW II**

This table shows that both the Germans and the US had considerable success in commerce warfare during the two campaigns. On the other hand, the German losses of submarines during the end of WW II principally credited to the superior ASW strategy by the allied forces and breaking of the German codes. Today submarines are more capable than earlier days but they can't be built over night. However, in commerce warfare





numbers are as important as capabilities. On the other hand, the same effect can be achieved through a blockade by a superior force and long range missiles.

### **The Projection of Power Ashore**

This capability refers to the ability of naval forces to strike targets inland with manned aircraft or guided missiles and the ability to conduct amphibious operations. Submarines acquired this capability of striking a few hundred miles inland in 1957 when they were fitted with cruise missiles. On the land since the targets are fixed, submarines can launch their missiles without much active guidance and retire quietly while pre-programmed or inertial guidance take the missiles to their targets. Nowadays the size of the missile is smaller like a torpedo which can be carried in more numbers and fired while remaining underwater. The guidance system and kill potential are also enhanced. During Falklands War in 1982 the nuclear powered fleet submarines of the British force provided cover for the carrier and the amphibious task groups.

### **Fleet Engagement**

It was a long sought dream for submarine designers and planners to use them as part of fleet or against first line battle fleet. The very name of German subs of WW I 'Fleet Submarines' (Flotten-Uboote) indicates their intention to use them for this purpose. However, the major limitation of these boats was the speed. The first nuclear powered sub USS Nautilus acquired submerged speed 20-25 kts for weeks and top speed of 30 kts.

Until then the only anti-ship weapon was torpedoes. In 1961 the Soviet Navy equipped her subs with anti-ship missile SS-N-3 or 'Shaddock'. The US Navy followed with Anti Submarine Rockets (ASROCs). However, to engage from a shorter range was also important which needed the parallel development of stealthy features of the subs. Using their high transit speed submarines can be despatched covertly ahead of main formation into the theatre to pose threat to enemy surface fleet and submarines and shore targets and tie down their considerable amount of force. For example, in the Falklands war British subs were utilized in the same manner.

Conversely, after addition of all the capabilities, parallel developments of ASW did not allow the submarines to have a decisive battle against the fleet. Nevertheless, although having the capabilities many navies never used their submarines with the naval fleet.

### **Assured Destruction/Nuclear Deterrence**

With ballistic missile launching capability and nuclear warhead delivery systems, the submarines acquired their last capability to create nuclear deterrence through assured destruction. This became a safe means of creating deterrence keeping the risk of a nuclear war below the threshold level. It also helped to fulfil the 'nuclear triad' (An assured destruction capability). Envisioned by the Soviet Admiral Gorshkov all the nuclear powers immediately started to develop their capability to have nuclear warheads underwater safe and in unknown places.



In 1967 with 27 of the 41 Polaris SSBNs (Nuclear Powered Ballistic Missile Submarine) of USA could alone deliver 400 megaton equivalents nuclear warhead which was enough to cause considerable damage to the USSR.

### **Purposeful Employment of a Submarine**

Submarines can be used for several purposes and missions. However, important aspect of its operational success throughout the history of warfare was hinged on stealth and surprise. During the 1971 war one single PNS Ghazi (Pakistan Navy Submarine) kept INS VIKRANT, the Indian Aircraft Carrier, off the coast of Bangladesh till it (Ghazi) was sunk. Argentine Cruiser General Belgrano in the Falklands war of 1982 suffered its ill fate from a British submarine by an unexpected move.

The submarines are good as hunter and in hit and run tactics in attrition warfare and as platforms of single salvo strike at shore. They are not successful at missions where they need prolonged exposure and capability of sustained defence, such as sea control, naval presence or projection of power where series of salvos are required to be delivered. They are most effective resource for a navy to circumvent classical battle and engage in direct anti-state war.

There had been many attempts by the advanced navies, including the US Navy, to combine the role and mission of submarine with those of surface fleet. Although for many years with all their inherent capabilities submarines are

considered as good as a surface fleet but it is seen that their problems and success are attached with the quality of their separateness. They operate best in isolation which is opposite to any classical model of naval warfare. Nevertheless, submarines are not an alternative but a parallel force multiplier to the traditional instrument of naval power.

It can be seen from the history that the submarines when not ready or equipped for a particular mission it cannot be assigned with the mission of that magnitude. The capability of the submarine thus should conform to its performance in the assigned mission. A submarine, big or small, conventional or nuclear, had some strategic implication on the war they fought. Therefore, submarines are basically strategic platforms and they should be used only for strategic gain. When submarine strategies and force structures are developed in this context, they can contribute even more effectively to the exercise of naval power in the future.

### **Conclusion**

The difficulty in detection and the ability to deliver a surprise attack has made the submarines potent war machines which can change the face of the war. During their 110 years of service, they have been tested in various ways with different roles and mission. Many a time they were not ready or equipped to do so. Even after they acquired the capability to perform those missions like other warships, it was seen that they are best suited for other missions which do not conform with





classical naval warfare concept. They are never alternative to a warship rather a parallel instrument of war fighting. Although the number of submarine had been important for many campaigns, yet

it can create considerable pressure on the enemy ASW platforms. A country can always look for strategic gain from the use of a submarine and that is exactly how it gives her optimum performance.

### BIBLIOGRAPHY

1. Command of the Sea, Clark G Reynolds, Internet Edition.
2. The submarine in Naval Warfare 1901-2001, Karl Lautenschlager, International Security, vol 11, No 3 (Winter 1986-1987).
3. Commodore Naveed, PN (retd), Lecture on Submarine Warfare in Pakistan Navy War College, PNWC 2011-2012.
4. Harvey, Jhon Rear Admiral RN, Submarines, London : Brassey's (UK) Ltd, 1994. Hamlin A Caldwell, Using and Fighting Submarines, Proceedings, August 1984, The US Naval War College Study Material, 1992.
5. Izzak Zulkarnen, Littoral Warfare : A Shift in Naval Operation for both Small and Large Naval Forces, ADJ, March 2002.
6. Till, Geffrey, Can Small Navies Stay Afloat?, Jane's Navy International, May 2003.
7. Submarine Warfare Précis, Pakistan Navy War College.
8. Submarine Warfare Precs, DSCSC, Mirpur, Dhaka.
9. Alain C Enthoven, How Much is Enough? Shaping the Defence Program, 1961-69, (NY, Harper and Row, 1971), pp 174-178.
10. The British Maritime Doctrine.
11. The Indian Maritime Doctrine.
12. Joint Op Warfare, Milan N Vego, Vol 1.



**Commander Jahangir Adil Samdany, (TAS), psc, BN** was commissioned on 01 January 1993 in the Executive Branch of Bangladesh Navy. He did his specialization course in Torpedo and Anti-submarine from Anti-Submarine Warfare School, Kochin, India. He did his Staff Course from Defence Services Command and Staff College, Mirpur, Dhaka and from Navy War College, Lahore, Pakistan. He served in various ships and establishments in different capacities including Commanding Officer of small naval ships, Staff Officer at Naval Headquarters and Instructor at Bangladesh Naval Academy. Presently, he is serving as the Squadron Commander of Missile Boat Squadron at Chittagong.



## **LOGISTICS CHALLENGES FOR UN PEACEKEEPING MISSION ENVIRONMENT**

*Wing Commander Md Moniruzzaman Kashemi, psc*

### **Introduction**

I joined Bangladesh Air Force (BAF) in 1990. At that time the term 'UN Peacekeeping Mission' was hardly familiar to us. Although some of our senior officers started to participate in some observer missions but I had a very indistinct idea about UN mission. My view on mission participation and economic perspective vis-a-vis the contribution of our force to world peace has been changed after my tour of duty in Democratic Republic of Congo (DRC). The most familiar words in the UN mission area are logistics base and the logistics officer. I believe all the personnel who did mission will agree with me. Being a logistics officer, I got the scope to see and understand the importance of logistics support in UN peacekeeping mission. In fact, the most important task to me for operating troops in UN mission is logistics challenge. So, in my topic at first I shall try to focus on the terms 'self- sustainment' and 'UN provided basic logisticss'. Then challenges will be discussed for the future peacekeepers.

### **Self-Sustainment**

The contingents that operate troops in the mission area are to be self-sustained. It means that contingents are to bring their requirement for sustainability in mission area from home country at their own. BANAIR, BANBAT or any other

contingents of Bangladesh operate at places like DRC or in some other parts of the world which are thousand miles away from home. Providing support away from home country for self-sustained categories is really a challenge. The challenges increase further because of lack of infrastructure, limited drivable roads, absence of regular transportation chain and severe weather conditions in the mission area.

### **UN Owned Equipment/Items (UNOE)**

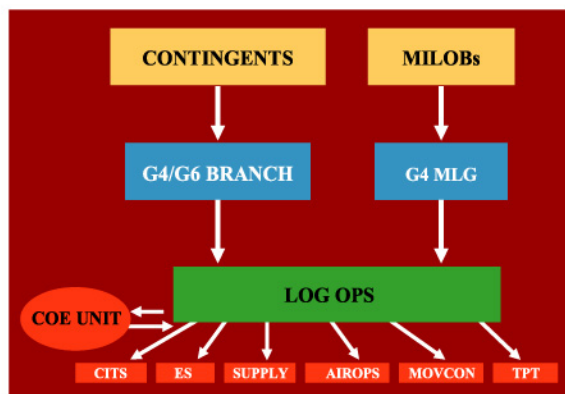
The UN normally provides the basic logisticss such as food, accommodation, fuel and water on a regular basis to the contingents of the troops contributing countries. In mission area the UN also provides air conditioners, cooking items, communication items, office equipment etc which are commonly known as UN owned equipment/items (UNOE). A logistics officer is normally the custodian of all UNOE issued to the contingent. UN also supports the subsequent maintenance for all of the UN provided items. A logistics officer must have thorough knowledge on channel of support request. He must have clear understanding about the UN support organizations.

**Channel of Support Request.** The channel for support request is as follows :



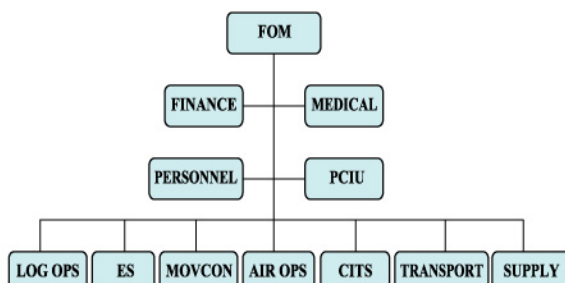


### Channel of Support Request



**UN Support Organizations.** In each region, there is an FOM who is the final authority for any form of administrative or logisticss support to be given to the contingents. The units under FOM are shown below :

### Units under FOM



The contingent's logistics officer usually everyday comes across the above sections for various support purposes. The logistics officer must know some details of the above sections for obtaining support. The understanding on the activities of the above sections will help the logistics officer for accurate persuasion and optimum utilization of UN assets. To know the salient role and tasks of the above some sections are discussed in the subsequent paragraphs

for better understanding of the future logistics officer.

### Logistics Operations (Log Ops).

This section acts as a focal point for all logistics and administrative requirements of field office elements. The section coordinates logisticss support between civilian and military components on behalf and as directed by FOM. Logistics Ops screens all requests for logisticss and adminstrative support. They ensure effective use of UNOE and Contingent Owned Equipment (COE) assets and coordinate all logisticss related air support.

### Engineering Support (ES).

This section has several units like accommodation, air conditioning, generator, construction, water, electrical, etc. ES is the final implementing agency for approved job request in respect of repair/maintenance and for providing material support for all engineering range. They arrange water source for main contingents. The functions and extent of support of this section are strictly guided by the Memorandum of Understanding (MOU) of the respective contingents. Some details of the subsections are described below :

**Accommodation.** UN normally provides accommodation to the contingent after 6 months of deployment to mission area. UN pays for per troop to the Troops Contributing Countries (TCC) or as per agreed MOU. Accommodation could be renovated to hard wall building, prefab accommodation modules or weather haven tents.

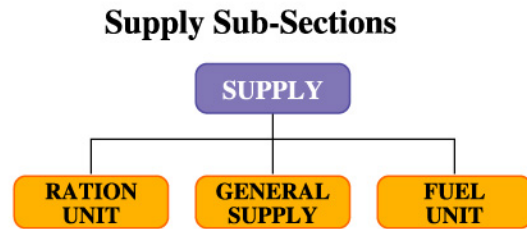


**Electricity Supply.** ES provides power to contingents which are not self-sustained in electricity. Contingents which are self-sustained in power generation provide their own electricity through their COE generators.

**Air Conditioning.** The UN troops mostly operate in unfriendly environment. In some places temperatures fluctuate sharply during day and night. UN provides air conditioners in most of the places for the contingent. The subsequent maintenance support is also the responsibility of the UN. Timely and prompt support depends on the personal relation of contingent's logistics staff with the personnel of air conditioning section.

**Movement Control (MOVCON).** This section consists of passenger and cargo units. A logistics officer has to have good understanding on cargo movement request (CMR) procedure. The CMR form is required for movement of COE items/empty in the mission area. The logistics officer can learn the procedure for COE re-supply from TCC into mission area from the MOVCON staff.

**Supply Section.** Another important section in the logistics base is the supply which consists of Fuel Unit, General Supply and Ration Unit. The logistics officer and/or the food officer must know in details these sub-sections as contingent's survival greatly depends on the support functions of these sub-sections. Some details are discussed below :



**Ration Supply.** Ration is supplied to the contingent by the UN employed contractor from the nearby warehouse of the contractor. Rations are collected, and stored under contingent arrangement. Contingents must have sufficient refrigerator for storing perishables. These all are done as per MOU of the deployed contingents. Normally, ration requisition is to be submitted to mission HQ at least 100 days ahead. Logistics/food officer must have a thorough knowledge on policy of demand, storage and consumption. He should also have complete understanding on the policies of Meal Ready to Eat (MRE) and bottled water.

**Fuel Supply.** Fuel supply includes both aviation fuel and mechanical transport fuel. Normally, in any type of mission, UN undertakes the responsibility of fuel supply up to some nodal point from where the contingents collect at their own responsibility. UN arranges aviation fuel supply Jet A-1 at airport or adjacent to the airport. UN also supplies oil and lubricants to the deployed units. In case of inability of supply of any products the UN provides reimbursement for that particular product. So, the contingent logistics officer must ensure reimbursement for any such inability.





**General Supply.** This section deals with UN clothing items such as scarf, shoulder badges, beret, cap etc. This section also issues medals, certificates, numeral and UN flags. Life of the UN provided items is of 06 months and, normally, those are issued twice in a year. Supply requests are to be made on UN specified form through G-4 and logistics ops.

**CITS.** Communication and Information Technology Section (CITS) consists of voice communication, data communication and mail & pouch section. Voice communication subsection deals with all sorts of land line telephone, HF & VHF communication etc. Data communication section looks after the internet connection. UN provides mail assistance through mail/pouch office of CITS. Outgoing and incoming mails are sent or received through DHL or other services through the mail and pouch office. CITS provides all technical operation and maintenance support for all UN provided CITS items.

### **Logistics Challenges**

**Use of UNOE.** Life in mission area for the contingent's personnel would be very difficult without the UN provided items. All the UNOE are high value items. For any loss or damage to those items, the contingent is liable to provide compensation. As such, adequate care is to be taken for all UNOE given to the contingents for use. In a region of each mission, there is a Property Control and

Inventory Unit (PCIU). Representative of the PCIU conducts the quarterly physical inspection on all UN provided assets for which contingent logistics officer is to be prepared. Repair of UNOE is the responsibility of the concerned UN section that has the requisite skilled manpower for the same. It is always better not to try to repair the UN asset by any member of the contingents. It is also mandatory not to shift any of the UNOE from the designated place.

**Minor Engineering.** The definition of minor engineering in the MOU includes servicing of generators, carpentry, civil and electrical works. To carry out such jobs, the contingent should have the required tools and accessories. The greyest area in the MOU is the minor engineering as definition and explanation are not precise and specific. Due to that the UN staff especially in the ES range most of the time try to discourage the job request referring to the minor engineering. The logistics officer must read the MOU very carefully and negotiate smartly to get the job done through UN resources.

**COE Inspection.** COE unit is the agency responsible for monitoring compliance of the contingents to the agreed MOU for mission. It usually carries out a quarterly inspection of the contingents to ensure that the agreed personnel and equipment in the mission area are available and serviceable. The major inspection for which the contingent is to be prepared and should take all out effort is the COE inspection. Reimbursement of cost for COE



items/equipment depends on the COE inspection report. Contingent commander and all members must take necessary preparation well in time to face the COE team. The commander and the logistics officer must go through the MOU and the last inspection report very carefully to face the COE team. The contingent's home country, like Air HQ for BANAIR, is to be informed in case of any major point raised by the COE team.

**Re-supply from Home Country.** The contingents carry their major items/equipment as per MOU in mission area while in initial deployment. Subsequently, the contingents are required to re-supply spares for major equipment and self-sustained items such as stationeries, toners, cartridge, papers, tools etc for which the contingents get reimbursement. Contingents are responsible for re-supply of the above items from home country or from country sources. The contingents mostly utilize the troops' rotation flights for such re-supply. In case of bulk re-supply the home country may need to send the items to the deployed place by hiring civil aircraft or under UN arrangement. Sometimes the items are shipped to some prime locations of mission area from where the items are airlifted to deployed location by UN flight. So, the boxes/bundles of such consignments must not be oversized and should be easily accessible inside the UN aircraft/helicopter. The shipment must be based on the MOU between TCC and UN headquarters. The contingent should hand over all the shipping documents at least

10 days prior to the arrival of shipment to the MOVCON Office.

**Incoming and Outgoing Logistics Officer.** The outgoing logistics officer of the contingent becomes familiar with the UN system after staying some period. He has great responsibility to share his experience with incoming logistics staff. Outgoing contingent must carefully estimate the future requirement for the incoming contingent well in time. Outgoing logistics staff should physically accompany the incoming logistics officer to different sections and offices of the UN and introduce with UN staff. Outgoing logistics officer must update and prepare the list of all UNOE and must handover the items to the incoming officer both documentarily and physically. The handing/taking over document of the UNOE must then be updated in the computer of PCIU. The incoming contingent should also prepare the handing/taking over book of all COE items which is to be finally signed by the incoming and outgoing contingent commanders, and a copy of the same is to be forwarded to home country headquarters for retention.

### Conclusion

A person going for UN peacekeeping mission should be proud enough as he is directly contributing to world peace. The participation under any peacekeeping mission brings great honour and respect for both individual and for the nation. The nations participating for peace are mostly from third world countries.





Economic perspective from mission participation for these countries is highly beneficial in comparison to other manpower export sector. The countries where the peacekeepers are deployed are also poor and lagging from some very basic infrastructures - communication, law and orders, power shortage, availability of required goods etc. As such, establishing peace through UN in those countries is very expensive as many

multi lateral aspects are involved in each mission. Operating troops under such circumstances are really a big challenge and the challenges can greatly be minimized through careful planning, timely provisioning, understanding of memorandum, mutual cooperation etc. The commander and the logistics officer are equally responsible for economic participation in the mission as logistics cannot be separated from the operations.

### BIBLIOGRAPHY

1. Admin & logistics Presentation for Arriving Contingents - Ituri Division of DRC.
2. MOU for BANAIR under MONUC at DR Congo.



**Wing Commander Md Moniruzzaman Kashemi, psc** was commissioned on 03 July 1991 in the Logistics Branch of Bangladesh Air Force. He did his Basic Logistics Course from OTS, BAF. He did Advanced Logistics Course from India and Logistics Readiness Course from the USA. He attended several courses and seminars both at home and abroad. He is a Mirpurian and got Master in Defence Studies (MDS) from National University. He served in different bases, units, Air HQ and Directorate General of Defence Purchase (DGDP). He also served as logistics officer of BANAIR-5 in Congo under MONUC. Presently, he is serving as Deputy Director in DGDP.



# আলোকচিত্রে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী





## ফিরে দেখা



বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমির পাসিং আউট প্যারেডে অন্যান্য কর্মকর্তাদের মাঝে জাতির  
পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



১৯৯৯ সালের ২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমিতে রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে শ্রেষ্ঠ ক্যাডেটকে  
'সোর্ড অব অনার' প্রদান করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা





১৯৭৪ সালের ১০ ডিসেম্বর বানোঁজা ঈসা খান ঘাঁটি উদ্বোধন অনুষ্ঠানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



বাংলাদেশ নৌবাহিনীর নিকট ঐতিহ্যবাহী জাহাজ নির্মাণ প্রতিষ্ঠান খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড  
হস্তান্তর শেষে মোনাজাত করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা





১৯৭৩ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর বিমান বাহিনী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে খন্দকার



২০০১ সালের ৪ এপ্রিল বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর এয়ার কমান্ড অপারেশন সেন্টার উদ্বোধন শেষে মোনাজাত করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা





## সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ



রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণের পর সশস্ত্র বাহিনীর গার্ড অব অনার গ্রহণ করছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি



রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণের পর শিখা অনিবার্ণে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি





সশস্ত্র বাহিনী দিবস ২০১২ উপলক্ষে মহান মুক্তিযুদ্ধে খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী



সশস্ত্র বাহিনী দিবস ২০১২ উপলক্ষে সেনাকুঞ্জে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের সাথে কুশল বিনিময় করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী





আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষী দিবস ২০১৩ উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী



আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষী দিবস ২০১৩ উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত পিসকিপার্স রানে অংশগ্রহণরত সদস্যবৃন্দ





সশস্ত্র বাহিনী আয়োজিত ইফতার ২০১৩ অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী



মহান বিজয় দিবস ২০১২ উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে স্মারক চিহ্ন পরিয়ে দেয়া হচ্ছে





সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ পরিদর্শনকালে জিওসি-ইন-ইস্টার্ন কমান্ড, ইন্ডিয়া এর সাথে  
পিএসও, এএফডি ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ



সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত ডিজাস্টার রেসপন্স এক্সারসাইজ এন্ড এক্সচেঞ্জ ২০১৩ এ  
প্রশিক্ষণ এলাকা পরিদর্শন করছেন পিএসও, এএফডি





সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ পরিদর্শনকালে USG, DFS of UN HQ Ms Ameerah Haq  
এর সাথে পিএসও, এএফডি ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ



সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ পরিদর্শনকালে পিএসও, এএফডির সাথে আর্মড ফোর্সেস ওয়ার কোর্সের কর্মকর্তাবৃন্দ





## সেনাবাহিনী



নবনিযুক্ত মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে সেনাবাহিনী প্রধানের সৌজন্য সাক্ষাৎ



পিজিআর এর ৩৮তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দের মাঝে মহামান্য রাষ্ট্রপতি





হাতিরঝিল সমন্বিত প্রকল্প উদ্বোধনের পর মোনাজাত করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী



রুমা সেতু উদ্বোধনের পর মোনাজাত করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী





সেনাবাহিনীর জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী



সমর সরঞ্জাম (এমবিটি-২০০০) হস্তান্তর উপলক্ষে আয়োজিত কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী





পুনর্নির্মিত রাম কেন্দ্রীয় সীমা বিহার উদ্বোধন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী



বান্দরবান রিজিয়নের নীলগিরি রিসোর্ট পরিদর্শনকালে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিল্পীদের সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী





১৭ পদাতিক ডিভিশনের পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মাঝে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী



জিল্লুর রহমান ফ্লাইওভার আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী





বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমির ৬৭তম দীর্ঘমেয়াদি এবং ৩৮তম বিশেষ কোর্সের ক্যাডেটদের কমিশন  
প্রাপ্তি উপলক্ষে কেক কাটছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী



পিজিআর এর ৩৮তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে শহিদ পরিবারের সদস্যদের অনুদান প্রদান করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী





পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবান জেলায় থানচি সেতু উদ্বোধন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী



১৯ কম্পোজিট ব্রিগেডের পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মাঝে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী





ইঞ্জিনিয়ার্স ৫ম কোর পুনর্মিলনী কুচকাওয়াজ ২০১২ অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মাঝে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী



সশস্ত্র বাহিনী দিবস ২০১২ উদযাপন উপলক্ষে ঘাটাইল এরিয়া কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে কেক কাটছেন  
মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ও খাদ্যমন্ত্রী





আর্মি এভিয়েশনে নব সংযোজিত হেলিকপ্টারের কমিশনিং করছেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী



৯৯ কম্পোজিট ব্রিগেডের অধীন ৩৩ বীরের পতাকা উত্তোলন করছেন সেনাবাহিনী প্রধান





সেনাবাহিনী প্রধানকে 'কর্ণেল অব দ্য রেজিমেন্ট' এর র‍্যাংক ব্যাজ পরিয়ে দেয়া হচ্ছে



সেনাবাহিনী প্রধান এবং সেনাসদরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের সাথে ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান ও তাঁর সফর সঙ্গীগণ





কুমিল্লা সেনানিবাসের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন সেনাবাহিনী প্রধান



সাভার সেনানিবাসের শীতকালীন যৌথ প্রশিক্ষণ পরিদর্শন করছেন সেনাবাহিনী প্রধান





ক্যাডেট কলেজসমূহের জন্য ওয়েবসাইট উদ্বোধন করছেন সেনাবাহিনী প্রধান



ইন্টেলিজেন্স ফিউশন কোর্স-১ এ অংশগ্রহণকারীগণের সঙ্গে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর  
চীফ অব জেনারেল স্টাফ





কোর অব মিলিটারি পুলিশ (সিএমপি) এর বাৎসরিক অধিনায়ক সম্মেলনে যোগদানকারীগণের সাথে কর্নেল কমান্ড্যান্ট



বিএসডি, ঢাকার বাৎসরিক যুদ্ধোপযুক্ততা পরিদর্শন করছেন তৎকালীন এরিয়া কমান্ডার, লজিস্টিক্স এরিয়া





মহান বিজয় দিবস প্যারেড ২০১২ শেষে প্যারেড অধিনায়ক জিওসি, ৯ পদাতিক ডিভিশন ও  
এরিয়া কমান্ডার, সাভার এরিয়াকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন সেনাবাহিনী প্রধান



এএমসিসিএন্ডএস এর কোয়ার্টার গার্ড পরিদর্শন করছেন সামরিক চিকিৎসা সার্ভিস মহাপরিদপ্তরের মহাপরিচালক





স্পেশাল অপারেশন কোম্পানির প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে মতবিনিময় করছেন জিওসি, ৬৬ পদাতিক  
ডিভিশন ও এরিয়া কমান্ডার, রংপুর এরিয়া



আন্তঃইউনিট ফায়ারিং প্রতিযোগিতা ২০১৩ এ চ্যাম্পিয়ন ইউনিটকে ট্রফি প্রদান করছেন জিওসি, ১১ পদাতিক  
ডিভিশন ও এরিয়া কমান্ডার, বগুড়া এরিয়া





বাৎসরিক যুদ্ধোপযুক্ততা পরিদর্শন উপলক্ষে সাজোয়া ইউনিটের উপযুক্ততা পরিদর্শন করছেন  
জিওসি, ১৯ পদাতিক ডিভিশন ও এরিয়া কমান্ডার, ঘাটাইল এরিয়া



আন্তঃইউনিট ফায়ারিং প্রতিযোগিতা ২০১৩ এর চ্যাম্পিয়ন ইউনিটকে ট্রফি প্রদান করছেন  
জিওসি, ২৪ পদাতিক ডিভিশন ও এরিয়া কমান্ডার, চট্টগ্রাম এরিয়া





আন্তঃইউনিট ড্রিল প্রতিযোগিতা ২০১২ এ চ্যাম্পিয়ন দলকে ট্রফি প্রদান করছেন তৎকালীন  
জিওসি, ৫৫ পদাতিক ডিভিশন ও এরিয়া কমান্ডার, যশোর এরিয়া



বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অন্যান্য সেনাসদস্যদের সাথে ক্যাপ্টেন জান্নাতুল ফেরদৌস কর্তৃক বিমান হতে  
প্যারাসুট-জাম্প দেয়ার পূর্বমুহূর্তের একটি দৃশ্য





পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী এলাকায় টহলরত সেনাসদস্যগণ



বাধা অতিক্রম করছেন কমান্ডো প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণরত প্রশিক্ষণার্থীগণ





গ্রীষ্মকালীন প্রশিক্ষণ ২০১৩ এর প্রশিক্ষণ এলাকায় অপারেশন সংক্রান্ত ব্রিফিং শুনছেন  
অংশগ্রহণকারী সেনাসদস্যগণ



কমান্ডো প্রশিক্ষণার্থীগণ কর্তৃক বাধা অতিক্রমের একটি দৃশ্য





জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ী এলাকায় বাঁধ রক্ষায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন সেনাসদস্যগণ



আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা মিশনে আত্মোৎসর্গকারী সেনাসদস্যদের সম্মান প্রদর্শন করছেন সেনাবাহিনীর সদস্যবৃন্দ





সাভার রানা প্লাজার উদ্ধার কাজে অন্যান্যদের সাথে সেনাবাহিনীর সদস্যগণ



সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে ক্ষতিগ্রস্ত বৌদ্ধ মন্দির পুনঃনির্মাণ প্রকল্পে (রামু ও উখিয়া)  
সংস্কারকৃত একটি রাখাইন বৌদ্ধ বিহার





সেনা পরিবার কল্যাণ সমিতি, ঢাকা অঞ্চল পরিদর্শনকালে পৃষ্ঠপোষক বেগম তহমিনা করিম ও বিভিন্ন ক্লাব সভানেত্রীদের সাথে ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধানের পত্নী মিসেস সুরজিত কাউর



সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শিল্পী ও অন্যান্য সদস্যদের মাঝে সেনা পরিবার কল্যাণ সমিতির পৃষ্ঠপোষক বেগম তহমিনা করিম





## নৌবাহিনী



বঙ্গভবনে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি মোঃ জিল্লুর রহমান এর সাথে নৌবাহিনী প্রধানের সৌজন্য সাক্ষাৎ



বঙ্গভবনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ এর সাথে নৌবাহিনী প্রধানের সৌজন্য সাক্ষাৎ





গণভবনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে নৌবাহিনী প্রধানের সৌজন্য সাক্ষাৎ



সমুদ্র এলাকায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, সমুদ্র সম্পদ ও নৌ চলাচলে নিরাপত্তা রক্ষায় অনবদ্য অবদানের জন্য বানৌজা বঙ্গবন্ধুকে সম্মানসূচক ‘ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড’ প্রদান করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী





বানৌজা বঙ্গবন্ধুকে ‘ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড’ প্রদান, বানৌজা নির্মূল, দুর্জয় ও সুরমা এর কমিশনিং অনুষ্ঠানে কেক কাটছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

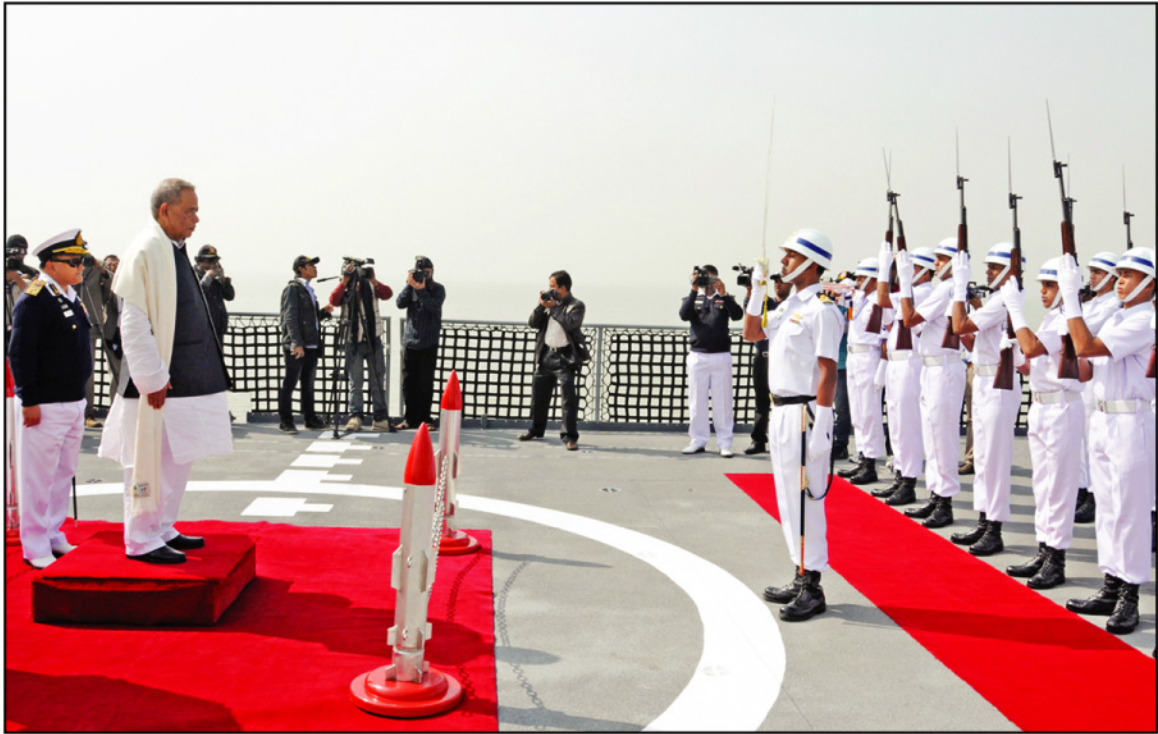


বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে মেরিটাইম পেট্রোল এয়ারক্রাফট সংযোজন অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মাঝে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী





মেরিটাইম পেট্রল এয়ারক্রাফট এর পাইলটদের সাথে কুশল বিনিময় করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী



নৌবাহিনীর বাৎসরিক সমুদ্র মহড়া ২০১৩ উপলক্ষে সুসজ্জিত গার্ড কর্তৃক সশস্ত্র সালাম গ্রহণ করছেন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী





মিডশিপম্যান গ্র্যাজুয়েশন প্যারেডে কৃতি মিডশিপম্যানকে ট্রফি প্রদান করছেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি  
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মেজর জেনারেল তারিক আহমেদ সিদ্দিক (অবঃ)



পূর্ববর্তী নৌবাহিনী প্রধানের নিকট হতে দায়িত্বভার গ্রহণ করছেন বর্তমান নৌবাহিনী প্রধান





রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজ শেষে নৌবাহিনী প্রধানের সাথে কেক কাটছেন সদ্য কমিশনপ্রাপ্ত নবীন অফিসারবৃন্দ



২০১১ বি ব্যাচের সেরা চৌকস মিডশিপম্যানকে 'সোর্ড অব অনার' প্রদান করছেন নৌবাহিনী প্রধান



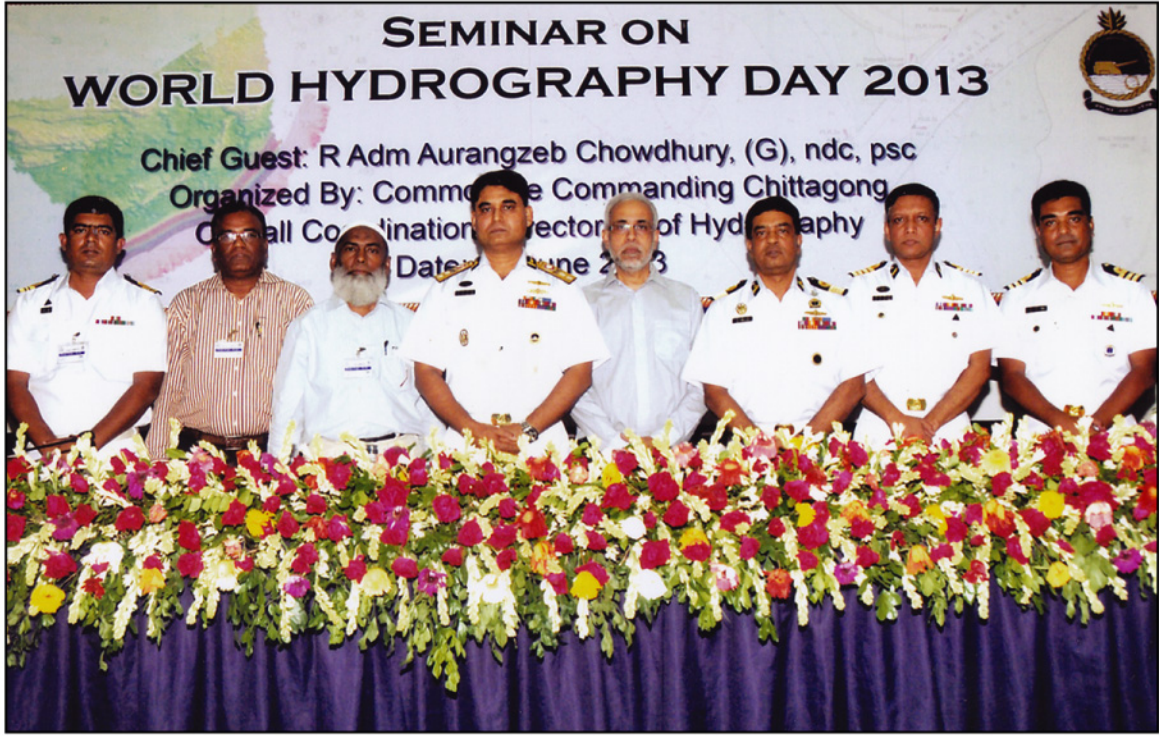


খুলনা নৌ অঞ্চলে গার্ড অব অনার পরিদর্শন করছেন নবনিযুক্ত নৌবাহিনী প্রধান



বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে নব সংযোজিত মেরিটাইম পেট্রোল এয়ারক্রাফট (এমপিএ) বিএফ বেইস বঙ্গবন্ধুতে অবতরণের পর উর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তা, বিমানের পাইলট ও ড্রুগের মাঝে নৌবাহিনী প্রধান





চট্টগ্রাম নৌ অঞ্চলে বিশ্ব হাইড্রোগ্রাফি দিবস ২০১৩ উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে অন্যান্যদের  
মাঝে প্রধান অতিথি সহকারী নৌপ্রধান (অপারেশন্স)



বানোজা হাজী মহসীন কর্তৃক আয়োজিত প্যারেডে গার্ড পরিদর্শন করছেন বিদায়ী নৌ প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ঢাকা  
বর্তমানে সহকারী নৌপ্রধান (পার্সোনেল)





বিশেষ মহড়ায় বানৌজা নিভীকের নৌকমান্ডোগণ



সিডিবিতে অবস্থিত ৭৬ মিঃ মিঃ কামান থেকে গোলা নিক্ষেপের দৃশ্য





এনবিসিডি সিমুলেটরে প্রশিক্ষণরত নৌ সদস্যবৃন্দ



বেসিক প্যারা কোর্সে প্রথমবারের মতো অংশগ্রহণকারী সোয়াডস সিল কমান্ডোদের  
এন ৩২ বিমান হতে জাম্পের পূর্বমুহূর্ত





আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষী মিশন UNIFIL, লেবাননে মেডেল প্রদানে অংশগ্রহণকারী  
বানোজা ওসমান ও বানোজা মধুমতি'র নৌ সদস্যবৃন্দ



কাতারস্থ বাংলাদেশ স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের বানোজা বঙ্গবন্ধু পরিদর্শনের দৃশ্য





বিএনএফডব্লিউএ কমপ্লেক্সে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিল্পীদের মাঝে সভানেত্রী



বিএনএ মেস নাইটে কমান্ড্যান্ট এক্সও, টিসি এবং ডিওএস এর পরিবারবর্গের সাথে ক্যাডেটবৃন্দ





## বিমান বাহিনী



২০১২ সালের ৯ সেপ্টেম্বর ন্যাশনাল স্ট্যাভার্ড অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি মোঃ জিল্লুর রহমানকে বিমান বাহিনী প্রধান উপহার সামগ্রী প্রদান করছেন



পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে বঙ্গভবনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের সাথে বিমান বাহিনী প্রধান ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন





বিমান বাহিনী ঘাঁটি বঙ্গবন্ধু উদ্বোধনকালে ঘাঁটির পতাকা উত্তোলন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী



শীতকালীন গ্র্যাজুয়েশন কুচকাওয়াজ ২০১২ উপলক্ষে আয়োজিত প্যারেডে অভিবাদন গ্রহণ করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী





বিমান বাহিনী ঘাঁটি বঙ্গবন্ধু উদ্বোধনকালে ঘাঁটি আয়োজিত প্যারেড পরিদর্শন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী



বিমান বাহিনী ঘাঁটি বঙ্গবন্ধু উদ্বোধনকালে ঘাঁটির অন্যান্য সদস্যদের মাঝে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী





কার্গো ড্রপিং প্যারাসুট হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী



বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ঘাঁটি পাহাড়কাঞ্চনপুরে নবনির্মিত বিএএফ শাহীন স্কুলের উদ্বোধন করছেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী



বিমান বাহিনী প্রধান ADEX-13 এ অংশগ্রহণরত সদস্যবৃন্দের সাথে মত বিনিময় করছেন



বিমান বাহিনী প্রধান ADEX-13 এর বিভিন্ন কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করছেন





৪০তম রিট্রুট দলের প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজে সার্বিক কৃতিত্বের জন্য সেরা রিট্রুটকে  
ট্রফি প্রদান করছেন বিমান বাহিনী প্রধান



সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিমান বাহিনীর খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা ও  
তাদের উত্তরাধিকারীগণের সাথে বিমান বাহিনী প্রধান



বিমান বাহিনী একাডেমির ৬২ ও ৬৩ তম অফিসার্স কোর্সে ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী কর্মকর্তাদের মাঝে সনদপত্র  
বিতরণ করছেন বিমান বাহিনী প্রধান



১ম গ্রাউন্ড সেফ্টি অফিসার্স কোর্সে সনদপত্র বিতরণ করছেন সহকারী বিমান বাহিনী প্রধান (রক্ষণাবেক্ষণ)





শাহীন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হাউসকে ট্রফি প্রদান করছেন  
সহকারী বিমান বাহিনী প্রধান (পরিচালন ও প্রশিক্ষণ)



আন্তঃঘাটি ওয়াটার পোলো প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন ঘাটি জহুরুল হক দলকে ট্রফি প্রদান করছেন  
সহকারী বিমান বাহিনী প্রধান (প্রশাসন)





বিএএফ শাহীন কলেজ পাহাড়কাঞ্চনপুরের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করছেন তৎকালীন এয়ার অধিনায়ক, বিমান বাহিনী ঘাঁটি পাহাড়কাঞ্চনপুর



১নং আইপিসি কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষার্থী কর্মকর্তা ও অন্যান্যদের মাঝে বিমান বাহিনী ঘাঁটি বঙ্গবন্ধু এর এয়ার অধিনায়ক





মায়ানমার নৌবাহিনী প্রতিনিধি দলের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে বিমান বাহিনী ঘাঁটি জহুরের  
তৎকালীন এয়ার অধিনায়ক



প্রথম ফ্লাইং সুপারভিশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট কোর্সের সনদপত্র বিতরণ করছেন  
বিমান বাহিনী ঘাঁটি বঙ্গবন্ধু এর এয়ার অধিনায়ক



বিমান বাহিনী ঘাঁটি বঙ্গবন্ধুর ফ্লাইট লাইনে আয়োজিত স্ট্যাটিক আর্মামেন্ট ডিসপ্লে প্রত্যক্ষ করছেন  
এনডিসি কোর্সের প্রশিক্ষণার্থী দল



জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে Troops Insertion & Extraction করছে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টার





একজন মেধাবী শিক্ষার্থীকে মেধাবৃত্তির চেক প্রদান করছেন বাংলাদেশ বিমান বাহিনী মহিলা কল্যাণ সমিতি (বাফওয়া) এর সভানেত্রী



বাংলাদেশ বিমান বাহিনী মহিলা কল্যাণ সমিতি (বাফওয়া) ও লেডিস ক্লাব এর বার্ষিক সম্মেলনে অন্যান্যদের মাঝে বাফওয়া সভানেত্রী





## বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্



২০১৩ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্ (বিইউপি) এর নবনির্মিত একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কেক কাটছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি



বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্ (বিইউপি) এর একাডেমিক কাউন্সিলের ১৯তম সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের মাঝে ভিসি, বিইউপি





বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্ (বিইউপি) এর ফ্যাকাল্টি অব বিজনেস স্টাডিজ (এফবিএস) এর বিবিএ এবং এমবিএ ব্যাচের শিক্ষার্থীরা এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন, ঢাকা পরিদর্শন করছেন



বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্ (বিইউপি) এর ফ্যাকাল্টি অব বিজনেস স্টাডিজ (এফবিএস) এর বিবিএ ব্যাচের শিক্ষার্থীরা ওয়ালটন বাংলাদেশ লিমিটেড পরিদর্শন করছেন





## ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ



ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের গ্র্যাজুয়েশন সেরিমনি ২০১২ এ ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্সে অংশগ্রহণকারী কোর্স মেম্বারকে সনদপত্র প্রদান করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী



ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের গ্র্যাজুয়েশন সেরিমনি ২০১২ এর গ্রুপ ছবিতে সকলের সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী





ধামরাই উপজেলার সোমবাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনকালে স্কুলের শিক্ষার্থীদের সাথে এনডিসি ২০১৩ এর কোর্স সদস্যগণ



ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ ২০১৩ কোর্সে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের উদ্দেশ্যে World Food Scenario and Food Security of Bangladesh শীর্ষক বক্তব্য প্রদান করছেন মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী





## স্টাফ কলেজ



ডিএসসিএসসি'র প্রশিক্ষার্থীদের মাঝে বক্তব্য প্রদান করছেন Ambassador, EU



বহিরাঙ্গণ অনুশীলনে অংশগ্রহণরত ডিএসসিএসসি এর সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষার্থীবৃন্দ





বিএএফ ঘাঁটি বঙ্গবন্ধু পরিদর্শন করছেন ডিএসসিএসসির প্রশিক্ষার্থীগণ



ডিএসসিএসসি'র প্রশিক্ষার্থীগণ পরিবার সমেত একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণরত





## মিলিটারি ইন্সটিটিউট অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি



এমআইএসটি'র জব ফেয়ার ২০১৩ উদ্বোধন করছেন কমান্ড্যান্ট এমআইএসটি



এমআইএসটি'র নেভাল আর্কিটেকচার ও মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মাঝে মাননীয় যোগাযোগমন্ত্রী





এমআইএসটি'র কমান্ড্যান্টের নিকট বিআরটিসি বাসের চাবি প্রদান করছেন  
মাননীয় যোগাযোগমন্ত্রী



এমআইএসটি'র আন্তঃবিভাগ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন দলকে ট্রফি  
প্রদান করছেন কমান্ড্যান্ট, এমআইএসটি





## আর্মড ফোর্সেস মেডিক্যাল কলেজ



এএফএমসির ১২তম কাউন্সিল মিটিং এ সেনাপ্রধানের সাথে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য সদস্যবৃন্দ



গভর্নিং বডি অব দি কলেজ এর ২৮তম সভার একটি দৃশ্য





ন্যাশনাল ডিফেন্স ইউনিভার্সিটি পাকিস্তান এর প্রতিনিধি দল এএফএমসির ফার্মাকোলজি বিভাগ পরিদর্শন করছেন



আন্তঃমেডিক্যাল কলেজ ফুটবল প্রতিযোগিতার রানার-আপ দল এএফএমসি'র সাথে কমান্ড্যান্ট, এএফএমসি ও অন্যান্য অফিসারবৃন্দ





## বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব পিস সাপোর্ট অপারেশন এন্ড ট্রেনিং



USG, DFS of UN HQ Ms Ameerah Haq বিপসটি পরিদর্শনকালে ব্রিফিং শুনছেন



GPOI এর তত্ত্বাবধানে বিপসটে অনুষ্ঠিত United Nations Civil-Military Coordination Officers' Course (UNCIMIC-3) এর প্রশিক্ষক কর্তৃক ক্লাশ পরিচালনার একটি দৃশ্য





GPOI এর তত্ত্বাবধানে বিপসটে অনুষ্ঠিত Peacekeeping Operation Contingent Commander's Course-2 এর সমাপনী অনুষ্ঠানে কমান্ড্যান্ট বিপসট কর্তৃক প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সার্টিফিকেট প্রদানের একটি দৃশ্য



জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে গমনের পূর্বে বিপসট এ থ্রি ডিমেনশনাল ট্রেনিং (পিডিটি-৯০) কোর্সে চেক পয়েন্ট তল্লাশির একটি দৃশ্য



## Contents

	Page
<b>1. ROLE OF ARMED FORCES IN THE EMERGENCE OF INDEPENDENT BANGLADESH</b>	<b>55</b>
<i>Major Dilip Kumar Roy, AEC</i>	
<b>2. INTEROPERABILITY AMONG THE OPERATING AGENCIES IN COMBINED POST DISASTER MANAGEMENT OPERATIONS</b>	<b>66</b>
<i>Wing Commander M M Ekramuzzaman, afwc, psc</i>	
<b>3. MARITIME TRADE SECURITY OF BANGLADESH : SUCCESS IN COMBATING CRIMES</b>	<b>75</b>
<i>Commander Atiqur Rahman, (G), psc, BN</i>	
<b>4. CONFLICT RESOLUTION - AN EXPERIENCE GAINED IN UNITED NATIONS MISSION IN IVORY COAST</b>	<b>83</b>
<i>Brigadier General Md Sarwar Hossain, hdmc, psc</i>	
<b>5. SONADIA DEEP SEA PORT- WHITHER THE BENIFITS</b>	<b>90</b>
<i>Commander M Joynal Abedin, (ND), afwc, psc, BN</i>	
<b>6. EFFECTS OF EARTHQUAKE AND MANAGEMENT IN BANGLADESH</b>	<b>100</b>
<i>Lieutenant Md Halimul Harun, Engrs</i>	
<b>7. CHRONICLES OF SUBMARINE OPERATIONS AND SOME THOUGHTS ON ITS DEPLOYMENT STRATEGY</b>	<b>108</b>
<i>Commander Jahangir Adil Samdany, (TAS), psc, BN</i>	
<b>8. LOGISTICS CHALLENGES FOR UN PEACEKEEPING MISSION ENVIRONMENT</b>	<b>115</b>
<i>Wing Commander Md Moniruzzaman Kashemi, psc</i>	





‘সশস্ত্র বাহিনী দিবস’ উপলক্ষে রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় সেনা, নৌ ও  
বিমান বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত স্কুল/কলেজের পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীগণ

রচনা প্রতিযোগিতা - ২০১৩

(ক গ্রুপ - ৯ম শ্রেণি হতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত)

সেনাবাহিনী



উদয় কামাল (১ম স্থান)  
আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ

নৌবাহিনী



সুমাইয়া রহমান (১ম স্থান)  
বিএন কলেজ, ঢাকা

বিমান বাহিনী



কাজী আব্দুর রাফসান (১ম স্থান)  
বিএএফ শাহীন কলেজ, যশোর



ঐশ্বর্য প্রামানিক (২য় স্থান)  
বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ



মোঃ শাহিনুর রহমান (২য় স্থান)  
বিএন কলেজ, ঢাকা



মোঃ রাকিবুল ইসলাম (২য় স্থান)  
বিএএফ শাহীন কলেজ, যশোর



মোসামঃ মরিয়ম নেসা (৩য় স্থান)  
ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হাই স্কুল, ঘাটাইল



গ্রীতিশ্রী বিশ্বাস (৩য় স্থান)  
বিএন স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা



জান্নাতুল ফেরদৌস শায়লা (৩য় স্থান)  
বিএএফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম



## রচনা প্রতিযোগিতা - ২০১৩

(খ গ্রুপ - ৬ষ্ঠ শ্রেণি হতে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত)

### সেনাবাহিনী



উম্মে তাহমিনা জেরীফ মিশু (১ম স্থান)  
বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হাই স্কুল  
বগুড়া

### নৌবাহিনী



তাসনিমুল জান্নাত আনিকা (১ম স্থান)  
বিএন স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম

### বিমান বাহিনী



মোঃ ইমতিয়াজ আহমেদ (১ম স্থান)  
বিএএফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম



মাহমুদা আক্তার (২য় স্থান)  
ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড নিম্ন মাধ্যমিক  
বিদ্যালয়, যশোর



মাস্জিশা তাসনিম অরুণী (২য় স্থান)  
বিএন স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম



আলিফ সামিয়া (২য় স্থান)  
বিএএফ শাহীন কলেজ  
পাহাড়কাঞ্চনপুর



নোশিন নাবিলা (৩য় স্থান)  
বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড  
কলেজ, ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা



আশরাফুল নাহার (৩য় স্থান)  
বিএন কলেজ, ঢাকা



শাজনীন মাহমুদ সারা (৩য় স্থান)  
বিএএফ শাহীন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল





## চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা - ২০১৩

(ক গ্রুপ - ৮ম শ্রেণি হতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত)

### সেনাবাহিনী



আবরা ইসরাত শেখ (১ম স্থান)  
আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ

### নৌবাহিনী



রুফাইদা মাহজাবীন (১ম স্থান)  
বিএন স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা

### বিমান বাহিনী



সিফাত শাহারিয়ার (১ম স্থান)  
বিএএফ শাহীন কলেজ, ঢাকা



ফারজানা নাসরিন সামী (২য় স্থান)  
চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক  
কলেজ



সাদিয়া ইসলাম (২য় স্থান)  
নেভী এ্যাংকরেজ চট্টগ্রাম



চিন্ময় কর (২য় স্থান)  
বিএএফ শাহীন ইংলিশ  
মিডিয়াম স্কুল



পুলক কুমার সরকার (৩য় স্থান)  
ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও  
কলেজ, পার্বতীপুর, দিনাজপুর



মোঃ রাশেদুল করিম রিফাত (৩য় স্থান)  
বিএন স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা



রাহানুমা তাসনিম (৩য় স্থান)  
বিএএফ শাহীন কলেজ  
চট্টগ্রাম



## চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা - ২০১৩

(খ গ্রুপ - ১ম শ্রেণি হতে ৭ম শ্রেণি পর্যন্ত)

### সেনাবাহিনী



সাবিকুন নাহার সানজিদা (১ম স্থান)  
ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড উচ্চ বিদ্যালয়  
মোমেনশাহী সেনানিবাস

### নৌবাহিনী



রাইসা কবির (ঐশী) (১ম স্থান)  
বিএন কলেজ, ঢাকা

### বিমান বাহিনী



আনিকা তাসনিম (১ম স্থান)  
বিএএফ শাহীন কলেজ, ঢাকা



সুমাইয়া খান মিস্তি (২য় স্থান)  
শহীদ বীর উত্তম লেঃ আনোয়ার  
গার্লস কলেজ



অরুণ জ্যোতি মন্ডল (২য় স্থান)  
বিএন স্কুল ও কলেজ, খুলনা



সাজিদ আলম (২য় স্থান)  
বিএএফ শাহীন ইংলিশ  
মিডিয়াম স্কুল



উম্মে তাহমিনা জেরীফ মিস্তি (৩য় স্থান)  
বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হাই স্কুল  
বগুড়া



মোঃ তাহমিদ দাইয়ান চৌধুরী (৩য় স্থান)  
নেভি এ্যাংকরেজ চট্টগ্রাম



আল আলিফ দিপু (৩য় স্থান)  
বিএএফ শাহীন কলেজ  
যশোর





‘সশস্ত্র বাহিনী দিবস’ উপলক্ষে সশস্ত্র বাহিনীর আওতাধীন প্রতিবন্ধী  
শিশুদের জন্য পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় সেনা ও  
নৌবাহিনীর পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীগণ

সেনাবাহিনী



সামিরা আজাদ অজন্তা (১ম স্থান)  
প্রয়াস, বগুড়া সেনানিবাস



আতিকুর রহমান (২য় স্থান)  
প্রয়াস, চট্টগ্রাম সেনানিবাস



চৌধুরী গালিব আজিজ অনিন্দ্য (৩য় স্থান)  
প্রয়াস, ঢাকা সেনানিবাস

নৌবাহিনী



আমিনুর রহমান রিসাত (১ম স্থান)  
বিএন আশার আলো স্কুল



তাসনীম তাহমিদা মীম (২য় স্থান)  
বিএন আশার আলো স্কুল



সব্যসাচী বড়ুয়া নিলয় (৩য় স্থান)  
বিএন আশার আলো স্কুল



*Published by  
Armed Forces Division*

*Assisted by  
Directorate of Naval Education Services  
Naval Headquarters*

*Graphic Design  
I Positive Communications Ltd*

*Printed at  
Creative Colour Printers, Dhaka*



